খণ্ড গ্রহণ

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

প্রভা প্রকাশনী
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
১ কে, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা-১২

❑ প্রকাশক ❑
শ্রীঅসীমকুমার মণ্ডল
প্রভা প্রকাশনী
১ কে, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা-১২

❑ প্রকাশকাল ❑

৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৫

❑ প্রচ্ছদ ❑
শেখর মণ্ডল, কলকাতা-৬

❑ অক্ষরবিন্যাস ❑
তনুশ্রী প্রিন্টার্স
২১বি রাধানাথ বোস লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৬

❑ মুদ্রণ ❑
পূর্ণিমা প্রিন্টার্স
টি/২এ/১, গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেন
কলকাতা-৬৭

খণ্ড গ্রহণ

মিছিলটা বাঁক নিচ্ছে গোকুলনগরের চৌমাথার পশ্চিমে। লম্বা লেজ। লালে লাল হয়ে গেছে মাথাগুলো। দূর থেকে মনে হচ্ছে অজস্র শিমুল ফুল দিয়ে গাঁথা মালা। বর্ণময়, গন্ধহীন। তারা শ্লোগান দিচ্ছে এবার নয় পরের বার, হবেনাকো কোনোবার, নির্বাচন কমিশন তুমি জেনে রেখো লক্ষ এলেও পারবে না, পারবে না। হায় হায় হারল কে—মহাঘোট আবার কে। ....

মিছিলের শ্লোগানে আটের দশকের "পুঁজিবাদ দূর হটো" নেই। শ্রেণিসংগ্রামের কথা নেই। ভূমি সংস্কারের সাফল্যের কথা নেই। সর্বহারার কথা নেই।

তোর কথাই তা হলে সত্যি হল, তাই না সেলিম?

শেখ সেলিম রসুল, অনেক যুদ্ধের নায়ক, সেই ছিয়াত্তর সালের কালো দিনগুলি থেকে দলীয় সদস্য পদ পেয়েছিল বিরাশিতে।

তখন কত পরীক্ষানিরীক্ষা। দলের কাছে বিশ্বস্ত সৈনিক হয়ে ওঠার জন্য কত পরিশ্রম, কত ত্যাগ। দল মেনে নিয়েছিল তাকে। মানবে নাই-বা কেন। তার মধ্যে ছিল সততা, স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা। তাছাড়া তার পাশে ছিল সবহারানো মানুষের দল।

কোনো কলকারখানা ছিল না গোকুলপুরে। তাই কারখানার শ্রমিক ছিল না। ছিল প্রান্তিক চাষি, খেতমজুর। কয়েকটি হিমঘর ছিল বলে রয়েছে অসংগঠিত শ্রমজীবী। তাদের নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করেছিল সেলিম। সব আন্দোলন যে সফলতার মুখ দেখেছিল তা নয়। কিন্তু কায়েমী স্বার্থে মারতে পেরেছিল হাতুড়ির ঘা। ক্ষেপে উঠেছিল তারা। চেষ্টা করেছিল সমস্ত আন্দোলনকে অঙ্কুরে বিনাশ করতে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সফলও হয়েছিল। ব্যর্থ হয়েছিল কখনও কখনও।

কেন্দ্রে তখন দক্ষিণপন্থী সরকার। তাদের বিমাতৃসুলভ মনোভাব ছিল প্রকট। তারা চাইত না বামপন্থী সরকার টিকে থাকুক। চুনসুরকি খসে পড়ুক সুরম্য প্রাসাদের। তাই প্রতি পদক্ষেপে নাজেহাল করত শ্রেণিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে চলা প্রাদেশিক সরকারকে। যা যা করলে একটা সরকার সংকটে পড়ে যায় তার সমস্ত আয়োজন ওরা করেছিল। বাধ্য হয়ে দরিদ্রের সংসারের মতো স্বল্প আর্থিক ক্ষমতা নিয়ে যেটুকু জুটত তাকেই কাজে লাগিয়ে উন্নয়নের ধ্বজা ওড়ানোর চেষ্টা চালাচ্ছিল সরকার। মানুষ দেখত, মানুষ বুঝত এরা কাজের জন্য, মানুষের জন্য। উৎসাহিত হল মানুষ। আশার নিভু নিভু প্রদীপ আবার জ্বলতে শুরু করল নতুন করে।

গোকুলপুরের সেলিমের কাছে সময়টা যেন ছোটো মনে হল। চাই আরও সময়। আরও কাজ, শুধু সেলিম কেন, ওর সমসাময়িক যারা তাদেরও তাই মনে হল।

ওদের দেখে তথাকথিত দোদুল্যমান মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত, তারাও ভাবতে শুরু করল এরা কিছু করবে। বিগত সরকারগুলোর মতো ফাঁকা আওয়াজ সম্পন্ন এরা নয়। কাজ চলছে রাস্তাঘাটের। চলছে বৃক্ষরোপণ। কাজের বদলে খাদ্য কর্মসূচি রূপায়ণ হচ্ছে। টাকা আসছে। কিন্তু ওদের লোভ নেই।

সেলিমের আয় বলতে মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকতা। যেটুকু পায়, সেলিম আর তার বেগম সাবিনার তাতেই সুখ। ভীষণ খুশি, ভীষণ সুখী সাবিনা। সবাই আসে তার বাড়ি, বিপদ নিয়ে, সমস্যা নিয়ে, দুঃখ নিয়ে। গল্প করে সাবিনার সাথে, সম্বোধন করে কেউ ভাবি বলে, কেউ বউমা বলে, কেউ মা বলে। আর সাবিনা সেও আর পাঁচজন সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের বিবি, বেগমের মতো পর্দার আড়ালে থাকে না।

জিয়াউদ্দিন পাঠান, সাবিনার আব্বা সাধারণ নিম্নবিত্ত। কোনোরকমে চলে যায় পাঁচ মেয়ের সংসার। তার দ্বিতীয় কন্যা সাবিনা এককথায় অপূর্বা। যে দেখে সে তারিফ না করে পারে না। জিয়াউদ্দিনের বাড়ি তুঘলকচক। ওই. গাঁয়ে অন্যান্য মুসলিম পরিবারের বোধহয় শিক্ষা নেওয়া, লেখাপড়া শেখার প্রতি তেমন উৎসাহ নেই। জিয়া ওদের দলেও নেই। তাই সে তার নিম্ন আয় নিয়েও মেয়েদের স্কুলে পাঠায়। চেষ্টা করে মেয়েরাও যাতে সুশিক্ষিতা হতে পারে। নিজেদের সমাজে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। উৎসাহিত করতে পারে আর পাঁচটা সংসারকে। কিন্তু কে শোনে কার কথা।

তুঘলকচক। জিয়াউদ্দিন খাঁ-এর রাজনৈতিক কর্মস্থল। সেখান থেকেই দলের নজরে আসা, দলীয় পদ পাওয়া, নেতা হয়ে ওঠা। দলও তাকে দিয়েছে আর্থিক স্বাধীনতা। দলের সর্বক্ষণের কর্মী হওয়া থেকে আরম্ভ করে হিমঘরের সাথে যুক্ত করা সবই করেছে দল। সেও দলের জন্য নিজেকে সমর্পণ করেছে যথাসাধ্য। বাকিটা একটা ইতিহাস।

বি.এ পাশ করল সেলিম। সময়টা আটাত্তর সাল। যেন এক নতুন আলোর দিশা দেখল সেলিম, সনাতন বাবুর সান্নিধ্যে এসে। আজীবন অকৃতদার সনাতন রায়। তাঁর সততা নিয়ে, তাঁর চরম শত্রুও কোনো সন্দেহ প্রকাশ করার সুযোগ পায়নি। যার দূরদর্শিতার জন্য দল তাঁর জেলায় এতখানি জোরদার সংগঠন গড়তে পেরেছে। যার হাত ধরে, যার কাছে অর্জন করা শিক্ষায় উঠে এসেছে দলের বিশ্বস্ত সব সৈনিক।

বিশ্বস্ত সৈনিকই তো! তা না হলে একটা প্রাদেশিক সরকার এত দীর্ঘস্থায়ী হয় কী করে। ওরাই তো বপন করেছিল বীজ, আজ মহিরুহ।

জন্মালে বয়স বাড়ে। বয়স বাড়লে বাড়ে শিকড়। মাটির গভীরে যায়। বাড়ে শাখাপ্রশাখা। আরও বয়স বাড়ে, পরিপক্ক হয় গাছ। আবার পোকাও ধরতে পারে, ক্ষয়ও হতে পারে, তারপর হয়তো অবক্ষয়। কিন্তু মূল-কাণ্ড, তার শিকড়, তারা বোধহয় একই রয়ে যায় ধারক হয়ে, সংগঠক হয়ে। কারণ তাদের লড়াকু চেতনা, বাঁচিয়ে রাখার দায়বদ্ধতার শিক্ষা।

দল জানে বিপ্লব খালি পেটে হয় না। সাধুসন্তরা সাধনা করে, না খেয়ে নয়। ফল মূল খায়, কারণ জীবন ধারণ। জীবন চলে গেলে সাধনা হবে কি করে! হয়তো সেই কারণেই সেলিমের জন্য দল তাকে একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেয়। মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকতা। আসলে সনাতনবাবুর নির্দেশেই চাকরিটা পায় সেলিম।



কথায় বলে পেটে দিলে পিঠে সয়। স্বাভাবিক ভাবেই আর্থিক ভাবে নিশ্চিন্ত সেলিম দ্বিগুণ উৎসাহে নিজেকে মেলে ধরে জনগণের দরবারে। জনগণের কাজে।

সেদিন মঙ্গলবার। তুঘলকচকে একটা জরুরি সভায় ডাক পেল সেলিম, ডেকেছেন জিয়াউদ্দিন সাহেব। তখন বিকেল চারটা। স্কুল ছুটি হয়েছে সবেমাত্র। ছাত্রছাত্রীরা ফিরছে ঘরে। ওরা সব জনার্দনপুর স্কুলের ছাত্রছাত্রী।

জনার্দনপুর একটা চটি বললে বোধহয় কম বলা হয়ে যায়। ওখানে প্রতিদিন বাজার বসে। দুটো হিমঘর আছে, একটা ব্যাংক আছে, আছে বেশ কয়েকটা দোকান। জনার্দনপুরের লাগোয়া গ্রাম অনেকগুলো। উত্তরপাড়া, পশ্চিমপাড়া, সুরতপুর, তুঘলকচক, হেমন্তপুর আরও সব গ্রাম। ওখানের প্রায় সবাই আসে জনার্দনপুর বাজারে। স্বভাবতই লোকসমাগম প্রচুর।

জনার্দনপুরের স্কুলের নামডাক আছে বেশ। ওই স্কুল থেকে প্রতিবছর ভাল ভাল ছেলে বেরোয়। ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং-এ সুযোগ পায়। অন্যান্য উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রেও সুযোগ পায় ওই স্কুলের বনিয়াদ কাজে লাগিয়ে। সবাই বলে—আমাদের চোখের মণি মা সারদা স্মৃতি স্কুল। কথিত আছে জনার্দনপুরের রায় আর মান্না পরিবার তাদের সবকিছু ত্যাগ করেছেন ওই স্কুলের জন্য। সে প্রায় একশো পঁচিশ বছর

আগের ইতিহাস। জনার্দনপুর গ্রামে এমন একটা সংসার নেই যে বাড়িতে অন্তত একজন শিক্ষার আলো দ্যাখেনি।

মা সারদা স্মৃতি স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছে ছাত্র-ছাত্রীরা। তারা কথা বলছে। হাসছে খিলখিল করে। কেউ কেউ মাটিতে পড়ে থাকা গুটিকে ফুটবল ভেবে কিক করতে করতে যাচ্ছে বাড়ির পথে। সেই দলেই একটি মেয়ে, পাছা পর্যন্ত চুল। চোখ তো নয়, যেন কোনো এক হরিণী, তার গ্রীবা বাঁকিয়ে দেখছে তার প্রিয়কে। টিকোলো নাক, তেমনি তার হাঁটা।

সেলিম দেখছে—যেন কোনো এক হুরি নেমে এল মাটিতে। ইচ্ছে করছে তার দিকে তাকাতে। আবার ভয়ও হচ্ছে, যদি অপমানসূচক কোনো কথা বলে দেয়। যদি সেটা রটে যায় সবার কানে কানে যদি জেনে যায় নেতৃত্ব, অথবা জিয়াসাহেব। তা হলে যে নিজের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু মন, সে বাধা মানবে কেন। তারপর নিজেই ভাবে, এভাবে কেনই বা চুরি করে দেখবে অন্যের সৌন্দর্য। তা ছাড়া মন যা চায় তাকেই বাঁধ দিয়ে বেঁধে কি লাভ। দ্বন্দ্বে ভুগতে ভুগতে সরাসরি তাকাল মেয়েটির চোখের দিকে। আশ্চর্য ব্যাপার, হেসে ফেলল মেয়েটি। সে হাসি দেখার জন্য যে-কোনো পুরুষ আজীবন অপেক্ষা করতে পারে।

মেয়েটির পিছনে পিছনে যাচ্ছিল সেলিম, সে যাবে জিয়াউদ্দিন খাঁ এর বাড়ি, ওখানেই জরুরি মিটিং ডেকেছে জিয়াসাহেব এবং ওখানে এই প্রথমবার যাচ্ছে সেলিম। বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে দেখে মেয়েটি জিয়াসাহেবের বাড়িতেই ঢুকছে।

মনে মনে ভাবল সেলিম—জিয়াসাহেবের মেয়ে নয় তো?

এবার একটা লজ্জাবোধ যেন গ্রাস করতে শুরু করল সেলিমকে। কিন্তু বয়স! এই বয়সে মন তো উড়ু উড়ু হতে চায়। সেখানে দোষ কোথায়? হোক না সে কোনো দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তি অথবা নারী।

অন্যমনস্কতা নিয়ে মিটিং শেষে বাড়ি ফিরছে সেলিম। তখন সন্ধে নেমেছে, স্নিগ্ধ সন্ধ্যা। সাদা সাদা জোৎস্না মেখে। সেই জোৎস্না সেলিমের মনে। চোখে মেয়েটির প্রতিবিম্ব। পা দুটো যেন আটকে যাচ্ছে পথেই।

বাড়ি ফিরে টুকিটাকি কাজ সেরে নিতে রাত্রি বাড়ল। খাওয়া শেষ হল। বিছানায় গেল সেলিম। কিন্তু ঘুম আসছে না। চোখ বন্ধ করলেই মনে হচ্ছে সেই মেয়েটি, —তার সুন্দর হাসি, তার এলো চুল, তার চোখ-নাক। হয় তো হালকা আতরের ঘ্রাণ, সব এসে যেন তছনছ করে দিচ্ছে সবকিছু। এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে সেলিমের মন।

সমস্ত রাত্রি জেগে থেকে সিদ্ধান্ত নিল সেলিম, কালই তুঘলকচক যাবে আর একবার চোখের দেখা দেখবে মেয়েটিকে। সম্ভব হলে জানার চেষ্টা করবে অনেক কিছু।

সকালেই বেরিয়ে পড়ল তুঘলকচকের পথে। ওখানে গিয়ে দেখা করল তার ছোট্ট বেলার দোস্ত জামালের সাথে।

জিজ্ঞাসা করল সেলিম—জামাল গতকাল বিকেলে যে মেয়েটি স্কুল থেকে ফিরে জিয়াসাহেবের ঘরে ঢুকল, ও কেরে?

ও, তুই সাবিনার কথা বলছিস?

ওর নাম সাবিনা?

হ্যাঁরে, ও তো জিয়াচাচার তিন নম্বর মেয়ে। তা কি ব্যাপার বল তো? তোর কি ....

তা বলেত পারিস।

কথা বলব নাকি, জিয়াচাচার সাথে?

বলে দ্যাখ না। হ্যাঁরে জিয়াসাহেবের ছেলে মেয়ে ক-টি?

ওর ছেলে নেই। পাঁচটিই মেয়ে, দু মেয়ের শাদি হয়ে গেছে।

সেদিনই জিয়াসাহেবের বাড়ি গিয়ে কথা বলেছিল জামাল। সব শুনে রাজি জিয়াসাহেব। কিন্তু সাবিনা! সে রাজি হবে তো!

রাজি কিনা জানতে সুযোগ পায়নি সেলিম, তার আগেই জিয়াসাহেব জামালকে পাঠালেন সেলিমের বাড়ি তার আব্বা আম্মার কাছে।

একদিন কনে দেখা সারা হল। কথাবার্তা পাকা হল, সেলিমের আব্বা গোলাম রসুল কোনো দাবি ছাড়াই ছেলের শাদির ব্যবস্থা পাকা করে বাড়ি ফিরে এলেন।

শাদি হয়ে গেল সেলিম সাবিনার।

শাদির পর জিজ্ঞাসা করেছিল সেলিম—তুমি আমাকে না দেখেই রাজি হয়ে গেলে?

লজ্জাকে বিদায় দিয়ে সাবিনা সেলিমের চোখে চোখ রেখে বলেছিল—না দেখে কেউ মত দেয়!

তার মানে?

আমি তোমাকে সেদিনই দেখেছিলাম।

কোথায়?

প্রথমে রাস্তায়, তারপর তুমি যখন আব্বার সাথে মিটিং-এ বসেছিলে।

কই ওখানে তো তোমাকে দেখিনি!

আমি তো জানালার ধারে সারাক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম। জানো তোমাকে দেখে মনে হচ্ছিল, ছবিতে দেখা কোনো নবাবজাদা যেন বসে আছে।

হুঁ!

কী মনে হচ্ছিল জানো?

কী?

তুমি যেন উদাস দুপুরের নীল সমুদ্র!

বাব্বা, তুমি তো অদ্ভুদ কথা বলো!

কেন আমি কি কথা বলতে জানি না নাকি!

তাই কী বললাম।

জানো, আমি স্কুল ম্যাগাজিনে .... না থাক বলব না।

আবিরও একই কথা বলেছিল অভিন্নহৃদয় বন্ধু সেলিমকে—আমিও জানতাম ওসব নির্বাচন কমিশন টমিশন কিচ্ছু করতে পারবে না। কারণ আজও মানুষ মনে করে আমাদের বিকল্প বলে কোনো কিছু তৈরি হয়নি। আমরা কাজ করি। কথা বলি কম। তাই অটুট আছে আস্থা। তবে হ্যাঁ এটা সত্যি উপযুক্ত বিকল্প থাকলে কী হত সেকথা বলা কঠিন।

আবির রায়, জনার্দনপুরের বিখ্যাত রায়বংশের। সেই রায়বংশ যাদের অকৃপণ দানে আজও সমানভাবে উজ্জ্বল হয়ে আছে 'মা সারদা স্মৃতি স্কুল।' একই স্কুলের ছাত্র দুজনেই। একই নেতৃত্বের কাছে দুজনেই নাড়া বেঁধেছিল রাজনৈতিক প্রশ্নে। একই কলেজে পড়ার পাঠও শেষ করেছে দুজনে। আজ সে রয়ে গেছে দলীয় সদস্য পদ ধরে রেখে, অথচ সেলিম ....।

আবিরের কথা শেষে বলেছিল সেলিম—তবে একটা ব্যাপার কি জানিস, এই এতবড়ো জনসমর্থন পেয়ে আমরা যদি অহংকারী হয়ে যাই, যদি গোঁয়ার্তুমিতে আচ্ছন্ন হয়ে ভুল সিদ্ধান্ত নিই, অথবা গুরুত্ব না দিই মানুষের আবেগ বা তাদের মতামতের প্রতি, কিংবা আনন্দে আত্মহারা হয়ে যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই মাটি ও মানুষের কাছ থেকে, তা হলে মানুষ কিন্তু ক্ষমা করবে না।

আবির রায় বর্তমান জনার্দনপুরের একচ্ছত্র সম্রাট। অন্তত লোকে তাই বলে, নজরুল, বসন্ত, জিৎ রায়রা ছাড়া। জেলায় তার অবাধ যাতায়াত। গোষ্ঠী বিভাজনের

সাথে সাথে নিজের অবস্থান বদলে ফেলেছে বাধ্য হয়ে, অথচ সেলিম পারেনি। পূর্ণ বিশ্বাস হেরে গেল জোনাল সম্মেলনে। আসল প্রদীপ সরখেল। মেনে নিতে পারল না সেলিম, মেনে নিতে পারেনি আবিরও। ওরা দুজনেই ঘৃণা করত নিজের মতামতকে দলীয় মত বলে যারা চালায় তাদেরকে।

হয়তো তাই সেলিম বলেছিল—এদেরকে মেনে নেওয়া মানে নীতিহীনতার নীতিকে মেনে নেওয়া। আমার এসব ভালো লাগছে না।

সরে এলে তো ওরা বেপরোয়া হয়ে যাবে। এটা কি একবারও ভেবে দেখেছিস।

জানি। আবার এও জানি ওরা মানুষের হৃদয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। হারিয়ে যাবে শ্রদ্ধা। আসবে ভয়।

তারপরেও তুই ....

থাকবো। তবে আমি জানি প্রতি মুহূর্তে তৈরি হবে সংঘাত।

না সেলিম, ওভাবে নয়। ভিতরে থেকেই ওদেরকে বোঝাতে হবে আমরা একটা বিজ্ঞান, একটা দর্শনের উপরে দাঁড়িয়ে এতদিন আছি। ব্যক্তিগত মতকে দলীয় মত বলে চালিয়ে নয়।

থেকেও থাকতে পারল না সেলিম। পালাবদলের পালে হাওয়া না হওয়ার অপরাধে বহিষ্কৃত হল দল থেকে। তার বিরুদ্ধে আনা হল দলবিরোধী কার্যকলাপে মদত দেওয়ার অভিযোগে। বলা হল ভিতরে ভিতরে যোগাযোগ রাখছে বিরোধী শিবিরের সাথে। এমনকী দলের ভিতরের খবর পাচার করছে ওদের শিবিরে। এমনকী কফিনে শেষ পেরেক পোতা হল—সেলিম নাকি আর্থিক কেলেঙ্কারি, নারীঘটিত কেলেঙ্কারির সাথেও যুক্ত।

সেটা দুহাজার পাঁচ সাল। হঠাৎ দেখা গেল প্রদীপ সরখেল দেদার দলীয় সদস্য পদ বিলোতে শুরু করেছে, যা মার্কসীয় গঠনতন্ত্রে নেই। প্রতিবাদ করল সেলিম। এভাবে সবাইকে দলে নিলে দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হবে, বিশ্বাস হারাবে মানুষ। তাছাড়া যারা আসছে বা আনা হচ্ছে তাদের মানুষ ভয় করে, ঘৃণা করে।

প্রতিবাদ করেছিল নজরুল—এসব আপনার মনগড়া কথা। আপনি এদের সম্বন্ধে না জেনেই এসব বলেছেন। এরা আসলে আমাদেরই ছিল।

ছিল যদি তা হলে নতুন করে আবার আনা হচ্ছে কেন?

মাঝখানটায় এরা ভুল পথে হেঁটেছিল। এখন বুঝতে পেরেছে।

ওরা কখনও ছিল না। ওরা সমাজের ভালোর জন্য কোনোদিন সময় দেয়নি।

আপনি ভুল তথ্য দিয়ে মানুষের কাছে অন্য বার্তা পাঠাবেন না, তা হলে নিজেরই ক্ষতি হবে।

আমরা শ্রেণিসংগ্রামে বিশ্বাসী, আমাদের মূলকথা—সততা। মূলস্তম্ভ—সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষ, মূলশত্রু—সমাজবিরোধী, বুর্জোয়া। ওরা প্রথমত শত্রু বলেই সবাই জানে।

দেরি করেনি নজরুল, বসন্ত, জিৎ রায়রা। ভুল বোঝানো হল প্রদীপ সরখেলকে। ডানা ছাঁটা হল পূর্ণ বিশ্বাসের। আবিরের আশঙ্কাই ঠিক হল। সেলিম ব্রাত্য হয়ে গেল দলের কাছে।

সেই সেলিম—যাকে বিসর্জন দিল দল, যাকে পুজো না হোক সসম্মানে ঠিক শালগ্রাম শিলার মতো রাখা উচিত ছিল।

সেই সেলিম জিজ্ঞাসা করল আবিরকে—আচ্ছা আবির, তোর কি মনে হয়না প্রায় দেড় দশকের কাছাকাছি বিত্তবান, শিল্পপতি কিছু সমাজবিরোধী এরা ভিড় জমাচ্ছে আমাদের দলে। অথবা বিরোধী শিবিরের প্রাণ ওষ্ঠাগত করা ধান্ধাবাজরা ধীরে ধীরে তাদের অবস্থান বদলে চলে আসছে আমাদের কাছে। কিন্তু চরিত্রগুলো রয়ে গেছে আগের মতোই।

আসছে না একথা বলা যাবে না।

কিন্তু কেন? এমন তো কথা ছিল না। আসলে কি জানিস ওরা আমাদের ষষ্ঠ জমানায় দেখেছে বা বুঝেছে ওরা অনেক নিরাপদ।

তা হলে তুই কি বলতে চাস ওদের জন্যই আমরা নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পেয়েছি।

একটা প্রশ্ন করব আবির?

একটা কেন, হাজার প্রশ্ন করতে পারিস, জ্ঞানের মধ্যে থাকলে নিশ্চয় উত্তর দেব।



সময়টা মে মাস। পৃথিবী হাঁসফাঁস করছে রৌদ্রের প্রচণ্ড দাবদাহে, দহনে। সূর্য যেন তার ভাঁড়াড়ের সঞ্চিত সমস্ত আগুন দানবীরের মতো উজাড় করে ঢেলে দিচ্ছে পৃথিবীর ওপরে। তার জ্ঞান নেই কি দারুণ দুর্দশা হবে মানুষগুলোর। তার উপর ঘন ঘন লোডশেডিং। ভাগ্যিস এটা গ্রাম। এখানে প্রকৃতি তার সহস্র কৃপায় সবুজ বিছিয়ে রেখেছে।

এই দাবদাহ থেকে একটু আরাম খুঁজতে গাঁয়ের প্রায় অনেকেই বিভিন্ন দলে বসেছে এক একটি ছায়াঘন স্থানে। তাদের মধ্যে অলস আলোচনা। বিষয় কোনো দলের লেখাপড়ার সম্বন্ধে, কোনো দলের নারীর বিবরণমূলক এবং নানান ঘরের নানান হাঁড়ির খবর। কেউ কেউ মেতেছে রাজনৈতিক আলোচনায়। সবেচেয়ে অবাক ব্যাপার এখানেও সেই বিভাজন রেখা। এক একটি জটলার এক একটি রং—লাল, তেরঙা, সবুজ, গেরুয়া।

এই এক রোগ বাঙালিদের। তিলকে তাল করা, তালকে তিল করা।

শওকত বলত—জানো আব্বা, মুম্বই শহরে এসবের সময় একবারেই নেই। সেখানে কেবল দৌড় দৌড় আর দৌড়। কেউ কারও ব্যাপারে মাথা ঘামায় না, সমালোচনায় অলস সময় কাটানোর সময়ই নেই।

ঠিক বলেছিস, এই জন্যই আমরা বাঙালি ওরা মুম্বইবাসী।

ওখানে দ্যাখ রাজনৈতিক ব্যাপারে এত মাতামাতিও নেই। কে যে কী একমাত্র ভোটের বাক্সেই বোঝা যায়। তবে এটা ঠিক পশ্চিমবাংলায় যেটা তেমন প্রকট নয় ওখানে সেটা প্রকট, সেটা হল অন্ধকার জগতের সাথে ওঠা-বসা।

এখানে একেবারে নেই একথা বলি কী করে, সীমান্ত জেলাগুলোতে তো আছে।

ওখানের তুলনায় এসব নস্যি।

হয়তো হবে বা। আমি তো মুম্বইতে থাকি না, তুলনা করব কি করে।

জনার্দনপুরের অলস দুপুরের স্নিগ্ধ গাছের ছায়ায় আলোচনা চলে এ পক্ষ ও পক্ষ নিয়ে। মৃদু ঝড় যে ওঠে না তা নয়, সে ঝড় নিতান্তই মৃদু কারণ লক্ষ প্রভেদেও এখানে সামাজিক অবস্থানের তেমন হেরফের ঘটেনি কোনোদিন। না সাতাত্তরের আগে, না সাতাত্তরের পরে। যদিও এখানের শতকরা হিসেবে বাম সমর্থিত মানুষের সংখ্যাধিক্য প্রায় সত্তর শতাংশ।

আবির, সেলিমের অভিমত—রাজনীতি অবশ্যই প্রাধান্য পাবে কিন্তু তা সমাজের সংঘবদ্ধতাকে যেন নষ্ট না করে। তা যদি হয় তা হলে হারিয়ে যাবে সমাজ। স্থান নেবে পরস্পর বৈরিতা, যার ফল ভীষণ রকমের ক্ষতিকারক।

হয়তো এই সব কারণেই ডান, বাম সবার কাছে এতো প্রিয় সেলিম, আবির।

তাই হয়তো অন্যান্য জায়গায় যখন বিজয়মিছিল চলছে—"এবার নয় পরেরবার" "হায় হায় দিদিগো এবার কি হবেগো,' "কালো হাত ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও" তখন এখানে অদ্ভুত রকমের শীতলতা। ঠিক গাছের ছায়াঘন শীতলতায় জুড়িয়ে

যাওয়া প্রাণের মতো। এখানে মাতামাতি নেই, কোনো লড়াই নেই অথচ ভোট আছে সত্তর শতাংশ।

সেদিন অবনী বলছিল—অবশ্যই ভোটে তার দল হেরে যাওয়ার পর—সেলিমভাই, আবিরকে দেখে অনেক কিছু শেখার আছে। ওরা বলে মানুষকে আঘাত করতে নেই। আহত করতে নেই, তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিতে হয়, বোঝাতে হয় কোনটা ঠিক কোনটা ভুল। ওরা বলে মিছিল পালটা মিছিল, সেখান থেকে উত্তেজনা—সুযোগ নেয় সুযোগসন্ধানীরা, তারা ঘোলা জলে নেমে পড়ে মাছ ধরতে, আমরা সে সুযোগ দেব কেন?

লিয়াকত আলি বলেছিল—আমরা বিরোধী বলে ওরা কখনও দূরে সরিয়ে রাখেনি। তাই ওদেরকে শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছে করে। ওরা যদি কোনো দিন তেমন করে ডাকে শুধু ওদের জন্য ওদের কাছে চলে যেতে বাধবে না। কিন্তু নজরুল বসন্তরা কেন ওদের মতো নয় বুঝে উঠতে পারছি না।

বুঝে লাভ নেই। আসলে ওরা ওদের মতো করে মনে করে, বিভাজন রেখা রাখা দরকার।

জানো লিয়াকত, ঠিক এই কারণেই ওদের পছন্দ নয় আবির বা সেলিমভাইকে, ঠিক এই কারণেই সেলিমকে সরিয়ে দিল নিজেদেরকে নিষ্কণ্টক করতে।

আবিরকে তো পারল না।

চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সুদর্শন সরখেল আছে যে।

সবাই সেলিম নয়। বর্তমান প্রজন্মের নেতৃত্ব পছন্দ করে না তাত্ত্বিক মনোভাবাপন্ন সেলিমকে। তারা চায় জীবন্ত থাক পারস্পরিক দ্বন্দ্ব। চায় বিপদে পড়ে ছুটে আসুক সাহায্যের জন্য। তারপর যা করতে হয় হিসেব কষে করব। দরকার হলে ....।

ওপরতলার নেতৃত্বরা এসব জানে না। তারা জানে সব ঠিকঠাক চলছে। না চললে এভাবে দীর্ঘদিন থাকা যেত না। তা ছাড়া তাদেরকে যদি সব খবরই তদন্ত করতে হয় তাহলে তো দেশ লাটে উঠে যাবে। এর সুযোগ নেয় বসন্ত নজরুলরা, তারা ছড়ি ঘোড়ায়, তাকাতে বলে ঘুর্ণায়মান ছড়ির দিকে। না তাকিয়ে থাকতে পারলে কপালে জোটে দুর্দশা।

লিয়াকত বলে—না, অবনীদা এসব বেশি দিন চলতে পারে না। ওরা কথায় কথায় হুমকি দেয়, বাড়ির পাশ দিয়ে মিছিল নিয়ে গেলে শ্লোগান তুলে "কালো হাত গুঁড়িয়ে দাও ভেঙে দাও", তখন ভয় হয়। আমরা তো মানুষ, বিশেষ করে বাঙালি। আমরা প্ররোচিত হয়ে যাই খুব সহজে। সেই ফাঁদে পা দিলে বা দিয়ে যদি

তেমন কিছু ঘটে যায়, তা হলে বিবি বাচ্চার কি হবে ভেবে কেমন যেন অস্থির হয়ে যাই। ঠিক তখনই মনে হয় রাজনীতি আর করব না। কিন্তু সেলিমকে দেখার পর তার সাথে কথা বলার পর মনে হয়, আমাদের সবার স্বাধীনতা আছে, অধিকার আছে নিজেদের মত প্রকাশ করার।

তুমি আমার কথা ভাব তো, কি অন্যায় আমি করেছিলাম যে এভাবে আমাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দিল!

জানি অবনীভাই, সব জানি। তাই মরমে মরে আছি। ভাবছি কবে সেদিন আসবে।

আসবে না, কোনোদিন আসবে না, আমরা মরে যাব। আমাদের ছেলে-মেয়েরা মরে যাবে, কিন্তু সুদিন ধরা দেবে না।

আসলে কি জানো, আমরা বোধহয় দিবা স্বপ্ন দেখছি। তাও আবার ছেঁড়া চাটাইয়ে শুয়ে। সত্যিই তো সুদিন আসবে কি করে। আমাদের নিজেদের মধ্যেই তো সহমত নেই। নেই সাংগঠনিক প্রক্রিয়া। সত্যি করে বলো তো লিয়াকত ভাই, আমরা কি মানুষের পাশে আছি। আছি তাদের সুখদুঃখের সাথি হয়ে। নেই তাহলে সুদিন আসবে কি করে?

কথাটা মন্দ বলোনি। শুধু রাজধানীতে বসে বিপ্লব হয় না। ওদের মতো তাকে ছড়িয়ে দিতে হয় গ্রামে, গঞ্জে, মানুষের ঘরে ঘরে।

একটা হতাশা ভরা দীর্ঘশ্বাস লিয়াকতসাহেবের বুক ভেঙে যেন বেরিয়ে এল। ভারী হয়ে গেল পরিবেশ। তারপর একপ্রস্থ নীরবতা শেষে লিয়াকতসাহেব বলল আজ আসি, কাল আবার দেখা হবে।

অবনীবাবুও বললেন—সেই ভালো। কয়েকটা কাজ আছে। আমাকেও একটু তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।

চলে গেল লিয়াকতসাহেব, অবনীবাবু যে যার বাড়ির পথে। এক বুক হতাশাকে সঙ্গী করে।

সেলিমের বাড়ির বারান্দায় মাদুর পেতে দিয়েছে সাবিনা। সেই কখন লোডশেডিং হয়েছে। তার উপর বাতাসও তেমন বইছে না। ঘামছে আবির। আসলে ওতো বেশ মোটা হয়ে গেছে। বেড়েছে মধ্যপ্রদেশ। সেলিম রয়ে গেছে আগের মতোই, দোহারা চেহারা। অথচ দুজনেরই বয়স বেড়েছে। এখন প্রায় পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই। কিন্তু লোভ কমেনি কারুরই। এই লোভের জন্য কত কথা শুনতে হয়

আবিরকে। বাড়িতে কত বাধানিষেধ খাদ্যতালিকায়। সে তো বাড়িতে। বাইরে তো নয়।

আবিরকে মাঝে মাঝেই নয়না বলে—এবার সাবধান হও তা না হলে অকালে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করতে হবে।

খেতেই যদি না পেলাম, তাহলে থেকেই লাভ কি?

আজ সেলিমের বাড়িতে বাধা নেই। সুতরাং দিলখুশ। সাবিনার রান্নাঘর থেকে ভেসে আসছে তেলেভাজার জিভে জল আনা গন্ধ। তর যেন আর সয় না।

সেলিমকে বলেই ফেলে আবির—যাই বল মাইরি, তোর ঘরে এলে মনে হয়. এখানেই জীবনের সবকিছু।

তা যা বলেছিস। সাবিনা এই খাওয়ার ব্যাপারটায় যাকে বলে গ্লাস্তনস্তের হাওয়া বইয়ে দিয়েছে। মন যা চায়, বলে দাও। ব্যাস তা হলেই হল। বিবিসাহেবা নিয়ে এসে হাজির। সাবিনা কি বলে জানিস—এন্তেকাল তো একদিন হবেই তা হলে মনকে শুধু শুধু কষ্ট দিয়ে কি লাভ।

আহারে শুনেও মনটা জুড়িয়ে গেল। আমার নয়না যে কেন এমন হয় না জানি না।

আবিরের জিভে জল যখন আর বাধা মানতে চাইছে না ঠিক তখনই সাবিনা এল তেলেভাজা মুড়ি নিয়ে। খেতে খেতে বেশ রসিয়ে গল্প হল তিনজনে।

এমনিতে আবিরের মুখে কোনো আগল নেই। যদিও বাইরে থেকে দেখলে বোঝার কোনো উপায় নেই। ইদানীং অভ্যেসটা আরও বেড়েছে। সাবিনা উপভোগ করে এই সব হালকা রসিকতা। উপভোগ করে সেলিমও আর নয়না। বলে তোমার মুখটা এবার দেখছি ফেভিকল দিয়ে চিটিয়ে দিতে হবে।

সাবিনা বলে—জানেন আবির ভাই, চুপচাপ থেকে থেকে মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে উঠি। ঠিক তখনই আপনার কথা মনে পড়ে। আপনি যে কি করে এত সহজ হতে পারেন ভেবে অবাকও হয়ে যাই।

সেলিম বলে—কি যেন বললে, আবিরের কথা মনে পড়ে। তার অর্থ তো মনে হচ্ছে ব্যাপারটা অনেক গভীরে।

কি যে বলো! তুমিও দেখছি কম যাও না। কই আগে তো এমন ছিলে না।

বুঝতে পারছ না? গুরু ধরেছি।

হাসতে থাকে সাবিনা। সাবিনাকে হাসতে দেখলে আবির আগেও বলত, আজও বলল—"একবার হাসো তো দেখি, সোহাগ চাঁদবদনে ধনি হাসো তো দেখি"।

আপনি না...। দাঁড়ান নয়নাদিকে বলব, আপনার কর্তাটি একেবারে গেছে। বলব আপনার কর্তার বুড়ো বয়সে স্খলন শুরু হয়েছে।

ধমকিয়ো না তো। এ বান্দা কাউকে ভয় পায় না।

থাক, তবু যদি না দেখতাম।

মানে?

বলব?

বলো, যা মন চায় বলো, আর নয়নার কথা বলছ, বেশি কিছু করলে—নিমাই সন্ন্যাসে চলে যাবে। কেঁদে কেঁদে বান ভাসিয়ে দেবে ব্যাচারি। তখন বুঝবে—ঠ্যালার নাম বাবাজি।

সেলিম বলে—এক কাজ কর না। যে তোর ভাঙবে তার কাছেই চলে আয়।

মন্দ বলিসনি, ওঘর ছেড়ে এঘরেই চলে আসব তা হলে।

না, না, এমন কাজ করবেন না। তা হলে আমার খসম আপনার ঘরে চলে যাবে যে।

কথাটা তো তুমি ঠিক বলেছ সাবিনা। যদি তাই হয়, তা হলে তো বেশ ভালোই হয়, স্বাদ বদলে যাবে।

কি বললে? যা দেখছি তোমাদেরকে রাঁচি না নিয়ে গেলেই নয়।

আবির রে রে করে ওঠে—আরে দাঁড়াও। একটা আলোচনা সেরে নিই।

বুঝতে পারে না সাবিনা, হঠাৎ আবির এমন এই হালকা পরিমণ্ডলে কি আলোচনা করতে চাইছে। কিন্তু সেলিম জানে, আবির এমন কথা বলবে যে সবাই প্রথমে অবাক তারপরে তেড়ে যাবে আবিরের দিকে। তাই হাসছে আবির। তার হাসি দেখে সাবিনা বলে—আবার হাসা হচ্ছে। যতসব শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল।

মোটেও না মহাশয়া। আমি শুঁড়িও নয়, সেলিম মাতালও নয়।

তা হ্যাঁরে আবির কী আলোচনা সেরে নেওয়ার কথা বলছিস?

বলব, কি মহাশয়া, অভয় দেওয়া হচ্ছে তো?

সত্যি আপনি না...

পাগল। তাই বলছি রাঁচি আমরা যেতে পারি, থাকতে রাজি আছি পাগলা গারদেও। তবে একটা শর্ত আছে এবং এইটিই আজকের আলোচনা এবং তার থেকে সিদ্ধান্ত নেবার বিষয়।

ধানাইপানাই না করে বলে ফেলুন তো।

বলব, তবে শেষবারের জন্য একপ্রস্থ চা করে ফ্যালো।

ঘুষ?

না ম্যাডাম, এটা ঘুষ নয়। বাসনা। অবশ্য আরও একটা বাসনা আছে।

তাকাল আবির সেলিমের দিকে। তারপর চোখে চোখে কিছু কথা সারল সেলিম আবির।

এবার তা হলে বলি আমাদের বাসনাটা।

ওঃ, আপনারা না। শুধু টেনশনে রাখার চেষ্টা।

বেশ আর রাখব না।

আবির আবার তাকাল সেলিমের দিকে, তারপর ঠ্যালা দিল।

কী রে তোর বাসনাটা সেরে আয়। নয়না ছাড়া ঘরে আর দ্বিতীয় কেউ নেই। আমাকে আপাতত এই ঘরটা ছেড়ে দে।

এবার বুঝতে পারে সাবিনা, কি বলতে চাইছে ওরা দুজনে। চিৎকার করে ওঠে—ভালো হবে না বলে দিলাম। হ্যাঁগো, তোমরা কি একেবারে শেষ হয়ে গেছ?

আরে বুঝতে পারছ না কেন, সেলিমের আমার তো চলে যাওয়ার আগে বাসনাটা এখানে ফেলে রেখে যেতে হবে নাকি? তারপর তো আলোচনাটা সেরে নিয়ে বোঁচকা-বুঁচকি গোছাতে হবে। কি রে সেলিম ঠিক বললাম তো?

একশোবার, একশোবার।

থাক তোমাদেরকে আর রাঁচি যেতে হবে না। আমরাই এখানে পাগলা গারদ তৈরি করব।

এখনও যে আলোচনাটাই সারা হল না, তার আগেই সিদ্ধান্তে এসে গেলে?

সারতে হবে না। আমি চা করতে যাচ্ছি।

চলে গেল সাবিনা। হাসি ধরে না সেলিম-আবিরের। সেই প্রাণখোলা হাসি। যে হাসি হারিয়ে যাচ্ছে। হয়তো হারিয়ে গেছে সমাজজীবন থেকে। যে হাসির জন্য সমাজবিদরা লাফিং ক্লাব খুলতে পরামর্শ দিতে হচ্ছে।



কয়েকদিন ধরেই দেখছে আবির, নয়নার খুশি খুশি মুখ। গুনগুন গান গাইছে চলতে ফিরতে।

জিজ্ঞাসা করে আবির—কি গো, তোমার যে বেশ পরিবর্তন দেখছি!

হাসি মুখে মেখেই নয়না বলে—একটা গাছ মৃত্যুর কাছাকাছি এসে যখন বেঁচে ওঠে, ফুল দেয়, তখন প্রজাপতির তো খুশি হওয়ারই কথা। তাই না আবির।

নয়নার কথা শুনে রসিকতার লোভ সামলাতে পারেনি আবির, নেই স্বভাবসিদ্ধ রসিকতা—এই বয়সে কারও প্রেমে পড়লে না তো?

যদি তাই হয় তা হলে ভুল কোথায়?

না না, ভুল নেই। তবে সময় থেকে জেনে গেলে আমাকেও কাউকে না কাউকে ধরতে হবে। যাকে বলে ভাঙা কাচের গ্লাসের বদলে বিস্কুট।

কী বললে?

বললাম ওই তোমার বদলে তার...

ওঃ তুমি না...

বলো বলো, থামলে কেন!

আমি ভাবছি এক কথা, তোমার ধরেছে অন্য জ্বালা।

তোমার গুনগুন গাওয়া আর হাসি-হাসি ভাবখানার সহজ কারণটা বলে দিলে তো আর অন্য কিছু বলতাম না।

আচ্ছা তুমি কী গো, এতবড়ো একটা জয়! খুশি হব না!

নয়না তো খুশি হবেই। ওর রক্তের প্রতিটি কণিকাতে তো অনায়াস বিচরণ করছে মার্কসবাদ। কার মেয়ে দেখতে হবে তো।

নয়নার বাবা সুদর্শন সরখেল। সেই ১৯৬৪ থেকে বামপন্থী আন্দোলনের সাথে যুক্ত। বর্তমানে সি পি আই এম-এর বরিষ্ঠ নেতৃত্ব। বয়স হয়েছে বেশ কিন্তু আজও সমান দাপুটে এবং প্রভাবশালী। হরেরামপুর অঞ্চলে শেষ কথা বলার যদি কেউ থেকে থাকেন, তিনি হলেন সুদর্শন সরখেল। তরুণ তুর্কিরাও তার বিরুদ্ধে বলার সাহস দেখাতে পারে না। বলা যায় তার দূরদর্শিতা এবং দৃঢ় মনোভাবের জোরে

কোনো অন্তর্দলীয় কোন্দল মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি। অবশ্য চেষ্টা যে হয়নি তা নয়।

ওখানকার মানুষ বলে, সুদর্শনবাবুর ছটি চোখ, ফাঁকি দিয়ে কেউ কিছু করতে পারবে না। চারটি নাক—গন্ধ শুঁকে বুঝতে পারেন, কে কি ফুল নিয়ে খেলা করছে। কিন্তু মুখ ওই একটিই। যা বলবেন তাই হবে। সবচেয়ে বড়ো কথা তার সততা নিয়ে প্রশ্ন তুলবে—কী দল কী বিরোধী দল কারও ক্ষমতা নেই। তাই হয়তো সবপক্ষই তার কাছে আসে বিভিন্ন আলোচনা নিয়ে। কোনো ছুঁতমার্গ নেই ভদ্রলোকের। তেমনি তাঁর পাণ্ডিত্য। যা নয়নার গর্বের সবচেয়ে বড়ো জায়গা।

ঘরোয়া আলোচনাই হোক অথবা দলীয় সভাই হোক উনি একটি কথাই বলেন—মানুষ হল গিয়ে ময়দার মতো। ময়েন দাও, জল দাও, যেমন খুশি দলে যাও। তারপর লেছি করো—লুচি করো, রুটি করো যা খুশি হয় তাই করো। মচ্‌মচে করে ভাজাটাই হল আসল। তবে দৃঢ় হবে সংগঠন। নিশ্চিন্ত করা যাবে জয়লাভ। বদহজমও হবে না পেটও ভরবে।

এটা তো ঠিক, সাধারণ মানুষ যাদের সময় নেই কূটকাচাল করার, যারা বোঝে কেবল শান্তি, যাদের চেতনা মানে তুমি যে পথ দেখাবে তারা সেই পথই বুঝবে। তবে শর্ত ওই একটিই—যেটা তাদের আবেগ। ওখানে হাত দেওয়া যাবে না। হাত দিলেও মন বুঝে, সময় বুঝে, তাদেরকে বুঝিয়ে তবে না তেলের কড়াইতে ছাড়া। মূলকথা চেতনা শব্দটা ওদের কাছে বলতে হয় বলে বলা। না বললেও এমন কিছু আসে যায় না।

সভাতে কেউ কেউ বলে—দেখুন সরখেলবাবু, কিছু না পেলে কেউ আসে না, আপনি ময়দাই বলুন আর মানুষই বলুন।

আরে ভায়া, কোনো কিছু কি মাগনায় পাওয়া যায়, নাকি মেলে। অথবা স্থায়ীভাবে মেলে। তা হলে তো সমাজটা যাকে বলে বেশ্যাখানা হয়ে গেল। এই যে ধরো—আমরা জানি লোকটা হাড়শয়তান। সুযোগ পেলেই হড়কে দেবে। তাদেরকে স্থায়ীভাবে ধরে রাখতে হলে বলতেই হবে—তোমরা আমাদের সম্পদ। তখন দেখবে ওই সম্পদ তোমাকেই অনেক উপঢৌকন দেবে। তবে ওই একটা শর্ত, মচমচে করে ভাজতে হবে। মানে শক্ত করে ধরে রাখতে হবে ওদের রাশ।

এত সহজ করে বলতে পারেন সরখেলবাবু, যা শুনে নিরেট মূর্খ, বুদ্ধিমান, উঠানচালাক সবাই কুপোকাত হয়ে যায়। আর ওই যে তরুণ তুর্কিরা বা সুযোগ সন্ধানীরা—ওদের সরখেলবাবু বলেন, দ্যাখো বাপু, প্রতিটি ব্যাপারে একটি নির্দিষ্ট

সীমানায় থাকা ভালো। এই যে ধরো তুমি লুচি ভাজবে, উনুন যদি দাউদাউ করে জ্বলে তা হলে তো লুচি পুড়ে যাবে।·তবে হ্যাঁ কখনও কখনও দাউদাউ করে জ্বালাতে হয়। তখন ধরে নিতে হয় যে এখানে আখের রস থেকে গুড় করার দরকার।

ব্যাস সবাই চুপচাপ। সবাই তখন বুঝে যায়, এখানে পিরের গীত চলবে না। গাইতে হবে মার্গসংগীত, ঠুংরি, শাস্ত্রীয় সংগীত।

তার অর্থ এই নয় যে সুদর্শন সরখেল কোনো ভুল করেন না। বিশ্বকর্মার ভুল হয়। উনি তো সামান্য মানুষমাত্র। উনিও ভুল করেন। সে ভুল থেকে শিক্ষাও নেন। সে শিক্ষার আঁতুড়ঘর মার্কসীয় দর্শন। উনি গোঁয়ার্তুমি করে চেষ্টা করেন না সেই ভুলকে কফিনে ঢেকে আর একটা নতুন ভুলের সূচনা করতে।

আসলে উনি তো সনাতনবাবুর আমলের মানুষ। যাদেরকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। অনেক অনুশীলন করতে হয়েছে। প্রয়োগ করতে হয়েছে, দেখতে হয়েছে সফল কুফল। ঠিক ফুলের বাগানের মতো। পার্থেনিয়াম ধ্বংস করে ফোটাতে হয়েছে নানান সৌন্দর্য, নানান সৌরভযুক্ত ফুল। যারা কেবল শান্তি দেয়, তৃপ্তি দেয় বেদনাক্লিষ্ট মনকে।

সুদর্শনবাবুর মেয়ে এই নয়না। হলে কি হবে একটু যেন আবেগপ্রবণ। অবশ্য এটাই বাস্তব, হাজার হোক সে তো নারী।

এখনও পর্যন্ত পাঁচবার বিধানসভাতে ভোট দিয়েছে নয়না। বয়স প্রায় চল্লিশের দরজায়, এখনও তার সৌন্দর্যে ভাটার টান আসেনি।

আবির তার অলস সময়ে মাঝে মাঝেই বলে—তোমার ওই স্ত্রীরূপ অলংকারগুলো যদি আড়ালে রাখা যায় তা হলে মধ্যবিংশতি ছেলেরা পিছু ছাড়বে না।

দাঁত খিঁচিয়ে ওঠে নয়না—বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরেছে, কথার ছিরি দেখ না। লোকে শুনলে নির্ঘাত চ্যাংড়া বলবে।

আহা, আমি কি ওভাবে বললুম। আমি বলতে চাইছি, তোমার এই অফুরন্ত সৌন্দর্য এখনও মাতাল করার মতো। সত্যি বলছি নয়না, তুমি আর সাবিনা যদি রাস্তায় বেরোও, তোমাদের দিকে তাকাতে তাকাতে লোক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে যাবে।

গ্রহণ ভেঙে সূর্য যেমন মিষ্টি রোদ্দুর নিয়ে আসে, ছড়িয়ে দেয় পৃথিবীর উপরে, তেমনই হাসল নয়না।

তাই তো হয়। প্রায় সব মেয়েই চায় তাদের সৌন্দর্য সবার বর্ণনার বিষয়বস্তু

হোক। নয়না তার ব্যতিক্রম হবে কেন। সাবিনাও তো একই গোত্রের। অথচ কত সহজে নিজেদের তৃপ্তির বহিঃপ্রকাশকে আটকে দেয় গাম্ভীর্যের পর্দার আড়ালে।

নয়না আজ সেই অভ্যেসটাকে অনুশীলন করল আবিরের কাছে। আর আবির যেন ফিরে যেতে চাইল তাদের ফেলে আসা দিনগুলোতে।

এই নয়না, কাছে এসো, আমার নিশ্বাসের কাছাকাছি।

ওঃ বুড়োর যেন রস উপচে পড়ছে।

টিভিটা চলছে নয়নার ঘরে। একটা টেলিফিল্ম দেখাচ্ছে ই.টি.ভি। মহুলবনির সেরেঙ্গ। তারই মাঝে মাঝে রসালাপে মেতে উঠেছে আবির নয়না।

এই রসালাপ চলতে চলতেই ঘরে এসে ঢুকল সেলিম। ওর ইদানীং যখনতখন চলে আসা একটা অভ্যেসে দাঁড়িয়েছে। বাড়িতে আর কতক্ষণ কাটানো যায়। ওই স্কুলের সময়টুকু ছাড়া তার হাতে তো অঢেল সময়।

সেলিম এসেই রিমোট হাতে তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে দিল তারা নিউজে।

নয়না, সেলিম, আবির দেখল সপ্তমবার জয়লাভের পুনঃপ্রচার। সেলিম কেমন যেন উচ্ছ্বাসহীন। হওয়ারই কথা। এখনও তার মনে দগদগে ঘায়ের মতো যন্ত্রণা হচ্ছে দল তাকে বহিষ্কার করার জন্য। সেলিমের মনের খবর কেউ না বুঝলেও নয়না, আবির বোঝে। ওরা চেনে হাড়েহাড়ে। যে কখনও কোনো অপরাধ করেনি, যার ধ্যান-জ্ঞান ছিল, এখনও আছে তাহল মার্কসীয় দর্শন। যার হাতে অঢেল সুযোগ ছিল নিজেকে আর্থিক দিক থেকে চরম সমৃদ্ধিতে নিয়ে যাওয়ার অথচ সে পথে হাঁটেনি। তাকে দল সরিয়ে দিল অন্তর্দলীয় কোন্দলের বলির পাঁঠা করে। তার নামে বাজে কুৎসা রটাল বসন্ত, নজরুল, জিৎ রায়রা।

মিছিল চলছে, বাজি পুড়ছে, শ্লোগান উঠছে দিগন্ত কাঁপিয়ে, দেখাচ্ছে টিভি। রঙিন ছবি। সেলিমের মুখটা যেন কালো কালো আঁধারে ঢেকে যাচ্ছে।

নয়না দেখল হতাশ সেলিমকে। খারাপ লাগছিল তার। তাই হয়তো চেষ্টা করল অতীতের গল্প বলে ভারী পরিবেশটাকে হালকা করতে। বন্ধ করে দিল টিভি।

জানো সেলিম, সে বৎসর আমার বিয়ে হল, সবে মাঘ শেষ হয়েছে।

আবির বলে উঠল—অবজেকশন, ইয়োর অনার। নয়নার একার বিয়ে হয়নি। আমারও বিয়ে হয়েছিল ওই একই বছর, একই দিনে।

হাসল নয়না, ভুবনজোড়া হাসি। তারপর বলল—ও তুমি থামবে, না হয় ভুলই হয়ে গেছে।

দেন প্রোসিড।

প্রথম ফাগুনের হালকা আগুনের আঁচ সরিয়ে দিচ্ছে অবশিষ্ট উত্তুরে বাতাসকে। তখন বসন্ত। আমার বয়স সবে আঠারো শেষে প্রথম উনিশ। যদিও আমার বাবা আঠারো হতেই আমার নাম ভোটার তালিকায় তুলে দিয়েছেন।

আবিরের যেন ত্বর সইছে না। যেন বলতে চায় অনেক কিছু। তার বিবাহিত জীবনের প্রারম্ভিক মজার অবস্থা সম্বন্ধে, তাই বলে—তা হ্যাঁগো নয়না, তুমি বলবে নাকি আমিই বলব?

সেলিম একটু বোধহয় অবাকই হয়েছে। নয়না আবিরের বিবাহিত জীবনের কি এমন কথা যা বলার জন্য ছটফট করছে আবির, তাই দেখে।

সেলিম আবিরের চোখে চোখ রেখে বলে—কি ব্যাপার রে?সে এক আশ্চর্য কথা, যা শুনলে তুই অষ্টম আশ্চর্য বলতেও দ্বিধা করবি না।

বাব্বাঃ, তোরা যে সত্যিই অবাক করে দিলিরে।

আমিও তো কম অবাক হইনি।

নয়নার দুষ্টুমিভরা চোখ দেখছে আবিরকে, দুজনের তারায় তারায় হাসির আবেশ।

ওদেরকে দেখে সেলিম বলে—কি ব্যাপাররে, আমাকে সামনে রেখে তোরা কি আর একবার শুভদৃষ্টি বিনিময় করছিস নাকি? আর আমি ধৈর্য হারাচ্ছি।

নয়না বলে—এইতো, ধৈর্য না ধরলে চলে। বললেই তো ফুরিয়ে যাবে। দিল্লিকা লাড্ডু খাওনি কখনও? যতক্ষণ বাক্সে থাকে গোলাপি রং, নাদুসনুদুসু। মুখে দাও—সাথে সাথেই হাওয়া।

হয়েছে হয়েছে বুঝতে পারছি কবি, বিপ্লবী আবিরের বউ মানে সেও কবি, বিপ্লবী, এবার বলে দাও দেখি।

আবির বলে আরে দাঁড়া, একটু মহড়া সেরে নিই।

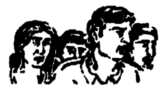
কি ধানাই-পানাই করছিস বল তো?

নয়না বোধ হয় আর সাসপেন্সে রাখতে চায় না, কারণ বেচারা সেলিম অধৈর্য হয়ে যাচ্ছে। এবার হয়তো রেগে উঠেই চলে যাবে। তাই বলে—কি গো, এবার তা হলে বলি?

আবির তাড়াতাড়ি বলে—আমিই বলি। নাকি সেলিম?

যে পারিস বল, আর অপেক্ষা সইছে না।

অথচ একদিন দলের কথা অনুযায়ী "কমরেড সেলিম সবার কাছে অনুকরণযোগ্য' এই গর্ব বুকে নিয়ে নিশ্চিন্ত ছিল সে। অবশ্যই পূর্ণ বিশ্বাসের জমানায়।



নয়ের দশকের মাঝবরাবর। দল বলছে তরুণ তুর্কিদের কথা। দল বলছে আরও সদস্য বাড়াতে হবে। কিন্তু কিভাবে, কোন্ পদ্ধতি মেনে। উচ্চতম নেতৃত্ব চায় গঠনতন্ত্রের নিয়ম মেনে যা কিছু করা উচিত। কিন্তু গ্রামীন নেতৃত্ব, আঞ্চলিক নেতৃত্ব —তারা বোধহয় তা চায়নি। বাড়ল সদস্য, প্রায় গুণিতক হারে, গুণগত মান যাই থাক না কেন। শুরু হল অন্য জোয়ার। অন্য জোয়ারই তো যারা বিন্দুমাত্র পাঠ নেয়নি অথবা আলোচনা শোনেনি মার্কসীয় ভাবনার, তারা তো অন্য জোয়ারই আনবে। এই শ্রীবৃদ্ধিতে সত্যিই কি নিশ্চিন্ত হয়েছিল, নির্ভরতা পেয়েছিল উচ্চতম নেতৃত্ব। যাদের প্রতিটি রক্ত বিন্দুতে মিশে আছে মার্কসীয় দর্শন। যাদের নির্ভেজাল ত্যাগ আজকে এই জায়গায় নিয়ে এসেছে দলটাকে। নাকি তারা ধৃতরাষ্ট্র হয়ে চমৎকৃত হচ্ছিল যে সে বহুপুত্রের জনক।

যেমন হয় প্রত্যেকবার। ধন্যবাদ জানানো হল জয়লাভের কারিগরদের। ভোটদাতা জনগণকে। বলা হল আপনারা পুনরায় আমাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন আমরা আমাদের সমগ্র ক্ষমতা দিয়ে তা পালন করব। বলা হল আপনাদের জানাই রক্তিম অভিনন্দন।

সবুজ আবিরের দল হতাশার অন্ধকারে লুকিয়ে রাখল নিজেদের। দিকে দিকে চলছে তাসা মাদল, ধামসা, ঢাক সহকারে সুদীর্ঘ মিছিল। তাদের ভাষায় নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার।

বেচারা নির্বাচন কমিশন। ভালো করতে এসে বলির পাঁঠা হয়ে গেল দুপক্ষের কাছেই। ওদের হয়েছে যাকে বলে ভাঙা দাঁত, ক্ষত মাড়ি নিয়ে কাচ চিবোনার মতো অবস্থা। ছানি পড়া চোখ নিয়ে মানুষের মনের ভিতরে লেখা পড়তে আসা, কথাগুলো বলেছিলেন অনুকুলবাবু। ভোটের ফল বেরোনোর পরে ওই মদনের দোকানেই।

হেসেছিল মদন। খ্যাঁক খ্যাঁক শব্দ তার হাসিতে। বলেছিল—এবার কি ভাবছেন? নাকি আশায় আশায় থেকে এখনও মরা গাছে জল ঢেলে যাবেন?

খারাপ লেগেছিল মদনের কথাটা। দুঃখও পেয়েছিলেন অনুকুলবাবু। কিন্তু কিছু

বলার মতো অবস্থা ছিল না তার। তা ছাড়া সেখানে আবির, সেলিমও ছিল, যা গরম হাওয়া, কিছু বললে যদি উলটোপাল্টা কিছু হয়। চা-টুকু গলায় ঢেলে নিয়েই সেদিন দোকান ছেড়ে চলে গেছলেন অনুকুলবাবু।

সেলিম অনুকুলবাবুর কথাগুলোই ভাবছিল। ভাবছিল নয়নার ঘরে বসে। অনুকূলবাবু হয়তো ঠিক বলেছেন। এরাজ্যে কারও কোনো ভূমিকা কাজে আসবে না। কারণ দলের শিকড় অনেক গভীরে।

সেলিমকে এমন গুমরে থাকতে দেখে নয়না জিজ্ঞাসা করল—কিগো সেলিম, কি এত ভাবছ? যা হয়েছে হয়েছে, সব ভুলে আবার নেমে পড়ো ময়দানে।

তুমি তো নেমেছ, তা হলেই হবে।

ঘর সামলায় নয়না। ঘরের খবর তার নখদর্পনে। তার চোখ বাইরেও। সে মনের খবর রাখে অনেকেরই। আবির ধারালো ছুরি হলে নয়না যেন ব্লেড। হবেনাই বা কেন, তার রক্ত যে সুদর্শন সরখেলের রক্ত। তা না হলে বড়ো লজ্জার ব্যাপার হত নয়নার কাছে।

সেলিমের কথা শুনে হাসছে নয়না। আশ্চর্য ব্যাপার, নয়নার এত হাসি আসে কোথা থেকে! তার কি দুঃখবোধ ব্যাপারটা একবারেই নেই! নাকি থাকলেও তাকে ঢাকা দিয়ে রাখে হাসির আড়ালে। যেমন সুদর্শনবাবু সমস্ত সমস্যা, সমস্ত দ্বন্দ্বকে আড়ালে রাখে যুক্তি আর রসিকতার সাহায্যে।

সেলিম নয়নাকে হাসতে দেখে বলে—সত্যি নয়না, তোমাকে মাঝে মাঝে আদাব জানাতে ইচ্ছে করে।

তা হলে জানাও, ইচ্ছেকে চেপে রাখলে আবার পেট গুড়গুড় করবে। থাক ওসব, কি খাবে বলো। আমার কিন্তু ভীষণ খিদে লাগছে।

নিয়ে এসো, তোমার মন যা চায়।

আবির বলে—চলো বাইরেটায় বসি। বেশ বাতাস আছে।

পশ্চিম আকাশটা ধীরে ধীরে লাল রং মাখছে। লাল রং মেখেছে সূর্যটাও। আর একটু পরেই সন্ধে নামবে।

জিজ্ঞাসা করে সেলিম—হ্যাঁরে আবির এখন তো শুক্লপক্ষ, তাই না?

হ্যাঁ, তা হঠাৎ কেন জিজ্ঞাসা করলি।

না এমনি।

জনার্দনপুর গ্রামটাকে সবুজ ঘিরে রেখেছে চারদিক থেকে। যেমন বর্ধমান রাজ-

বাড়িকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে পরিখা। গ্রামটায় অনেক ছোটোবড়ো পুকুর। শহর হলে ভরাট হয়ে যেত কবে। গাছ কেটে নেয়নি ফড়েরা। অনেক পুরানো গাছ, সেই পূর্বপুরুষের আমলের। এরা যেন চূড়ান্ত অহংকার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাথা তুলে। সমস্ত গ্রাম সবুজের ঘ্রান মাখে প্রতিটি সময়। ভিজে বাতাস বয়ে যায় সবুজ ছুঁয়ে ছুঁয়ে। শান্ত হয় কর্মক্লান্ত শরীর।

সুখ যদি কোথাও থাকে সে এখানেই। বাতাসে দুষণ নেই, নেই শিল্পের শব্দময় হুঙ্কার। মানুষের সাথে মানুষের রাজনৈতিক বৈষম্য হয়তো আছে, আছে দারিদ্র। তবু বাতাসে ভাসে বৃন্দগানের সুর। একে অপরের কুশল সংবাদ নেয় প্রতিদিন। সরস্বতী পুজো, শীতলা পুজো, বিজয়াদশমীতে আজও যাত্রাপালা করে গাঁয়ের ছেলেরা। শুধু ছেলেরাই বা বলা যাবে কি করে। অনুকুলবাবুও তো ওদের সাথে মিশে যান। আবিরও মাঝে মধ্যে অংশ নেয় অভিনয়ে। সংগীতানুষ্ঠান হয়। গাজনে তরজা গানে গানে মেতে ওঠে গাজনতলা। ব্যান্ডে "চোলি কা পিছে, চুনরি কা নীচে"র সুরে কোমর দোলায় ছেলে-ছোকরারা। ভিড় জমে নয়নাদের ঘরে, অনুকুলবাবুদের ঘরে, অবনীর ঘরে।

নয়না বলে, আবির বলে—আমরা রাজনৈতিক ভাবে যে মেরুরই হই না কেন, সবার আগে আমরা সমাজবদ্ধ মানুষ। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দল আসবে ক্ষমতায়, তারা চলবে তাদের মতো করে, কিন্তু সমাজ .... কে কি বলবে, কে কি করবে জানি না। জেনে লাভ নেই। আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি পূর্বপুরুষদের সংস্কৃতি, বিশ্বাস করি, আমরা একে অপরের জন্য। আমরা ব্যক্তিগতভাবে কোনো বিচ্ছিন্ন দ্বীপের বাসিন্দা নয়।

কেউ কেউ মাঝে মাঝে মজা করে বলে, তোমরা তো কমিউনিস্ট, যা করছ তাতো কমিউনিস্ট বিরোধী।

উত্তর দেয় আবির—সবার আগে মানুষ। তাছাড়া এটা রাশিয়া নয় বাংলা, ভারত। চিনে কি বৌদ্ধমূর্তি নেই, নাকি সেখানে মানা হয় না বুদ্ধং শরণম গচ্ছামি"। রাশিয়াতে কি লেনিনের আবক্ষমূর্তিতে মালা দেওয়া হয় না, যদিও তিনি আমাদের মতো রক্তমাংসের মানুষ, কিন্তু ওরা তো তাঁকে যাকে বলে ঈশ্বরের মতো মনে করেন।

মন দিয়ে শোনে সমালোচক। আসলে এইটেই তো জানতে চায় সবাই। আর এই জন্যই সবার প্রিয় আবির, নয়না। এদের জাতপাত নিয়ে কোনো উন্নাসিকতা নেই। তাই হয়তো মাঝেমাঝেই গাঁয়ের হতদরিদ্ররা, সে যে জাতেরই হোক চলে

আসে নয়নার অন্দরমহলে। গল্প করে, টিভি দেখে, অভাব অভিযোগের কথা জানায়। নয়নারা তাদের সাধ্যমতো কোনো কোনো দিন বাচ্চাদের হাতে খাবার দেয়। তখন মনে হয় এই হল সর্বধর্মের সনাতন ভারতবর্ষ। অবশ্য এসবের জন্য যা সবচেয়ে বেশি দায়ী তা হল সামগ্রিক শিক্ষা। এখানে দারিদ্র হয়তো আছে কিন্তু অশিক্ষা প্রায় নেই বললেই চলে।

নয়নারা একটা রঙিন টিভি কিনেছে মাসকয়েক হল। আগে ছিল সাদাকালো, তিনটে মাত্র চ্যানেল ছিল। এখন কেবল অপারেটররা ব্যাবসার জাল বিছিয়েছে গাঁয়ে গঞ্জেও মাকড়সার জালের মতো।

রঙিন টিভিটা হয়তো এত তাড়াতাড়ি কেনা হত না, অভীক বাড়িতে থাকলে। অভীক বড়ো হয়েছে, তবু তার পিছনেই পড়ে থাকতে হত নয়নাকে।

মা এটা দাও, মা ওটা দাও, মা আমার কাছে বসবে এসো, মা মাথার চুলগুলো টেনে দাও।

বলতো নয়না—হ্যাঁরে, আর দুদিন পরে তুই যখন বাড়ি ছাড়বি, তখন এসব কে করে দেবে?

তখন যা হবে হবে, এখন তো তুমি আছ।

অভীক যে বড়ো হয়েছে, তার আচার আচরণ, কথাবার্তাতে বোঝা যেত না। অভীক যখন কলকাতায় যাবে বলে ঠিক হল তখনই বলল অভীক—মা, তোমার ভীষণ একা একা লাগবে, তাই না। এক কাজ করো এখানে তো কেবল লাইন চলে এসেছে, রঙিন টিভি নিয়ে নাও অবসর সময়টা কেটে যাবে।

কত আর রোজগার, আবিরের, করে তো জুনিয়র হাই স্কুলের শিক্ষকতা। আছে বলতে বিঘে পাঁচেক জমি, একটা পুকুর। তাও সময় পায় না আবির। দলের কাজ আর দলের কাজ। ভাগ্যিস গাঁয়ের মানুষগুলো ভালো, তারাই সবকিছু দেখাশোনা করে দেয়। তা না হলে সংসার চালানোই দায় হত। তার পর আছে ব্যাংকঋণ। বাড়িটা না করলেই চলত না। সেই কবেকার আমলের বাড়ি, ইঁদুর গর্তে ভরতি। দেওয়াল ফেটে চৌচির, টিনগুলো ফুটো হয়ে গেছে, বর্ষায় জল পড়ে ফুটো ধরে।

বলেছিল নয়না—হ্যাঁগো, অভীক যখন বলছে একটা রঙিন টিভি কিনতে, তখন বাবাকে বলিনা—বাবা তোমার নাতির জন্য একটা রঙিন টিভি কিনে দাওতো, তুমিতো বিয়েতে কিছু চাওনি। তা ছাড়া বাবার তো অনেক আছে। আমরা তিনবোন ছাড়া কোনো ভাইও নেই।

হঠাৎ বদলে গেল আবির—দ্যাখো নয়না, কতবার তোমাকে বলেছি ওসব তুমি আমাকে বলবে না। তা ছাড়া আমি পছন্দ করি না কারও দান নিয়ে কিছু করতে। আমার পরিশ্রম থেকে যা আসে তাই নিয়েই আমি খুশি।

কেন? অনেকেই তো ....

নিতে পারে। সেটা যে যার অভিরুচি। আমার পক্ষে নেওয়া সম্ভব নয়।

বাবার যা কিছু একদিন তো আমাদেরকে নিতেই হবে।

সুপর্ণা নেবে। তার তো ভালো করে সংসারই চলতে চায় না তার উপর সুজয়ের এতবড়ো অসুখ।

তুমি কিচ্ছু নেবে না?

না গো, দরকার হলে তোমার বাবা তার অসময়ে এখানে থাকবে। এবং সেটাই তোমার কর্তব্য।

অদ্ভুত মানুষ তো তুমি!

আচ্ছা তুমিই বল তো, আমার বোনেরা কি আমার বাবার কোনো কিছু নিয়েছে, নাকি চেয়েছে; সবই তো আমাকেই দিয়েছে।

দান নিতে চায়নি আবির, পণ নেয়নি বিয়ের সময়। ভালো লেগেছিল বলে নয়নাকে বিয়ে করে ঘরে এনেছিল। অবশ্য তার জন্য সবচেয়ে যিনি বেশি দায়ী তিনি আবিরের বাবা সত্যব্রত রায়। তিনি প্রথমদিন নয়নাকে দেখতে গিয়েই বলে এসেছিলেন—সুদর্শনবাবু, আপনি পাঁজিপুথি দেখে দিন স্থির করুন, এখানেই আমার একমাত্র ছেলের বিয়ে হবে।

তা না হয় হল, আপনার ছেলের তো একবার আসা উচিত।

সেটা বা ঠিক কথা, আপনার মেয়ের আমার ছেলেকে পছন্দ নাও তো হতে পারে।

আবিরকে একরকম জোর করে পাঠিয়েছিলেন আবিরের বাবা। তারপর বিয়ের দিন স্থির করে এ বাড়ির বউ হয়ে চলে আসা। যার জন্য আসা তিনি থাকলেন না বেশি দিন, অভীক তখন দশ মাসের, সবার মায়া ত্যাগ করে চলে গেলেন বিপত্নীক সত্যব্রতবাবু।

আবির পণ নেয়নি, এমনকী কোনোকিছুই কোনোদিন নেয়নি সুদর্শনবাবুর কাছ থেকে, যদিও না চাইতেই অনেক কিছু পেয়েছে নয়না। তাও কত কায়দা করে দিয়েছেন সুদর্শনবাবু।

জানো আবির, নয়নার মা বলত তোমার বড়ো মেয়েকে একটা ডিভান করে দিয়ো। ওর সবকিছু সাজানোর খুব শখ। কিছু মনে কোরো না বাবা, তোমার মৃতা মায়ের ইচ্ছার দামটুকু না দিলে তাঁর আত্মার শান্তি হবে না, তাই নিয়ে এলাম।

এইভাবে কত কী দিয়েছেন সুদর্শনবাবু, আবির রেগে যেত।

এসব চলাকির আশ্রয় নিয়ে তোমার বাবা দিয়ে চলেছেন। এরপর যেন না দেন।

সেলিম শুনছে নয়নার কথা, কৃষ্ণচূড়ার তলায় বসে। শুনছে নয়, অবাক হয়ে শুনছে না শোনা কথাগুলো। এতদিনের সম্পর্ক আবিরের সাথে, নয়নার সাথে, কিন্তু কোনোদিন কেউ বলেনি।

যদিও সেলিম জানে আবির দলের ভারী নেতা হয়েও কামাই করেনি এহাত ওহাত করে। তা যদি করত তাহলে আজকের জিৎ রায় অথবা নজরুল বসন্ত হতে কোনো কষ্ট হত না। এতখানি প্রিয় হত না মানুষের চোখে। আসলে জনার্দনপুরের এই রায় সংসারগুলো সারাজীবন শুধু দিয়েই গেল, নিল না কিছুই। রায় সংসারই বলব কেন, মান্না সংসারগুলোও তাই। অনুকূল মান্না হয়তো বামপন্থী করেন না। না করুক, কিন্তু ত্যাগের প্রশ্নে, সততার প্রশ্নে সন্দেহাতীত।

আবিরের কোন ভাবান্তর হয়নি নয়নার সাতকাহন শুনে। ও আসলে এমনই। কোনো প্রশংসা ওকে বদলে দিতে পারেনি কখনও। ও মনে করে মানুষের অনেক দায়িত্ব, কর্তব্য, সেগুলো পালন করাটাই আসল। সেখানে সমালোচক আসবে, তোশামোদকারী আসবে, বদনাম দেবে, তোয়াজ করবে। কি আসে যার তার জন্য।

সেলিম দেখছে আবিরকে, যেন নতুন করে। দেখছে নয়নাকে। সে যেন আজ সবকিছু বলতে চায়।

জানো সেলিম আমি ভাগ্যবতী, এর মতো একজনকে পেয়ে। ঈশ্বর বলে যদি কিছু থাকে, আমি প্রার্থনা করি সবাই যেন আবির হয়।

এবার রসিকতা শুরু করল সেলিম—তা হলে দেখছি এখানে আমার আসা চলবে না।

সেলিমের ছুঁড়ে দেওয়া আলটপকা কথায় হতবাক হয়ে গেছে নয়না। এ আবার কী কথা, সেলিম কেন এসব কথা বলছ।

হাসছে আবির। কারণ সে খুব ভালো করে জানে সেলিম কেন একথা বলল।

প্রাথমিক আশ্চর্যময়তা কাটিয়ে জিজ্ঞাসা করে নয়না—কি হল, এটা বললে কেন?

কারণ আছে।

সেইটেই তো জিজ্ঞাসা করছি।

আরে এতে না বোঝার কি আছে। তুমি যদি পুরোটাই আবিরময় হয়ে যাও, আমার দিকে কি নজর দিতে পারবে? আর তা যদি না দাও তাহলে বাঁশপাতা সবুজ, খেতে ভালো জেনেও তো তাকিয়ে থাকতে হবে সোজা দাঁড়িয়ে থাকা বাঁশগাছটার দিকে, ঘাড়ে ব্যাথা ধরবে না?

হো হো করে হেসে ওঠে নয়না। হাসি যেন থামতে চায় না। হাসে আবিরও। দেখলে নয়না, ব্যাটার লোভ কেমন, ও কিনা আমার বউ-এর দিকে নজর দেয়। দাঁড়া তোর বাড়ি যাই, তোর বউটাকে ....



তখনও সেলিমের সদস্যপদ কেড়ে নেওয়া হয়নি। যদিও প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে বসন্ত, নজরুলরা।

একটা মিটিং চলছিল দলীয় কার্যালয়ে। বেশ বিরক্ত হয়েই সেলিম বলেছিল এগুলো হচ্ছেটা কী। এতে কি দল সত্যিকারের সমৃদ্ধ হবে, বাড়বে গুণগত মান? নাকি সংখ্যাগত মান বাড়ানোর জন্যই কোনোরকম বাছবিচার অথবা শিক্ষা না দিয়েই ঢালাও সদস্য পদ বাড়ানো হচ্ছে। এটা কী বোঝা যাচ্ছে না, ওরা দলকে হাতিয়ার করে নিজেদের আখের গোছানোর খেলায় মেতেছে।

হেসেছিলেন প্রদীপবাবু। লক্ষ করেছিল সেলিম। লক্ষ করেছিল আবিরও, পূর্ণ বিশ্বাসেরও নজর এড়িয়ে যায়নি।

সেই ত্যারছা হাসি দেখে দ্বিগুণ বিরক্ত সেলিম তার বিরক্তি চেপে বলেছিল—বিনা লগ্নিতে সবচেয়ে বেশি রোজগারের পথ যদি ওই সব বেনোজলদের উদ্দেশ্য হয় তা হলে অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে দলের। আমি জানি তাদের। তাদের উদ্দ্যেশ্যে বলছি—আপনারা সংযত হোন, নিজেদেরকে সংশোধন করুন। মনে রাখবেন অনেক রক্ত-ঝরা, অনেক ত্যাগের বিনিময়ের এই পথ, অনেক কৃচ্ছসাধনের মধ্য দিয়ে আমরা আজ এখানে এসে দাঁড়িয়েছি। আরও অনেক দূর পথ। আমাদেবকে যেতে হবে। এখানে থেমে থাকার অর্থ আমাদের আত্মসন্তুষ্টি। আত্মসন্তুষ্টি থেকে শুরু হয় অবক্ষয় একথা আমার নয়, ঐ যে দেওয়ালে টাঙানো ছবি দেখছেন। দেখছেন ওই আবক্ষমূর্তি, উনি সনাতনদা—সনাতন রায়, একথা উনি বলেছিলেন।

আবির বলেছিল যা দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে, পৃথিবীতে সবচেয়ে ভালো কামাই-এর জায়গা বোধহয় রাজনীতি নামক প্রফেশন। যদিও সবার ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয়।

সদ্য সদস্য পদ পাওয়া কলেজ পড়ুয়া কুমারেশ বোধহয় তার অভিজ্ঞতার কথাই বলল—কেন পুলিশে কি নেয় না, সরকারি কর্মচারীরা কি উপরি কামাই করে না। আজকাল সব প্রফেশনই উপরি কামাইদের কারখানা হয়ে গেছে। এটা বুঝতে পারছেন না কেন? শুধু শুধু রাজনৈতিক দলের লোককেই বা বলছেন কেন?

জানি, তুমি কি বলতে চাইছ। তোমার কথাগুলো একশোদশ শতাংশ ঠিক। এটাও তো ঠিক, আমাদেরকে চোখ-কান খোলা রেখে, সততা নিয়ে লক্ষ রাখতে হবে, ব্যবস্থা নিতে হবে। দরকার হলে আন্দোলন করতে হবে। দেখবে একদিন পরিবর্তন হবেই, আসবে স্বচ্ছতা। মানুষ হয়রানি ভোগ করবে না। যথেচ্ছাচার আর আইন ভাঙার খেলায় কেউ ব্রতী হবেন। সবার আগে আমাদেরকে সৎ হতে হবে। সাহসী হতে হবে। আমরা ওরা নয়। দল এখন চেষ্টা করছে ওই সব পচা আঙুলকে ছেঁটে ফেলার। কিন্তু এটা কেন হবে? কেন আমরা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথকে এভাবে পিচ্ছিল করে দেব, কেন ওরা আঙুল তুলে বলবে কাগজের এপিঠ ওপিঠ একই।

জোনাল কমিটিতে হেরে গেল সেলিম।

কথায় বলে দশচক্রে ভগবান ভূত। প্রদীপ সরখেল ঢালাও সদস্য পদ বিতরণ করে হারিয়ে দিল সেলিমকে। আনা হল সুরেশ মুখুজ্যেকে।

সুরেশ মুখুজ্জে। ভদ্রকালীচক। একমাত্র ছেলে রামতনু মুখুজ্যে। এম.এ.। সদ্য চাকরি পাওয়া। তার বিয়ে দিলেন তিন লক্ষ টাকা পণ, এর সঙ্গে বরের দাবি মোটরবাইক, দেড় ভরির সোনার চেন। ছিলেন হত দরিদ্র পূজারি ব্রাহ্মণ। সনাতনবাবুর দয়ায় দলীয় সদস্য। আজ জোনাল কমিটির সম্পাদক সেলিমের স্থলাভিষিক্ত।

কেউ দেখলে বুঝতে পারবে না ওদের অবস্থা কোন তলানিতে ছিল। জায়গা কিনেছেন ভদ্রকালীচকের রাস্তার ধারে। বাড়ি করেছেন। তাও আবার বাগানবাড়ি, বাড়ীর নাম দিয়েছেন "শান্তিনীড়"।

কথায় কথায়, অবশ্য নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে, জিজ্ঞাসা করেছিলেন অনুকূলবাবু—কি সুরেশবাবু, ছেলে তো হিরের টুকরো, তা কি নিলেন ছেলের বিয়েতে?

চটজলদি উত্তর দিলেন সুরেশবাবু—কি যে বলেন। আপনাদের ওই যাকে বলে কেবল খোঁচা মারা অভ্যেস।

না না, সবাই বলছে তো। রামতনু নাকি রাজ্য এবং রাজকন্যা দুই পেয়েছে।

আরে, পণ নেওয়া এবং দেওয়া দুটোই সমান অপরাধ। আমরা এসবের বিরুদ্ধে ক্রমাগত আন্দোলন চালাচ্ছি।

তবে যে শুনলাম, আপনি তিন ....

বলতে সুযোগ দেননি কমরেড সুরেশ মুখুজ্জে—দেখুন ওসব আজেবাজে বলবেন না। তবে হ্যাঁ কেউ যদি তার মেয়েকে দেয়, আমি কি ফিরিয়ে দেব।

একটু যেন ভাবলেন সুরেশবাবু তারপর বললেন—আচ্ছা অনুকূলবাবু, আপনি আমাকে বলছেন কেন? কই শেখর ঘোষ, যে তার ডাক্তার ছেলের জন্য টাকা, মারুতি গাড়ি নিল, তখন তো আপনার কিছু মনে হয়নি। নাকি তিনি আপনার দলের লোক বলে সাতখুন মাফ।

জানেন তো সুরেশবাবু, আমাদের লোকেরা নিয়েই থাকে। কিন্তু আপনি হলেন গিয়ে ....

নিমন্ত্রণ সেরে ফিরে এসেছেন অনুকূলবাবু। এসেই ঢুকেছেন মদনের চা দোকানে। কথাটা তুললেন অনুকূলবাবু, অবনী ছিল সেখানে, সে তো শুনেই বলে এরা যদি হর্তাকর্তা হয় তাহলে দেশের প্রগতি আটকাবে কে।

একবছর হয়ে গেল রামতনুর বিয়ে হয়েছে। কিন্তু বউমার হাতের রান্নার আর স্বাদ নেওয়া হল না মুখুজ্যেবাবুর। কিছু বলারও উপায় নেই। বললেই বউমা বলে—আপনার আগেই বোঝা উচিত ছিল, বাবা অনেক টাকা দিয়ে আমাকে চাকরানি করে পাঠাননি।

এবার ঠ্যালা সামলাও। সরেশবাবু না পারেন ঘর সামলাতে না পারেন মনের দুঃখ খোলসা করে কাউকে বলে একটু হালকা হতে।

যদিও সমাজে উলটো ঘটনাটাই ঘটছে বেশি। নারী নির্যাতন, বধূহত্যা হামেশাই হচ্ছে। তাদের বাড়ির রং তেরঙা, নাকি লাল, নাকি সবুজ অথবা গেরুয়া সে প্রশ্ন অবান্তর। তারপর যা হয় আসামি পলাতক।

আরে বাবা পালিয়েই যদি যাবি তা হলে এসব করলি কেন? নাকি বীরপুঙ্গবরা কেবল বউ ঠ্যাঙানোর সময় ওস্তাদ। বাকি সময় ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।

সেলিম নারীবাদী নয়। আবির আবার একটু সংরক্ষণশীল। তবুও ওরা সহ্য

করতে পারেনি ওই সব নির্যাতন বা প্রথা। অনেকে বলে এসব হলে কি করা যাবে। হয়তো যাবে না দেশে যতই আইন থাক। ধনঞ্জয়ের যে কারণে ফাঁসি হল, আজ কি সমাজে তা ঘটছে না? হামেশাই ঘটছে, পার পেয়ে যাচ্ছে টাকা দিয়ে, ক্ষমতার জোরে। তা হলে সমাজ বদলাবে কি করে। শেখরবাবু কংগ্রেসের নেতা। তিনি তো জনসভায় বলেন বধু নির্যাতন, বধূহত্যা, পণ নেওয়া দেওয়া সমাজে সবচেয়ে বড়ো অপরাধ। সুরেশবাবুও বলেন, এবার আরও বেশি বেশি বলবেন, সমাজ বদলাবে না, বদলাবে না ওই সব কুপ্রথা।

আসলে সেলিম আবিররা বড় একা, সুবিমল চক্রবর্তীর একার ক্ষমতা নেই বদলে দেওয়ার। পূর্ণ বিশ্বাস বিশ্বাস জন্মানোর আগেই প্রদীপ সরখেলের হাতে নাজেহাল হয়ে যান। অনকূল মান্না সবাই নয়। শেখরবাবুদের পাল্লা বড্ড বেশি ভারী। বিনায়ক রায় জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড হলেও সদ্যআগত।



সেলিমের সমাজ আরও ভয়ঙ্কর, মুসলিম হয়েও সেলিমের অপছন্দ ওদের কিছু কিছু নিয়ম কানুন। মাঝে মাঝে তসলিমা উঠে আসে সেলিম, আবির, সাবিনা, নয়নাদের আলোচনায়।

সেলিম একটু বেশি পছন্দ করে তসলিমাকে, তাই বলে—আমাদের সমাজে এমন অনেক তসলিমা জন্মালে ভালো হত।

জিজ্ঞাসা করেছিল আবির—তোর হঠাৎ এত তসলিমা প্রীতির কারণটা কি?

যদিও আবির তেমন ভাবে পছন্দ করে না তসলিমাকে, আবির বলে—ও বড্ড বেশি খোলামেলা, এটা যে কোন্ সংস্কৃতি আমি বুঝতে পারি না।

আবিরের বক্তব্যের উত্তরে সেলিম বলেছিল—জানিস আবির এই সব ধর্মীয় নেতারা নিজেদের অবস্থানকে মজবুত করার জন্য, নিজেদের ধারণাকে অপরের উপর চাপিয়ে দেওয়ার জন্য ধর্মের বাণীকে বিকৃত করে, মনগড়া করে মানুষের মনে ঢুকিয়ে দেয়, প্ররোচিত করে। অথচ দ্যাখো ধর্মের মূলকথা মানুষকে সৎ, আদর্শবান, নির্লোভ, সাহসী করে তোলা। কিন্তু যা হচ্ছে তা কখনও বিভিন্ন জাতের মধ্যে বিভাজন রেখা প্রকট করা বা সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি বাঁধিয়ে রাখার শ্রেষ্ঠ প্রয়াস ছাড়া অন্য কিছু নয়। সমাজ উপকৃত হয় না, অস্থিরতার মধ্য দিয়ে চলতে থাকে সমাজ। অবশ্য ধর্মীয় মাতব্বরদের আখেরে লাভ হয় বেশি।

অবাক হয় আবির, আশঙ্কা জন্ম নেয় তার মধ্যে, কারণ সে জানে মুসলিমরা ক্ষমা করে না তাদের বিদ্বেষীদের। তবু সে জানতে চায় সেলিমের মতামত তাদের কিছু কিছু প্রথা নিয়ে।

আচ্ছা সেলিম তোরা এই তালাক ব্যাপারটাকে নিয়ে কি মনে করিস?

ভীষণ বাজে ব্যাপার এটা, স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন সূর্য আর পৃথিবীর মতো। এখানে বহুগামিতার প্রবণতা মানে অস্থিরতা। বলতে পারিস এটা একটা নেশা। এই নেশা বন্ধ করা উচিত ধর্মীয় শ্রেষ্ঠদের। অথচ দ্যাখো, তারাই প্রশ্রয় দেয়, অনুমতি দেয়। এমনকী বিচ্ছেদ এবং নতুন করে শাদি দেওয়া সবই করেন তারা। আচ্ছা আবির এর থেকে তো তয়াকফের কাছে যাওয়া ঢের ভালো, তাই না?

হাসে সাবিনা, আবার ভয়ও পায়। এইসব আলোচনা যদি বাইরে চলে যায়, না জানি কি ঝড় উঠবে। যদিও সে জানে আলোচনাটা এমন চারজনের মধ্যে হচ্ছে, যারা এটা প্রচার করবে না কোনোদিন।

আজ সেলিম যেন অনেক কিছু বলতে চায় নিজেদের নিয়ে। আজ যেন সে বাধাবন্ধনহীন খরস্রোতা। তার প্রয়োজন নেই অন্যদিকে তাকানোর। অন্যকিছু ভাবার। বয়ে যাওয়ার আনন্দ তার শিরায় শিরায়। তার খেয়াল নেই একটু পরেই সন্ধে নামবে। তার খেয়াল নেই তার বিরুদ্ধবাদীরা সুযোগ নিতে পারে।

সেলিম বলে জানিস আবির—ভাবতে অবাক হতে হয়, একজন মুসলিম হয়ে আর একজন মুসলিমকে আমেরিকা নামক জল্লাদের হাতে তুলে দিতেও আমাদের কুণ্ঠা বোধ হয় না। পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্মের মানুষ এটা পেরেছে কিনা আমার জানা নেই। যদি পেরেও থাকে তার পিছনে রয়েছে এমন এক ইতিহাস যা তাদেরকে বাধ্য করেছে। আমাদের ধর্মে কোথাও বলা আছে কিনা জানি না, যে নিজেদের দেশকে বিকিয়ে দাও অন্যের হাতে।

আবিরের চোখের সামনে ভেসে ওঠে তার পড়া আরব্য উপন্যাসে বাগদাদকে। সেই বাগদাদ, যেখানে বসরাই গোলাপ তার ঘ্রাণ বিলিয়ে দিচ্ছে তেল শহরটায়, সেই বাগদাদ, যেখানে সোনায় মোড়া আছে সম্রাটের সিংহাসন। সেই বাগদাদ যেখানের ঘটনা নিয়ে রচিত হয়েছে সহস্র এক আরব্য রজনি। আজ সেখানে তার ধ্বংসাবশেষ কাঁদছে, হাহাকার করে কাঁদছে। সেখানে চলছে একটা ধ্বংসের পর আরও একটা ধ্বংসের খেলা। অথচ হওয়ার কথা ছিল না, আর হবে নাই বা কেন। ইতিহাস তো বলছে সিরাজউদ্দৌলাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য মিরজাফর ব্রতী হয়েছিল। প্রথম জন মুসলিম, দ্বিতীয়জনও মুসলিম।

আবিরের ভাবান্তর লক্ষ করেনি সেলিম—সে বলে চলেছে, এই যে রহমতুল্লা সাহেব। তার উমর তো কম নয়। প্রায় ষাট বছর, হয়তো বেশিও হতে পারে। চতুর্থবার শাদি করল তার হাঁটুর উমরের তুহিনাকে এবং বেশ জাঁকজমক করে, মৌলবির উপস্থিতিতেই। জানিস আবির তৃতীয় বিবি ফরিদা আমার কাছে এসেছিল। ওঃ সে কি কান্না, বার বার বলছিল "সেলিম তোমার চাচাকে বোঝাও, আমরা গরিব, আব্বার বাড়িতে গেলে খাব কি? তার উপর এই ছোটো ছোটো দুটো বাচ্চা"। ভেবেছিলাম প্রতিবাদ করব, করতে পারিনি কারণ সাবিনা ছাড়া কাউকে পাশে পাইনি। তবুও বলেছিলাম চাচাকে—চাচা একটি বার ভেবে দ্যাখো। কথাটা রটে গেল। ইমামসাহেব ডেকে পাঠালেন, বললেন তুমি যা করছ করো, এ ব্যাপারে মাথা না ঘামালেও চলবে।

তুই ভয় পেলি, তাই না সেলিম।

ওভাবে বলছিস কেন? তবে এটা ঠিক এসবের পর্যালোচনা করার সময় এসেছে। তা না হলে এর প্রভাব পড়বে সমাজে। কারণ শিক্ষা। মেনে নেবে না শিক্ষিত, শিক্ষিতারা। দেখা যাবে সংরক্ষণশীলতা এবং এই সব কুপ্রথার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করছে বর্তমান প্রজন্ম।

যেদিন ফলবে সেদিন ফলবে। এ নিয়ে তুই একা মাথা না ঘামালেও চলবে।

জানিস আবির, এই একই কারণে আমাদের সমাজ পছন্দ করে না তসলিমাকে। এখন কোনো কোনো বিদ্বজন, তারা আমাদের সম্প্রদায়েরই, তারাও তসলিমার বিরুদ্ধে মানুষকে প্ররোচিত করছে। কিন্তু আমার মনে হয় তসলিমার লেখার মধ্যে কোনো ভুল নেই।

আবিরের পছন্দ নয় তসলিমাকে। এবং সমর্থনও করে না তাকে। তার ধারণা তসলিমার হয়ে গলা ফাটালে মুসলিম ভোটব্যাংকে চিড় ধরবে। কিন্তু নয়না!

সে বলে আমাদের সমাজে, সে যে ধর্ম, যে সম্প্রদায়ই হোক, হাজার হাজার তসলিমাকে প্রয়োজন। যারা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে ধর্মীয় ভ্রষ্টতায় আচ্ছন্ন সমাজটাকে। প্রমাণ করে দেবে ধর্মের নামে প্রতিটি ধর্ম যা করছে তার সবটা ঠিক নয়।

হয়তো এই মানসিকতা থেকেই নয়নার পছন্দ স্যাটানিক ভার্সেস এবং তার লেখক বলা ভালো গবেষক সলমন রুশদিকে।

আবির মজা করে বলে—যা দেখছি তোমার আর সেলিমের বিয়ে দিলে ভালো হত, তা হলে দুজনে মিলে বিপ্লব করতে।

তা নহলে তোমরা রে রে করে উঠতে না। আবির তুমি মজা করছ করো, একদিন আসবে যেদিন মানুষ বিয়ে করবে মানুষীকে। ধর্মের প্রশ্নে নয়, সম্প্রদায়ের প্রশ্নে নয়, মনের প্রশ্নে। সেদিন হয়তো খুব একটা দূরে নয়, তার আগে অবশ্য অনেক রক্ত ঝরবে, অনেক তাজা প্রাণ যাবে। তবুও ....

একটু দম নেয় নয়না। ভীষণ উত্তেজিত হয়ে গেছে সে। কিন্তু উত্তেজনার ছিটেফোঁটা নেই প্রকৃতিতে। তাই সময় মেনেই নেমেছে সন্ধ্যা। সুন্দর সন্ধ্যা বাতাস বইছে মৃদমন্দ গতি নিয়ে। ঝড় ওঠেনি। ঝিঁঝি পোকাগুলো একটা নির্দিষ্ট লয়ে মেতেছে সুরমূর্ছনায়। একটা সাদা বিড়াল হেলতে দুলতে চলে গেল বাইরের থেকে আবিরের ঘরের পথে। ওটা আবিরদেরই, সারাদিন বাড়িতে কাটায়, বিকেলে বেরিয়ে যায় বৈকালিক ভ্রমণে। হয়তো তার বন্ধুবান্ধবীদের সাথে দেখা করে আসে এই বিকেলেই।

সামনে রাখা জলের বোতল থেকে জল খায় নয়না। মুখটা মুছে নেয় শাড়ির আঁচলে। নয়নার জল খাওয়া দেখে জল খায় সেলিমও।

শুরু করে নয়না—ধর্মীয় মৌলবাদ সমাজটাকে টেনে নিয়ে চলেছে পিছনের দিকে। যারা শুধুমাত্র কয়েকটা ভোটের জন্য মৌলবাদকে তোষণ করে। তাদের সততা নিয়ে একদিন মানুষ প্রশ্ন তুলবে, বিদ্রোহ করবে।

যেন যা বলার বলা হয়ে গেছে অথবা এগুলো বলার দরকার ছিল, বলা হয়ে গেছে। তাই গর্বিতা নয়না থেমে গেল। ভারী হল পরিবেশ।

আসলে মানুষ যখন জাগে, পক্ষেই হোক আর বিপক্ষেই হোক, নড়েচড়ে বসে সমস্ত দেশের নেতৃত্ব। তাদেরকে তখন পর্যালোচনা করতে হয় আগামীর সম্বন্ধে। আবির ভাববে কিনা জানে কেবল আবির, সেলিম কোনো কিছু সংযোজন কি বিয়োজন করবে কিনা সেলিমই জানে।

কিন্তু মানুষ নয়নারা ঝড় তুলে যাবে।

এক সময় চলে গেল সাবিনা সেলিম, কিছুটা ছেড়ে দিয়ে এল আবির।

এমনই হয় প্রত্যেকের ক্ষেত্রে, ব্যাতিক্রম হয়নি কোনোদিন।

ফিরে এসে টিভির সামনে বসল কিছুক্ষণ। না তেমন নতুন খবর কিছু নেই। বোধহয় থাকবে না আগামী এক-দুমাস। টিভির সুইচ বন্ধ করে নয়নাকে ডাক দিল এবার খেয়ে নিলেই তো হয়?

আমিও তো তাই ভাবছি, রাত্রি তো বেশ হল।

খেতে খেতে ফেলে আসা প্রসঙ্গে বলল আবির—নয়না, তুমি হঠাৎ এত উত্তেজিত হয়ে গেলে কেন?

তুমি এতখানি নির্লিপ্ত কেন ছিলে আগে তার উত্তর দাও।

বুঝল আবির, নয়না এখনও উত্তেজনা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। হয়তো তাই খাওয়াদাওয়া সেরে বিছানায় চলে গেল আবির। সব কিছু গুছিয়ে তারপর গেল নয়না।

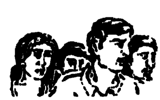
রাত্রিটা ভালো কাটল না কারোরই। কারণ সেই উত্তেজনা, ভয়।, তার মধ্যে আবার এক উটকো ঝামেলা এসে হাজির হল মাঝরাত্রিতে।

দলেরই অত্যুৎসাহী নবীন তৃণমূলের কালীপদকে ভীষণ মারধোর করেছে। ফলে যা হয়, ওদের দলের গাদাগুচ্ছের লোক এসে পালটা মার দিয়েছে নবীনকে। নবীনের বাড়ীর লোক এসে ডাকতে শুরু করল আবিরকে—আবিরদা, তাড়াতাড়ি আসুন, নবীনকে ওরা মেরে ফলল।

দৌড়ে গেল আবির অকুস্থলে, সব সামলাতে সামলাতে রাত্রি ভোর হল, আর নয়নার কাটল উৎকণ্ঠায়।

ফিরে এসে আবির বলে—জানো নয়না, আমি বেশ বুঝতে পারছি, এই অতি উৎসাহই আমাদের সর্বনাশের কারণ হবে।

ঠিকই বলেছ, অবশ্য ওদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। ওদের পেটে আর কতটুকু বিদ্যে আছে।



রবিবার যেন কাটতে চায় না সেলিমের। অথচ একদিন ছিল তখন একটি মুহূর্ত বিশ্রাম নিতে সময় পেত না। তাই নিয়ে সাবিনার মনে জমত হাজার দুঃখ। সে সব অবশ্য শাদির পর থেকে বছর দুইয়ের ঘটনা। তারপর সব সয়ে গেছিল সাবিনার।

তখন সাবিনা বলত—তুমি যদি জানতে সারা দিনরাত্রি দলের জন্য সময় দিতে হবে, তা হলে খামোখা শাদি করলে কেন?

মনে পড়ে গেল সেলিমের পুরোনো সেই কথাগুলি। তাই নিয়ে আজ মজা শুরু করল সাবিনার সাথে।

কি গো, এখন তো অঢেল সময়।

নকল অভিমান ঝরিয়ে সাবিনা বলে—এই বয়সে আর সময় দিয়ে কি হবে।

কী যে বলো! এই তো সেদিন শুকুর চাচা আবার নিকা করল। তার উমর তো আমার থেকে বেশি। শুনছি নাকি শুকুরচাচা তার নতুন বিবিকে নিয়ে দিঘা যাবে।

ঐ সব লোকের কথা ছাড় তো। ওরা কি সমাজকে কিছু দেয়।

তা হলে আমি কিছু দিয়েছি বলো। আর সেই কারণেই তোমাকে সময় দিতে পারিনি। এখন তো মুক্ত, চলো না কোথাও ঘুরে আসি।

সে নসীব কি আল্লা আমাকে দিয়েছেন! এবার অবশ্য আমার ছেলে আমাকে নিয়ে যাবে।

কথার উপর কথা, তার উপর কথা, সাবিনা সেলিমের চলছিল বেশ। হঠাৎ কোথা থেকে দক্ষিণা বাতাসের মতো কোনো এক ফুলের বাগান ভাসিয়ে হালকা পারফিউমের ঘ্রাণ ছড়িয়ে ঘরে ঢুকল নয়না। আসতে আসতেই শুনল, সেলিম সাবিনার ভ্রমণে যাওয়ার কথা।

কী ব্যাপার, তোমার কোথাও বেড়াতে যাবে নাকি? তাহলে আমাকেও নিতে পারো।

যেন লাফিয়ে ওঠে সাবিনা—আরে, এমন অসময়ে!

কোনো অসুবিধা হয়ে গেল নাকি?

কিসের অসুবিধা, যদি হয়েই থাকে তা হলেই বা কি?

কে জানে, কে কিভাবে নেয়।

দুজনকেই দেখে নয়না। তার হয়তো মনে হল কিছু একটা ঘটেছে। তা না হলে এমন থমথমে পরিবেশ কেন! তাই জিজ্ঞাসা করল নয়না—এই সাবিনা, কি ব্যাপার বল তো? কোনো সমস্যা হল কি?

না না, তেমন কিছু নয়। ওকে বলছিলাম শাদির পর থেকে কোথাও তো যাওয়া হয়নি। কোথাও একটু ঘুরে এলে হত।

তা কী বলছে সেলিম?

কী আর বলবে। ওকি আমাকে ভালোবাসে, ভালোবাসে তো ওর দ্বিতীয়পক্ষ দলকে।

হাসে নয়না, যেন বত্রিশটি বেলফুল একসাথে ফুটল বেলগাছে। হাসিটুকু মেখেই নয়না বলে—সত্যি, তোমরা না ...., হ্যাঁগো সেলিম, একবার তো দিঘা চলে যেতে পারো। দ্যাখো না চেষ্টা করে পুরানো দিনগুলোকে ফিরিয়ে আনা যায় কিনা।

নয়নার কথা বলার ঢঙে হেসে ফেলল সাবিনা। মন্তব্য করল সেলিম—দাও ফিরে সে অরণ্য!

অরণ্যকে ফিরিয়ে আনতে দোষ নেই, কিন্তু বন্য হয়ে যেয়ো না যেন, তা হলে আবার.....

মুখে আঁচল চেপে হাসল সাবিনা, তার চোখ সেলিমের চোখে রাখা, মুখে বলে তুমি না .....

বলো বলো থামলে কেন?

দাঁড়াও তোমার কর্তাকে বলব।

বলতে হবে না, যেমন দাদা, তার তেমন ভাই, দুটোই .... তার থেকে চলো আমরা দেখেশুনে দুজনকে ধরে নিয়ে চলে যাই।

রে রে করে ওঠে সেলিম—অমন কাজ করো না নয়না, তা হলে বুড়ো বয়সে না খেয়ে খেয়ে এন্তেকাল হয়ে যাবে।

আরে বাবা, তোমাদের যদি সখ সাধ না থাকে অন্য কারুরই কি থাকবে না? তা ছাড়া তোমাদের সময় আর যোগ্যতা দুটোই তো নেই।

তা বলে ......

ভুলে যাচ্ছ কেন, আমাদের এখনও বাজারে দাম আছে। সে তোমরাও জানো, আমরাও জানি।

জানি তো। তাই তো ভয় হয়, আমরা দু-বুড়োতে যদি পথে বসি।

তা হলে স্বীকার করছ বলো। তবে থাক, তোমাদেরই জয় হোক, কি বলো সাবিনা।

যাক বাবা তালাক খাওয়ার হাত থেকে বাঁচলাম।

সেলিমের কথা শুনে দুজনেই হেসে ওঠে খিলখিল করে। যে হাসি দেখার জন্য যে-কোনো পুরুষ অপেক্ষা করতে রাজি সমস্ত দিন।



সাবিনা তার রান্নাঘরটি সাজিয়েছে বেশ পরিপাটি করে। বেশ বড়ো রান্নাঘরটা। এতদিন এতবার নয়না এসেছে সেলিমের বাড়ি অথচ কোনোবারই রান্নাঘরে ঢোকেনি সে। আজ প্রথম ঢুকল।

সত্যি সাবিনা, সেলিম রান্নাঘরটা করেছে বেশ সুন্দর তার উপর তোমার হাতের ছোঁয়ায় ঘরটা যেন একটা আলাদা মাত্রা পেয়েছে।

তোমাদের ধারেকাছেও এটা নয়।

না গো, একথা বলে লাভ নেই, হাত নাড়লে এদিক ওদিক ঠেকে যায়।

কি যে বলো, নাকি বলতে হয় বলে বলছ?

সাবিনা নয়নার আলোচনায় কখনও উঠে আসে বেডরুম, কখনও বাথরুম, কখনও বৈঠকখানা-কাম বারান্দা, প্রশংসা করে একে অপরের ঘরের।

সেলিম ডাইনিং রুমে বসে শুনছে সবই। ভাবছে এরা একে অপরের কত কাছাকাছি। যেন একমায়ের গর্ভজাত দু বোন। দেখে ভালো লাগছে সেলিমের, হয়তো এসব দেখে তার মজা করতে ইচ্ছেও জাগে। কখনও মনে হয় আবির থাকলে আসরটা বেশ জমাটি হত।

নাই বা থাকল আবির। সেলিমও তো কম যায় না, তাই হয়তো বলে—একটা কাজ করলে হয় না?

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে নয়না—কি কাজ।

ঘর বদল।

তার মানে?

ধরো বছরে ছ'মাস তোমরা এঘরে, আমরা ওঘরে, কিংবা তুমি আমার ঘরে, সাবিনা আবিরের ঘরে।

কি বললে, সাহস তো কম নয়।

আসলে কি জানো এই চর্বিত চর্বন থেকে ওটা একটা মুক্তির উপায়। কি গো সাবিনা, ঠিক বলিনি?

চিৎকার করে নয়না—আমরা কি দুভাইয়ের এক মাপের জামা প্যান্ট নাকি, যে বদলে বদলে পরবে।

আহা ওভাবে বলছ কেন? ক্ষতি তো তেমন নেই। আমরা হলাম গিয়ে তোমাদের ভাষায় হরিহর আত্মা, একে অপরের জন্য, সুখে, দুখেঃ, অভ্যেস বদলে।

চেষ্টা করে দ্যাখোনা, ঠেলাটা বুঝবে।

তোমরা যখন বলো এটা ভালো লাগছে না, ওটা ভালো লাগছেনা, একই খাবার খেতে খেতে জিভে শ্যাওলা পড়ে গেল, তখন তো তোমাদের রুচি বদলাতে আমাদের ছুটতে হয় নিত্য নতুনের খোঁজে।

সেটা তো খাবার, তুমি যা বলছ সে তো অন্য জিনিস্।

এসব পুরানো কথাই নতুন করে চলতে থাকে কখনও সেলিমের সাথে নয়নার, কখনও আবীরের সাথে সাবিনার, কথাগুলো পুরানো, তবুও যেন তৃপ্তি পায় সবাই হালকা রসিকতায়। দূর হয়ে যায় সমাজজীবনের, রাজনৈতিক জীবনের টানা-পোড়েনময় যন্ত্রণা। আসলে এগুলো যেন টনিকের কাজ করে দুর্বল রোগী-রোগিণীর।

সাবিনা, নয়না বেরিয়ে এসেছে রান্নাঘর থেকে। হাতে ধরা নিজের তৈরি করা পাঁপড় ভাজা, এসে দেখে সেলিমের হাতে ধরা কবেকার পুরোনো একটা 'যাতিক' পত্রিকা। যার মলাটে কালো কালো দাগ পড়ে গেছে। পাতাগুলো লালচে হয়ে গেছে।

সেলিম বেশ ক'বছর আগে একবার নন্দকুমার গেছল। যাওয়ার পথে বাস খারাপ হয়ে যাওয়ার জন্য বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল চন্দ্রকোনায়। যেখানে এ.আই.সি.পি. দলীয় কার্যালয়। ওখানে তখন একটা আলোচনা সভা চলছিল। ছায়াঘন স্থান, ওখানেই কিছুক্ষণ আশ্রয় নিতে হয়েছিল বাসযাত্রীদের। সময়টাতো বৈশাখ, গ্রীষ্মের দাবদাহ চলছে তখন। ওখানেই সংগ্রহ করেছিল পত্রিকাটি।

সেলিমের অভ্যেস পুরোনো পত্রিকা পড়া। তুলনা করা তখন, এখনের। হয়তো সেই কারণেই অনেকগুলো পুরোনো পত্রিকা সাজানো তাক থেকে বেছে নিয়েছিল "যাতিক"টাকেই, অন্যমনস্কভাবে একটার পর একটা পাতা উলটে যাচ্ছিল পাঁপড় খেতে খেতে।

লক্ষ করল নয়না—দেখি দেখি, কি পড়ছ?

না না, পড়ছি আর কোথায় ...

পত্রিকাটা হাতে নিয়ে দেখছে নয়না—বড্ড চেনা চেনা নাম। সত্য ঘোষাল, কৃষ্ণপদ কারক।

জিজ্ঞাসা করে সেলিম—এদেরকে চেন?

নামগুলো মনে হচ্ছে শোনা।

কৃষ্ণ কারক, কেষ্ট কারক বলেই সবার কাছে বেশি পরিচিত।

জানো নয়না, ইনি দীর্ঘ প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর পঞ্চায়েত প্রধান হিসেবে কাটিয়েছেন।

গিনেস বুকে নাম উঠে যাবে তো! ভদ্রলোক কোন্ দলের?

বামপন্থীই বলতে পারো তবে মাঝামাঝি অবস্থানের। আর এই ছবিটা দেখছ? ইনি সত্য ঘোষাল, ওখানে সবাই বলে বিদ্যের জাহাজ। কৃষ্ণবাবু আজও বেঁচে আছেন, তবে প্রধান হিসেবে নয়, আর সত্যবাবু মারা গেছেন।

আশ্চর্য ব্যাপার, এই জমানাতেও .....

আশ্চর্য ব্যাপারই বটে। যেখানে সবাই ধরাশায়ী, সেখানে উনি একা কুম্ভ হয়ে রক্ষা করেছেন ওনার গড়কে। সবচেয়ে অবাক ব্যাপারটা শোনো, এক সাংবাদিক ওনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, দীর্ঘ প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর টিঁকে থাকার রসদটা কোথায়?

উনি বলেছিলেন—যথা ধর্ম তথা জয়।

ছবিগুলো দেখছে নয়না। সত্য ঘোষাল, দেবেশ দাস, কৃষ্ণপদ কারক, ... চোখদুটো চকচক করছে নয়নার। কেন? সে কেবল নয়নাই জানে।

এবার উঠতে হবে নয়নাকে। অনেকটা সময় কাটল সেলিমের বাড়িতে। বেশ ভালো লাগছিল নয়নার। চলে এসেছিল নয়না, আজকের মিটিং বাতিল হওয়ার জন্য। তা ছাড়া আবিরও বাড়িতে নেই, কলকাতায় গেছে ছেলের কাছে। ঘরে তালাচাবি।

না গো সেলিম, এবার উঠি।

আর একটু থাকলেই পারতে, একবারে সান্ধ্য খাওয়াটাও এখানে হয়ে যেত।

ও আবার চলে আসবে।

সাবিনা বলে—এভাবে মাঝে মাঝে চলে এলে, ভালো লাগবে।

যেমন সেলিম চলে যায় মাঝে মাঝে?

ও মা তাই, জানি না তো।

তুমিও যেয়ো।

চলে যেতে গিয়েও দাঁড়াল নয়না—সেলিম পত্রিকাটা দেবে?

নিয়ে যাও, তবে ফেরত দিতে হবে কিন্তু।

ভয় নেই, ফেরত দিয়ে যাব।

চলে গেল নয়না। তার হালকা পারফিউমের ঘ্রাণ রয়ে গেছে সেলিমের ঘরে তখনও।

সাবিনা বলে—সত্যি বলছি, আমার ভাবতে অবাক লাগছে আমরা দুটো বিপরীত সম্প্রদায়ের মানুষ কি করে এক জায়গায় চলে এলাম।

এটাই তো আজকের সমাজের দাবি, তাই না সাবিনা?

তাহলে যে তসলিমাকে নিয়ে রাজনীতি করা যাবে না।

হাসে সেলিম। সাবিনার বুদ্ধিদীপ্ত খোঁচা খেয়েও, মনে মনে ভাবে—সাবিনা তুমি যতই নিজেকে সরলতার মোড়কে মুড়ে রাখো, আসলে তুমি ভীষণ বড়ো মাপের রাজনীতিবিদ। কিন্তু তোমাকে কাজে লাগানো গেল না।



"আঁতুড়ে ভূমিষ্ঠ
জরাজীর্ণ বীজ
ওরা হবে না কখনও
নিষ্পাপ সরসিজ"

কবিতাটা এই ভাবেই শুরু করেছিল আবির, একটা দলীয় মিটিং সেরে এসে। সেলিমও ছিল সেই মিটিং-এ। দেখেছিল, হাজার তত্ত্ব কথা শোনার পরেও বিন্দুমাত্র বদলাতে পারেনি নজরুল, বসন্ত, জিৎরা। সেই মিটিং-এ ছিলেন সুবিমল চক্রবর্তী, যিনি রাজনীতি না করে সাহিত্য করলে উঠতে পারতেন অনেক উপরে। সমাজকে দিতে পারতেন অনেক কিছু। কি দরাজ গলা গানের, যখন রবীন্দ্র সংগীত গাইতেন সেলিম, আবির তার সুরের মধ্যে হারিয়ে যেত।

সেলিমের বার বার মনে পড়ে আবিরের কবিতাটা। যখন সে ক্ষমতায়, তখন দলের কোনো কোনো সদস্যের অন্যায় কাজকে সমর্থন না করে প্রথমে তাকে সাবধান করত, তারপরেও কথা না শুনলে তাকে সাসপেন্ড অথবা বহিষ্কারের সুপারিশ করত। অবশ্যই প্রমাণ সাপেক্ষে। সে দেখেছিল কোনো কোনো নেতৃত্ব ট্রেডইউনিয়নের দায়িত্ব নিয়েই শুরু করে দিত কিভাবে ওখান থেকে কামানো যায়। তারা বদলে ফেলেছিল তাদের জীবনশৈলী।

আজ তারা আবার ফিরে এসেছে স্বমহিমায়। ওরা প্রতি পদে পদে ভুল বোঝাচ্ছে বা বিকৃত করে খবর পাঠাচ্ছে ওপরতলায়। তারা বিশ্বাস করছে ওদেরকে, বিশ্বাস করছে, কারণ অটুট আছে ভোট ব্যাংক।

এখনও চেষ্টা করে আবির। পারেনি ওদেরকে প্রতিহত করতে, বরং দিন দিন কোণঠাসা হয়ে যাচ্ছে আবির।

মনে পড়ে সেলিমের সেই দিনগুলোর কথা, যখন সে যেন একাগ্র পূজারি ছিল দল নামক দেবতার পায়ে নিজেকে অঞ্জলি দেওয়ার।

টিভি দেখতে দেখতে বলছিল সেলিম—জানো সাবিনা, কঠোর অনুশীলন, তীব্র জেদ, একাগ্র মনোভাব সমস্ত দলীয় সদস্যের, একটা জয় এনে দিয়েছিল। খেলতে নামলে দু একটা ফাউল তো হয়েই থাকে, এটা খেলারই অঙ্গ। কারণ কেউ চায় না দাঁড়িয়ে থেকে গোলে হজম করতে। কিন্তু যদি কোনো খেলোয়াড় ইচ্ছাকৃত ফাউল করে এবং বার বার, তা হলে তাকে দেখতে হয় প্রথমে হলুদ কার্ড তারপর লাল কার্ড। আবার বিরোধীদের ব্যাপারটা দ্যাখো তারা যেন খেলতে নেমেছে ভাড়া করা খেলোয়াড় নিয়ে।

আচ্ছা সেলিম ওরা আজও কেন দানা বাঁধতে পারল না বল তো?

এই সহজ সত্যটা বুঝতে পারছ না। ওরা খেলতে নামতে হবে বলে নামছে। ওদের মনে জয়লাভের ইচ্ছে আছে কিনা ওরাই জানে না। ওই ইচ্ছেটা হল জনগণ, যেটা জয়লাভের সবচেয়ে বড়ো হাতিয়ার।

সত্যিই ওরা মানুষের পাশে নেই, বিশেষ করে যারা খেটে খাওয়া মানুষ, যারা ভূমিহীন মানুষ, যার শ্রমজীবী মানুষ। বর্গা আন্দোলন তার সাফল্য, ভূমি সংস্কার আন্দোলন তার সাফল্য। গ্রামীন অর্থনৈতিক বিকাশ আন্দোলন তার সাফল্য এগুলো বামপন্থীদের সবচেয়ে বড়ো হাতিয়ার। এর বিরোধিতা বিরোধীদের পায়ের তলার মাটি সরে যাওয়ার সবচেয়ে বড়ো কারণ। হয়তো অনেক ভুল সিদ্ধান্ত নিচ্ছে এই সরকার। ব্যক্তিতান্ত্রিক হয়েছে কিছু কিছু নেতৃত্ব। ওই সব হাতিয়ার সরে যাওয়ার জন্য যা যথেষ্ট কারণ। কিন্তু সরে যায়নি, ওদের ভয়ে যারা আসবে তারা হয়তো পুনরায় মুষিক করে দেবে ওই সব সদ্য আর্থিক দিক থেকে মাথা তুলে দাঁড়ানো মানুষগুলোকে।

অবাক হচ্ছিল সাবিনা যে মানুষটাকে তাড়িয়ে দিল দল, আজও সে ভুলতে পারেনি নীতি এবং তার প্রয়োগের সাফল্যকে। যেন আজও তার দায়বদ্ধতা রয়েছে এই সমাজের প্রতি, যেমন আগে ছিল। ভাবছে সাবিনা—বামপন্থী সরকারের রূপকার আসলে এরাই। যাদের সততা, সাহসিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই। যারা নিজের স্বার্থের কথা ভাবল না কোনোদিন। যারা সবকিছু করেও বর্তমানদের কাছে খতমের তালিকায়।

সেলিম বলে—জানো সাবিনা, সুদর্শন সরখেল, মানে নয়নার বাবা বলতেন কে কী বলছে, কে কী লিখছে সবকিছু দেখা উচিত। তাদের হালহকিকত, তাদের পরিকল্পনা এবং কী ভাবে আটকানো যেতে পারে সে সব ব্যাপারে ওই সব সোর্স থেকেই জানা যায়। অথচ আজ ওই সব তরুণ তুর্কিরা লোক পাঠিয়ে খোঁজ নিচ্ছে কে বা কারা ওই সব বুর্জোয়াদের খবর দেখছে। হায়রে তরুণ তুর্কির দল .....

তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে না গো?

না, তবে ভাবছি অনেক কিছুই। মনে হচ্ছে আমরা বোধহয় হেরে গেলাম।

তুমি তো হারতে জানো না সেলিম।

কে জানে, আচ্ছা সাবিনা, কেন এমন হয় বলো তো, মন দুর্বল হয়ে যায় মাঝে মাঝে?

বয়স বাড়ছে সেলিম, এখন থেকে চেষ্টা কর চাপমুক্ত হতে। তা না হলে যে কোনোদিন বিপদ আসতে পারে। তা ছাড়া তুমি তো জানো তুমি অন্যায়ের স্বপক্ষে দাঁড়াওনি কোনোদিন। এই সান্ত্বনাটা কি যথেষ্ট নয়?

একটা দীর্ঘশ্বাস যেন বুকটাকে দুমড়েমুচড়ে বাইরে এল সেলিমের, শেষ শীতের মতো। হয়তো এবার বসন্ত আসবে নতুন করে। অতীতকে ফেলে রেখে এসে, হয়তো সাবিনাও তাই চায়। চায়, যে পথ চলার আনন্দে সেলিম এতদিন মশগুল ছিল, যে পথ বাঁক নিয়েছে অন্যদিকে, যে পথ ভয়ঙ্কর। সেই পথ এড়িয়ে যেতে।

সাবিনার সান্ত্বনাবাক্যের উত্তরে সেলিম বলে—হুঁ।

তারপর আবিরের লেখা কবিতাটা আর একবার মনে মনে বলল সেলিম। মনে মনে বলল—সব শেষ হয়ে যাবে না তো।



না সরকার গঠনে তেমন চমক নেই। যে যা পদে ছিল দু একজন ছাড়া প্রায় সবাই নিজ নিজ স্থানেই থেকে গেল। সবাই একবাক্যে বলল উন্নততর বামফ্রন্ট। যুক্ত হল শিল্পায়ন! বিদেশিপুঁজি আনার জন্য খুলে দেওয়া হল দ্বার। গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ প্রাধান্য পেল। শিক্ষাকে আরও কর্মমুখী করার শপথ নেওয়া হল, যে ভুল করা হয়েছিল সেই ভুল সংশোধন করে ইংরেজিকে প্রাথমিক স্তর থেকে আবার শুরু করা যায় কিনা, সেই ভাবনার অবকাশ রাখা হল। কর্মসংস্কৃতির উপর জোর দেওয়া হবে এমনই ঘোষণা হল।

বিরোধীরা বসল পরাজয়ের চুলচেরা বিশ্লেষণে।

টিভির পর্দা থেকে চোখ না সরিয়েই আবির বলে—ওরা আর কি বিশ্লেষণ করবে। ওদের আছেটা কি?

সেলিম বলে—অথচ দ্যাখো, ওদের জনসভায় উপচে পড়া ভিড়। কিন্তু সমুদ্রে পৌঁছোনোর আগেই কোথায় হারিয়ে গেল।

তা যা বলেছিস, কিন্তু কেন!

কেন-র উত্তর বোধহয় ওরা বুঝতে পারেনি। নাড়ির টান বুঝিস তো। 'মা' কেমন সে-কথাও তোকে বলতে হবে না নিশ্চয়। গর্ভধারিণী মা বুঝতে পারে ছেলে মেয়ে কি চায়। কি তাদের আবেগ, কোনটা তাদের অপছন্দ। ছেলেমেয়েও যখন বড়ো হয় বোঝে মা তাদের দশমাস দশদিন গর্ভে ধারণ করে যন্ত্রণা ভোগ করেছে। বুকের দুধ দিয়ে বড়ো করেছে। স্বাভাবিক নিয়মেই তাদের বোধ আসে কিভাবে, কতখানি সম্মান মাকে জানাতে হয়। ব্যতিক্রম নেই তা নয়। আবার সব মা-ও তো সমান হয় না, তারও ব্যতিক্রম আছে।

নয়না সেলিমকে তার শেষ সংযোজনটুকু করতে না দিয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়—তা হলে এত লোকসমাগম হয় কেন?

দেখতে, স্রেফ চোখের দেখা দেখতে।

তা বলে এত বাঁধভাঙা লোক? নাকি তলে তলে...

ওদেরকেই জিজ্ঞাসা করো গিয়ে।

হাসে নয়না। ভুবনমনোমোহিনী হাসি। তাকে দেখছে আবির।

আসলে আবিরের এই এক বদরোগ, সে যেন সবকিছুকে সবসময় নতুন করে দেখে।

কথায় বলে কবি সাহিত্যিকরা একটু পাগলাটে হয়। ওরা যেন নতুন সৃষ্টির উন্মাদনায় সবসময় মশগুল। খারাপকে দ্যাখে শিল্পের মহিমায়। আবার ভালোকে দেখে অরুচির মন নিয়ে। আসলে কখন কাকে কি ভাবে দ্যাখে ওরা নিজেরাই জানে না।

আবির নয়নাকে দেখছে এখন। বোধহয় ভাবের উদয় হচ্ছে। নয়নাকে নিয়ে কত আঙ্গিকে কত যে কবিতা লিখেছে আবির তার ঠিক নেই। সাবিনাকে নিয়েও লিখেছে। যদিও বেশির ভাগ কবিতা বা গানে রাজনৈতিক রংটাই বেশি।

হাসছে নয়না—এই সেলিম, দেখ যেভাবে ও দেখছে...

পাগল হয়ে গেছে। আরে এই আবির, কি হলরে, তুই হঠাৎ এমন উদাস হয়ে গেলি কেন?

আবির নয়নার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেই বলে—দাঁড়া দাঁড়া, আসছে।

কে রে?

বলছি।

চিমটি কাটে নয়না সেলিমকে, দুটো ঠোঁটে আঙুল রেখে জানান দেয় চুপ, চুপ।

শুরু করে আবির নয়নার দিকে তাকিয়েই

তুমি হাসলে যখন
আমার বুকের ভিতর
আর একটা বুক আছে
ছোট্ট পাখির মতো,
তার ছটপটে মন
ডানা মেলে
নীল আকাশে
চায় মিশে যেতে
যেখানে ঢের আনন্দ আছে
তুমিও আছ।

প্রথম স্লিপে ক্যাচ নেওয়ার মতো যেন ক্ষিপ্রগতির ক্যাচটা লুফে নিল সেলিম। তারপর যখন বলটা ছুঁড়ে দেয় উপর দিকে, লাফায় চিৎকার করতে করতে তেমনি চিৎকার করল সেলিম—এই নয়না ওকে ধরো ধরো, উড়ে চলে যাবে যে!

আমি কেন, তুমিই ধরো, ক্যাচটা তো তোমার দিকেই গেছে।

যা, তা আবার হয় নাকি। বোলার তো তুমিই। তোমার বলের জাদু আছে বলেই না ওর ক্যাচ উঠল।

ও ওই রকম অনেক কবিতা আওড়ায়, তারপর ফিরে যায় নিজের সেকেলে বৃত্তে।

সেলিম জানে আবির ভালো কবিতা লেখে, গণসংগীত লেখে। ওর প্রতিটি কবিতা, প্রতিটি গান সেলিমের হৃদয় ভীষণভাবে ছুঁয়ে যায়, আপ্লুত হয়ে যায় সেলিম। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও লিখতে পারেনি সেলিম, হয়তো তার জন্য দুঃখবোধ তেমন নেই কিন্তু আপশোশ একটা রয়েই গেছে। হয়তো সেই আপশোশ বোধ থেকেই সেলিম বলে আমি যে কেন পারি না।

তুমি পারবে কি করে, ওর মতো তো তুমি পাগল নয়। ওর মতো সবকিছুতে

নির্লিপ্তও নয়। কি জানো সেলিম কবিতা-টবিতা লিখতে হলে আমার মতো বউ চাই, যে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সব করতে পারবে।

এই তো সেদিন। আমরা বসেছিলাম কৃষ্ণচূড়া গাছটার ছায়ায়। লোডশেডিং তায় আবার ভ্যাপসা গরম। আকাশেও জমছিল মেঘ। বাতাস বলতে প্রায় ছিলই না। হঠাৎ ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি নামল। তারপর মুষলধারায়। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো যেন শরীরে বিঁধে যাচ্ছিল।

বললাম—এই চলো, বৃষ্টিটা সহ্য হচ্ছে না। তা ছাড়া এই বৃষ্টিতে ভিজলে ঠান্ডা লাগবে।

ও বলে কিনা—একটু বোসো না।

তারপর কৃষ্ণচূড়ার গাছটার দিকে আমাকে তাকাতে বলল।

দ্যাখো দ্যাখো, দুজোড়া শালিককে। কেমন সুন্দর ভিজছে।

সে তো প্রতিদিনই দেখি। ওরা এই গাছটায় বসে থাকে.

আজ যেন অন্যরকম। ডানা মেলে কেমন বৃষ্টি মাখছে ওরা।

চলো তো, আমার শীত করছে।

প্লিজ যেয়ো না। আর একটু বোসো। দ্যাখো দ্যাখো দুজোড়া পাখি কেমন কাছাকাছি আসল। ওরা ঠোঁটে ঠোঁট মেলাচ্ছে এই বৃষ্টির ওস নিতে নিতে।

যত সব পাগলামি, চল তো।

তুমি বিশ্বাস করো সেলিম, ও আমাকে অবাক করে দিয়ে বুকে টেনে নিল। ওই কৃষ্ণচূড়ার তলায়। সদ্য বিকেলেই। ভাগ্যিস বৃষ্টি হচ্ছিল। কেউ ছিল না বা কেউ যায়নি ওই পথ ধরে। কি বিপদ হত বলো তো।

কিরে আবির এসব কি শুনছি।

দাঁড়াও আরও আছে, ও কি করল জানো!

আরও কিছু! ওই বিকেলেই?

ধ্যাৎ, তোমরা না ....

তুমিই তো বললে।

সে কথা নয়।

তা হলে?

ও হঠাৎ করে প্রথমে সুর ভাঁজল, তারপর গান ধরল একটা। ওই বাথরুম সং-এর মতো গলায় আর কী।

কী গান গো?

তাকাল নয়না আবিরের দিকে, আবির হাসছে। তার চোখে যেন হাজার হাজার দুষ্টুমি খেলা করছে।

জিজ্ঞাসা করল নয়না—বলব?

সবই তো বললে। যা দেখছি এবার বোধহয় সেলিমকে রাত্রের ব্যাপারও বলবে।

তুমি না বললে বলব না।

সেলিম বলে—আরে বাবা, এই পাগলাটার কাছে আবার অনুমতি নিতে হবে নাকি, বলো তো আমার আর ত্বর সইছে না।

নয়না আবার তাকায় আবিরের দিকে, উদ্দেশ্য আবির অন্তত একবার হ্যাঁ বলুক।

অবশেষে আবির বলল—বলে ফ্যালো আর কী।

তা হলে বলি

শুরু করল নয়না

ও বৃষ্টি
তুমি এলেই যখন অসময়ে
আর একটু থেকো,
ভিজিয়ে দাও মনটা আমার
যেমন করে
ভিজছে ওরা গাছের ডালে।
ও যে চায়
এড়িয়ে যেতে
আমায় ছেড়ে
ওকেও ভেজাও
ছেড়ো না যেন ....

সেলিম বলে ওঠে—তোবা তোবা! ওহে আবির, এবার দেখছি তোর পায়ের রেণু আমার মাথায় নিতে হবে।

উদাস আবির এবার ফিরে এল নিজের মধ্যে, হাসতে হাসতে বাড়িয়ে দিল দুটো পা—এই নে তাহলে।

সত্যিই পায়ের ধুলো নিল সেলিম। এই বিকেলে সূর্যটা যখন তার শরীরের সব লাল রং ঢেলে দিয়েছে কৃষ্ণচূড়া গাছটায়। আকাশও মেখেছে সেই লাল রং। সে যেন লজ্জাবতী নববধূ। তার পশ্চিম দিগন্ত নববধূর ঘোমটার আড়ালে মুখ ঢেকে রাখার মতো ঢেকে রেখেছে পৃথিবীর আঁচলে।

রে রে করে উঠল নয়না—আরে এই সেলিম তুমিও পাগল হয়ে গেলে নাকি?

সেলিম আবির দুজনেই গেয়ে ওঠে—

যখন কেউ আমাকে পাগল বলে
তার প্রতিবাদ করি আমি
তুমি যখন পাগল বলো
ধন্য যে হয় এ পাগলামি
ধন্য আমি ধন্য হে
পাগল তোমার জন্য হে ....

আবিষ্ট নয়নার চোখ যেন কথা বলে—এর পরেও কেন সাম্প্রদায়িকতার কালো কালো রং পৃথিবী মাখে। কেন রক্তাক্ত হয় চেতনা।

সেলিম দেখছে, নয়নাকে। স্বাতী, অরুন্ধতীর মতো পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছে, তার উদাস দৃষ্টি, হয়তো মনও উদাস।

জিজ্ঞাসা করে—কি হল নয়না, তুমি যে দেখছি ....

ভাবছি, তোমরা কোন্ ধরনের পাগল।

বুঝলাম না।

বুঝলে না? তোমরা হলে ....

আবির তার দুটো হাত জোড় করে বলে—হেঁয়ালি কেন দেবী, সোজা সাপটা বলো, অধমরা নিশ্চিন্ত হবে।

যত সব ন্যাকামি, বলি দুজনেই তো বুড়ো হয়েছ। এখনও চুড়োসঙ গেল না।

সে কিগো, এত তাড়াতাড়ি হাঁড়ি তুলে দিলে। নাকি এ বুড়োকে আর মনে ধরছে না?

দেখলে সেলিম। কেমন চিমটি কাটছে। সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়।

সে তো আমরও জ্বলে যায় দেবী। তুমি যখন ..... বলব সেলিমকে?

এই ভালো হবে না বলে দিলাম। বেশ আমি আর কিছু বলব না।

কিন্তু সে আবির। যার মুখ একবার খুলে গেলে বন্ধ হতে চায় না, তার উপর গোদের উপর বিষফোটকের মতো সাথি সেলিম। তাই দ্রুত প্রসঙ্গ বদলাতে মরিয়া নয়না। একবারে একশো আশি ডিগ্রি বদলে ফেলে নিজেকে।

দেখেছ সেলিম, ভদ্রমহিলা কেমন ঢোঁক গিলছে?

নয়নার কথা শুনে বদলে যায় সেলিমও যেন দ্রুত লয়ে আটমাত্রায় কাহারবা বাজতে বাজতে ফিরে এসেছে বত্রিশ মাত্রায়।

বেশ গম্ভীর গলায় বলে—এটা নিয়ে এত আনন্দিত হওয়ার কি আছে। নিজেদের আগে আয়নার সামনে দাঁড় করাও। দ্যাখো, তোমরাও নিশ্চিন্ত ছিলে কিনা?

একথা কেন বললে?

আবিরকে জিজ্ঞাসা করে দ্যাখো। ও হয়তো সঠিক উত্তরটাই দেবে।

আবিরের দিকে তাকায় নয়না, এখন নয়না যেন ওগো বধু সুন্দরী নয়। নয়না যেন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অন্য এক সংগ্রামে লিপ্ত আপসহীনা নারী।

জিজ্ঞাসা করে আবিরকে—কি গো, সেলিম যা বলছে। তার সাথে তুমি কি .....

হ্যাঁ নয়না, ওর কথার মধ্যে খুব একটা ভুল নেই।

তুমি একথা বলছ!

কেন খামোখা এসব নিয়ে এত সুন্দর আবওহায়াটাকে গুমোট করতে চাইছ নয়না। তুমিও জানো, আমিও জানি, আমরাও জানি কোথায় কি হয়, কেন হয়। কিভাবে হয় জেনেও অনেক সময় না জানার ভান করে থাকতে হয়। এই যে রাষ্ট্রসংঘ, সে কী জানত না আমেরিকা যেনতেনপ্রকারেণ ইরাকে দখলদারি চালাবে। দখল করবে ইরাক। সারা পৃথিবী জানত, জানে। অথচ সবাই চুপচাপ থাকে, থেকেছিল। সবাই যেমন সেলিম নয়, সবাই তেমন সাভেজ নয়।

মাঝে মাঝে সেলিম নানান প্রশ্নে বিব্রত করত উচু মানুষদের। বিব্রত করত আবিরও। তবু ওরা নিরুপদ্র ছিল কারণ জনসমর্থন ছিল ওদের পাশে। অবশ্য আরও একটা কারণ তখন অন্তর্দলীয় কোন্দল এতখানি ছিল না। আলোচনার মাধ্যমে সবকিছু মিটমাট হয়ে যেত।

সুদর্শন সরখেলকেও একবার ওই স্পষ্টবাদিতার জন্য সাবধান বাণী শুনতে হয়েছিল জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর কোনো কোনো দাপুটে নেতৃত্বের কাছে—আপনি দলের উর্ধ্বে নয়, এটুকু মনে রাখলে আমরা নিশ্চিন্ত হব, আপনিও নিশ্চিন্ত থাকতে পারবেন।

ঢেঁকির ধর্ম ধানকোটা। স্বর্গমর্ত্য সর্বত্র। তাই বন্ধ হয়নি সুদর্শনবাবুর মাঝে মধ্যে ওই সব অস্বস্তিকর মন্তব্য। বন্ধ হয়নি আবিরের। সেলিম বহিষ্কৃত হলেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি নিজেকে।



আমেরিকা বলছে—এবার পৃথিবীতে শান্তি আসবে, নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারবে মানুষ। না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আর বদহজম রোগে ভুগতে হবে না।

পাকিস্তান বলছে—আমরা আর বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীকে যা ইচ্ছে তাই করতে দেব না। ঢের হয়েছে এবার একটা সন্ত্রাসমুক্ত পাকিস্তান উপহার দেব পৃথিবীকে।

ভারতবর্ষ বলছে—এবার কড়া হাতে দমন করা হবে ওই সব সংগঠন বা দলকে যারা সন্ত্রাসকে মদত দিচ্ছে বা নিজেরা সন্ত্রাস কায়েম করছে।

সবাই বলছে এবার শান্তি আসবে। কেমন যেন বেমানান লাগছে কথাটা। তা হলে এতদিন কি সবাই ঘুমিয়েছিল। নাকি অশান্তিতে দিনাতিপাত করছিল সব মানুষ। যদি তাই করে, সে ব্যর্থতা কার?

'শান্তি' শব্দটা ঠিক ললিপপের মতো। ছেলে বদমাইশি করছে, ছেলে কাঁদছে, ছেলে বাগ মানছে না। দিয়ে দাও ললিপপ, সব চুপ। শান্তিতে কাজ করো, ঘুমোও, কামাও, দ্বিচারিতা করো, দ্বিচারীণি হও, যা খুশি, যাতে সুখী।

সেদিন সকালে মদনের চায়ের দোকানে জুটেছিল সবাই। যেমন অন্যান্য দিন জোটে, রবি, সোম, মঙ্গল বলে স্পেশাল কিছু নেই। চায়ের দোকান আসলে এমন একটা জায়গা যেখানে বাছবিচার নেই দলের, জাতের, সম্প্রদায়ের।

আলোচনা চলছিল বিশ্ব তথা রাষ্ট্র, রাজ্যের শান্তি নিয়ে।

মদনের যেমন অভ্যেস, সেই অভ্যেস থেকেই বলে—এসব কেন হয় বলুন তো?

সবাই তাকায় সবার দিকে। মদনের উত্তর দেবে এমন সাহস দেখাতে কেউ পারছে না। পাছে কেউ কারও কাছে খারাপ হয়ে যায়।

একটা ছেলে, কত আর বয়স হবে, বড়োজোর কুড়ি কি একুশ। আজই নতুন দেখা গেল তাকে। হতে পারে জনার্দনপুরে কারও আত্মীয়। কিন্তু এই প্রথম, তারপরে অবশ্য তাকে কেউ দেখেনি। তা ছাড়া দরকারই বা কী।

হঠাৎ বলে বসল—আসলে এই 'শব্দটা' রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাববশত একটা প্রলেপ এবং রাজনৈতিক দেউলিয়াপনা থেকে মানুষের চোখকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেবার একটা টোটকা বিশেষ।

আবির তার দিকে তাকাল অবাক হয়ে, অবাক হয়ে তাকাল সেলিম। মদনের তো তার কথা শুনে মনেই ছিল না চা বসানো আছে, টগবগ করে ফুটছিল চা। ফুটতে ফুটতে পড়ে গেল অনেকখানি। ভাগ্যিস রামবাবু মনে করিয়ে দিলেন। না হলে সবটুকুই পড়ে যেত।

রামবাবু, রামরঞ্জন মান্না, অবসর প্রাপ্ত পুলিশ অফিসার, বিজেপি ঘেঁষা। এখন সময় কাটে কিছু টিউশন আর বাগানে হরেকরকম ফুল-ফলের গাছের পিছনে লেগে থেকে।

ছেলেটি কথাগুলো বলে দোকানের নিস্তব্ধতা দেখে বোধহয় ভয় পেয়ে গেল। টুক করে কেটে পড়ল দোকান থেকে।

তার চলে যাওয়া এবং তার বলা কথা শুনে রামবাবু বেশ একটু অবাক হলেন। অবশ্য অবাক হল সবাই।

আবির বলে—ছেলেটি বেশ বলল তো!

খুব একটা খারাপ বলেনি ছেলেটি। সমগ্র বিশ্ব, সমস্ত রাষ্ট্র, সমস্ত রাজ্য ওই একটা কথাতেই মানুষগুলোর মনকে গুলিয়ে দিচ্ছে। মানুষ ভাবছে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার শান্তি। সামাজিক অবস্থানে শান্তি। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বন্ধের আশ্বাসে শান্তি। রাজনৈতিক অস্থিরতাজনিত জমিদখলের লড়াই এবং তার থেকে সৃষ্ট সব হারানোর দুশ্চিন্তা থেকে শান্তি, বেকারত্ব নামক অভিশাপ এবং হীনম্মন্যতায় ভুগতে ভুগতে মানসিক পঙ্গুত্বের হাত থেকে শান্তি। মিথ্যাচারময় রাজনীতির বুলি সর্বস্বতার থেকে শান্তি।

আসলে কি জানো আবির, ওই কথাটা প্রচার করে ফল্গুধারার মতো অশান্তিকে প্রবাহিত করে দিচ্ছে সমাজ নামক নদীতে। বাইরে থেকে মনে হচ্ছে শুখা নদী। মানে অপার শান্তি। নামলেই টেনে নিয়ে যাচ্ছে চোরা স্রোত, অথচ নামতে সবাইকে হবেই।

বেচু গায়েন গভীর জলের মাছ। তিনি সাপ ব্যাং দুজনের মুখেই চুমু খান তার প্রয়োজনে। অথচ তাবড় তাবড় বোদ্ধারা বুঝতেই পারেন না।

তিনি বলেন—ভাগ্যিস ওরা জিতে যায়নি। তা হলে বাংলায় একটা রেনেসাঁস

হয়ে যেত। তবে যাই বলো, ওদের জেতার মতো অবস্থা যথেষ্ট ছিল। জিতলে হয়তো প্রথম ক'বছর কিছু কাজও হত।

রামবাবু বলেন—তা ভাই বেচু তুমি কি নরকধামের নারদ নাকি হে?

তা যা বলবেন দাদা নারদও বলতে পারেন আবার ঢেঁকিও বলতে পারেন। এ যুগে "সারা অঙ্গে এত রূপ" নিয়েই তো বেঁচে থাকতে হবে। কি বলো আবির ভাইপো। তবে হ্যাঁ এর একটা খারাপ দিকও আছে। দুজনকে সমান ভাগে ভাগ দিতে হয়, এই আর কী।

হো হো করে হেসে ওঠে সবাই। বেচুবাবুর মুখে হাসি নেই।

একসময় হাসি থেমে গেছে সবার। বেচুবাবু বলেন—মদনরে, কত হল বলো না বাপ, আমাকে আবার বিদায় নিতে হবে তো।

তিনটাকা খুড়ো।

চলে গেলেন বেচুবাব। অনেক প্রশ্ন রেখে গেলেন রসিকতার মধ্য দিয়ে। যার উত্তর খোঁজা সত্যিই কঠিন। যার উত্তরগুলো পরস্পর দ্বন্দ্বমূলক।

বেচু গায়েন এমনই। হালকা কথা বলা তার অভ্যেস। যখনই বুঝতে পারেন কোনো বিতর্ক দানা বাঁধতে পারে, সরে পড়েন সেখান থেকে।

ফিরে এসেছেন রামবাবু তার আলোচনায়।

যাই বলো আবির, তোমরা একটা ঝড়ের মেঘ দেখেছিলে, পশ্চিমি ঝড়। যদিও সে ঝড় দানা বাঁধতে পারেনি। প্রায় শেষ হয়ে গেছে উৎপত্তিস্থলেই।

এ ধরনের কথা বলছেন কেন? আমরা কি কিছুই করিনি?

শেষ চা-টুকু গলায় ঢেলে নিয়ে রামবাবু বলেন—মদন কি চা খাওয়ালে। আর একটু করো তো দেখি। কড়া করে করবে।

আবিরের দিকে তাকিয়ে রামবাবু বলেন—কি ভাইপো, হবে না কি আর এক কাপ?

চা করছে মদন। চা হলে ধরিয়ে দিল রামবাবু, আবিরের হাতে। চা-তে চুমুক দিয়ে রামবাবু তারিফ করলেন—হ্যাঁ, এই না হলে চা।

একরাশ বিনয় দেখিয়ে মদন বলে—একটু সময় দিলে আর মিষ্টি একটু কম দিলে চায়ের আসল ফ্লেভারটা বেরিয়ে আসে।

তা ঠিক, অবশ্য এত সময় দেবে কে, আমাদের মতো অকাজের মানুষ ছাড়া। তা ছাড়া এত তেল যে পোড়াবে কেউ সে ভাবে পয়সা দেবে?

তা যা বলেছেন।

চা-এর সসপ্যানের শেষ চা-টুকু একটা গ্লাসে ছেঁকে নিয়ে বসে পড়ল মদন। এমনই করে সে খদ্দের শেষ হলে, যে-টুকু রয়ে যায় নিজেই খেয়ে নেয়। এই ভাবে সারাদিনে কতবার যে কতকাপ চা সে খায় সেই জানে।

চা খেতে খেতে রামবাবু তাকাল আবিরের দিকে। বেলা বাড়ছে, প্রায় বারোটা বাজছে মদনের দেওয়ালে টাঙানো অজন্তা ঘড়িটায়। ভাগ্যিস আজ রবিবার, তা না-হলে কবেই চলে যেত আবির। আজ যেন তার তাড়া নেই। সে যেন চায় না সময়টা চলে যাক তাড়াতাড়ি। অথচ সময় চলে যাচ্ছে। সময় থেমে থাকে না প্রবাহমান সময়। পথ চলাতেই তার আনন্দ।

রামবাবু কয়েক চুমুক চা খাওয়ার পর গরম গ্লাসটা নিজের গলার পিছনের দিকে চেপে বসিয়ে উত্তাপ নিতে নিতে বলেন—কি যেন বলছিলে ভাইপো?

ভুলে গেছে আবির, কি বলেছিল। তাই আমতা-আমতা করে তাকায় মদনের দিকে।

মদন বুঝতে পেরেছে আবিরদা কি বলেছিল আর মনে নেই। কিন্তু মদন মনে রেখেছে। তার মনে থাকে সব কথাই, সে মনে করিয়ে দেয়—আবিরদা, তুমি বোধহয় জিজ্ঞাসা করছিলে আমরা কি কিছুই করিনি?

একটু ভেবে নেন রামবাবু। এদিকে ঘড়ির কাঁটা সাড়ে-বারোটা ছুঁইছুঁই। এবার দোকান বন্ধ করতে হবে মদনকে। বাড়ি গিয়ে দুটো দুধেল গাই আছে, তাদের স্নান করাতে হবে, খাওয়াতে হবে।

মদনকে গোছাতে দেখে রামবাবু বলেন—বিকেলে আসছ তো ভাইপো?

রবিবারের বাজার, তা ছাড়া আজ কোনো মিটিংও নেই, চলে এলেই হয়।

ও ভালো কথা। বেচুটাকে ডেকে নিয়ে এসো, আজ একটু তাসের আসর বসাব। অনেকদিন তাস খেলা হয়নি।

হবে কী করে, ভোট ভোট করেই যদি সময় চলে গেল।

তা হলে ওই কথাই রইল। এখন আসি।

আমাকেও চলে যেতে হবে।

মদনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন রামবাবু—মদন, কত হলোরে?

ওই এগারো টাকা খুড়ো।

এই নে, পকেট থেকে টাকা বের করে মদনের হাতে দিলেন রামবাবু। তারপর বললেন—এ বেলা আসিরে, বেঁচে থাকি তো বিকেলে দেখা হবে।

জিব বের করে মদন বলে—বালাই ষাট, এমন কথা আবার কেউ বলে। আপনারা চলে গেলে যে গগন আঁধার হয়ে যাবে খুড়ো।

না রে না, কেউ গেলে কিচ্ছু হয় না। সব শূন্যস্থান পূরণ হয়ে যাবে।



নয়নার মেজাজ ভালো নেই, জয়লাভের পর প্রথম বৈঠকে কিছু অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা হওয়ার জন্য। আলোচনাটা অবশ্যই আবিরকে নিয়ে। নজরুল, বসন্ত, জিৎরা তুলেছিল আবির প্রসঙ্গ।

জিৎ-এর বক্তব্য—আবিরদা আজকাল এখানে সময় না দিয়ে চা দোকানে আমাদের ঘোর বিরোধীদের সাথে মেলামেশা করছে।

নজরুল বলে—ওরা নাকি বলে, ওদের জন্যই দীর্ঘদিন আমরা আছি। মুখেই বলে, কাজে কি করে সে দেখেই আন্দাজ করা যাচ্ছে।

বসন্ত বলে—কিছু মনে করবেন না বউদি। যা শুনছি, দাদারও সেলিমের দশা না হলে বাঁচি।

সকালেই মেজাজটা বিগড়ে গেছে নয়নার, আবিরের সম্বন্ধে ওই সব বক্তব্য শুনে। সে তো জানে আবিরকে, তার সাথে ঘর করছে প্রায় চব্বিশ বছর। যে চিরকাল কেবল দামই দিয়ে এসেছে দলের জন্য, নেয়নি কিছুই। যার সততা নিয়ে প্রশ্ন ওঠার কোনো অবকাশ সে দেয়নি, যাকে দলমত নির্বিশেষে আপামর জনগণ ভালোবাসে। তার সাথে ওঠাবসা করে, তার সম্বন্ধে কি মন্তব্য করছে ওরা। তবে কি ....

ভাবতে পারছে না নয়না। ইচ্ছে করছে ছুটে চলে যেতে বাবার কাছে, তাকে বলতে, কেন এসব হচ্ছে।

বাড়ি ফিরে এসে নয়না দেখে তখনও ফেরেনি আবির। যদিও সে জানে ইদানীং প্রায় প্রতি রবিবার আড্ডা মেরে কাটায় আবির, গুরুত্বপূর্ণ মিটিং ছাড়া তার যেতে ইচ্ছে করে না দলীয় কার্যালয়ে। কারণ, কারণে অকারণে তাকে এমন কিছু অপ্রাসঙ্গিক কথা শুনতে হয়, যা তার মনে আগুন ধরিয়ে দেয়।

আজ রান্না করতেও ইচ্ছে করছে না নয়নার। কখন সকালে বাজার থেকে মাংস এনে ফ্রিজে রেখে গেছে আবির। কথা ছিল, হয়তো সেলিম আসতে পারে। অথচ প্রায় একটা বাজতে চলেছে কারুরই পাত্তা নেই।

একটা দশ নাগাদ বাড়ি ফিরল আবির একা। সেলিম আসেনি। এসেই হাসতে হাসতে বলে—জানো নয়না, আজ চা-দোকানে বেচুবাবুকে নিয়ে বেশ মজা হল। এমন সব কথা বলছিল হেসে হেসে পেটে খিল ধরার জোগাড়। জানো ও আবার বিকেলে চা দোকানে যাবে বলেছে। মদন বলেছে ওকে আজ উলঙ্গ করে ছাড়বে।

কোনো প্রতিক্রিয়া নেই নয়নার। সে যেন বসন্তের নদীতে হঠাৎ ভারী বরষায় বন্যার মতো ফুঁসছে। সুযোগ পেলে ভাসিয়ে দেবে মাঠ, ভাসিয়ে নিয়ে যাবে ঘরবাড়ি সবকিছু।

এই অবস্থা কোনোদিন দেখেনি আবির। একদিন অবশ্য দেখেছিল। যেদিন বহিষ্কৃত হল সেলিম, সমস্ত দিন ছট্‌ফট্ করছে। খেতে বসে খেতে পারেনি। কয়েকটা রাত্রি তো যাকে বলে বিনিদ্র রাত কাটিয়েছে।

সেই সময় অবশ্য দুটো শব্দ বলেছিল নয়না—"এটা অন্যায়" জানি না আজ সেলিমকে যা করল, কাল তোমাকে তাই করবে কিনা। তুমি দেখে নিয়ো একদিন আসবে, সেদিন ওই সেলিমরাই আবার বুক চিতিয়ে দাঁড়াবে সবার আগে। ওরা তখন ওদের আখের গুছিয়ে সবকিছু শেষ করে চলে গেছে অন্য জলাশয়ে।

তারপর সব ঠিক ছিল। কি এমন হল আজ আবার।

জিজ্ঞাসা করল আবির—কি হয়েছে তোমার, এত গম্ভীর কেন? কোনো প্রবলেম?

উত্তর দিতে পারেনি নয়না। উত্তর দেবার মতো অবস্থায় সে আজকে অন্তত নেই।

আবীরও তো নয়নাকে ঘরে এনেছে প্রায় চব্বিশ বছর। তার সমস্ত কিছু তার নখদর্পণে। আবির জানে নয়নার মনের খবর। কখন কোন্ অবস্থায় থাকলে কি করতে হয়। তাই আর কোনো প্রশ্ন না করে ফ্রিজ থেকে মাংস বের করে শুরু করে কাটাকুটি করতে। আবির জানে, এইটে করলেই নয়না ফিরে আসবে আগের নয়নায়। ছাড়িয়ে নেবে হাত থেকে। তারপর বলবে—ঢং দ্যাখো না, যে কাজে যোগ্যতা নেই, বউ খুশি করার জন্য তাই করছে। তারপর হাত কাটলে আমাকে বিরক্ত করে মারবে।

বাধ্য বালকের মতো সব ছেড়ে-ছুঁড়ে দিয়ে বসে পড়ত আবির, কারণ নয়না ধমক দিয়ে বলত—একবারে চুপটি করে বসে থাকো।

মজা করত আবির—নড়াচড়াও করব না, বাথরুম পেলেও যাব না!

না।

যদি এখানে হয়ে যায়।

অ্যায়সা চিমটি কাটত নয়না তার জ্বালা সামলাতে সামলাতে কাজ সারা হয়ে যেত নয়নার।

অথচ আজ কিছু বলল না। অগত্যা, মাংস কুটে, আলু কুটতে শুরু করল আবির। আনকোরা হাত, যেমন তেমন করে কুটে গ্যাস জ্বালাল।

জিজ্ঞেস করল আবির, মাংসটা আমিই রান্না করব?

এতক্ষণে খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এল নয়না—সূর্য কোন্‌দিকে উঠেছে বলো তো?

কেন?

অকাজের বৌড়ী, লাউ কুটোর দৌড়োদৌড়ি। এখানে এসো, বোসো চুপটি করে।

না না, তুমি যেভাবে বসেছিলে, আমি ভাবলাম শরীর খারাপ করেছে হয়তো! তাই ....

তাই, লেগে পড়েছ। করেছিলে কোনোদিন? শুধু তো আড্ডা দিয়ে দিয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিলে। তাও চা দোকানে সব আজে বাজে লোকের সাথে।

অবাক আবির! কি বলছে নয়না, এভাবে তো কোনোদিন বলেনি! কেন বলছে? কোন্ আজেবাজে লোকের কথা বলছে! অথচ এক্ষুনি জিজ্ঞাসা করার সাহসও কুলোচ্ছে না আবিরের। যে চড়া পর্দায় উঠে আছে।

অথচ না জানলেই নয়, কিন্তু কখন?

নীরবতাই এখন একমাত্র সম্বল করে নয়নার কথা মতো চুপটি করে বসে রইল আবির। বসে থাকবারই কি উপায় আছে।

খেঁকিয়ে উঠল নয়না—সেলিম আসবে বলেছিল, এল না কেন? নাকি ভোট নিয়ে ঘোঁট পাকিয়ে রাজত্ব জয় করে তুমিও ভুলেছ, সেও ভুলে গেছে এখানে আসার কথা। এবার বুঝতে পারছি কেন, সেলিমকে দল ছেঁটে ফেলে দিয়েছে।

আবিরের ঠোঁটে উত্তর জমছে আস্তে আস্তে। কারণ সে বুঝতে পারছে মিটিংয়ে এমন কিছু হয়েছে যার জন্য নয়নার এত তিরিক্ষি মেজাজ। কিন্তু বলতে পারল না আবির। সে তো জানে তর্কে তর্ক বাড়ে।

শুধুমাত্র বলল আবির—সেলিম আজ আড্ডায় আসেনি, তার পাড়ায় কার যেন শরীর খারাপ, তাকে নিয়ে হাসপাতালে গেছে।

হঠাৎ বদলে গেল নয়না—কার কি হল? কই শুনিনি তো?

সব কিছু শোনার জন্য অন্য কান দরকার নয়না। তা হলে আরও শোনো, যাকে নিয়ে গেছে তার রক্ত দরকার ছিল। সেলিম রক্তও দিয়েছে।

তোমাকে কে বলল?

অবনী। ও সাথে গেছল। ওরা নাকি কিছু টাকাও দিয়েছে ওষুধ কেনার জন্য। যদিও রোগীটা বাঁচবে কিনা কেউ জানে না।

তুমি গেলে না কেন?

নয়না যেন মিলিয়ে নিতে চাইছে বসন্ত, নজরুল, জিৎ-এর কথার সাথে আবির, সেলিমের বাস্তবকে। ভাবছে নয়না ওরা কেন এমন হয়। কেন প্ররোচিত করে একের বিরুদ্ধে অন্যকে। ওরা কি বুঝতে পারেনা একদিন সত্যিটা স্পষ্ট আলোর মতো ধরা পড়বে সবার চোখে। তখন তো অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি হবে, ঘৃণা করবে সবাই।

ছি ছি, এতক্ষণ কি ভাবছিলাম, কত কি বললাম তোমাকে। কই তুমি তো কিছু বললে না?

বলতে হয় না নয়না, সব বোঝা যায়, কখনও খুব তাড়াতাড়ি কখনও একটু দেরি করে।

এবার খেতে হবে তো, স্নানটা সেরে নাও।

আর চুপ করে বসে থাকব না?

না, দয়া করে এবার উঠে পড়ো।

হুঁ আগে বাথরুমে যাই।

কেন?

সে তুমি বুঝবে না, প্রায় দেড়ঘণ্টা বসে আছি, বুঝতেই তো পারছ।

আবার ইয়ার্কি মারছ?

আজ বিকেলে কোনো প্রোগ্রাম নেই নয়নার। ইচ্ছে করছিল সেলিমের সাথে একটি বার দেখা করে আসবে। একজনকে সুস্থ করতে গিয়ে যে মানুষটা রক্ত দিল, তাকেই তো আগে দেখতে হয়। মনের কথাটা বলেও ফেলল আবিরকে।

বলল আবির—সে তো হাসপাতালেই আছে, পাবে কোথায়? ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যাবে।

ওঃ তা হলে থাক।

জানো নয়না, তুমি শুনলে আরও অবাক হয়ে যাবে, যাকে সেলিম রক্ত দিল, এই কিছুদিন আগে সেই মানুষটা সেলিমের গায়ে হাত তুলতে গেছল।

কেন?

সে অনেক কথা, লোকটা আসলে একটু অসামাজিক।

সত্যি, এর পরে কী কোনোদিন মুখ তুলে তাকাতে পারবে তার রক্তদাতা, তার শত্রুর মুখের দিকে।

পারবে পারবে, ওরাই পারবে। যেমন এত বাজে কথা বলা এবং তা মিথ্যে প্রমাণ হয়ে যাওয়ার পরেও নজরুল, বসন্ত, জিৎরা তোমার দিকে মুখ তুলে তাকাবে।

একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

হাজারটা করতে পারো, জানা থাকলে নিশ্চয় উত্তর দেব।

আচ্ছা ...। না থাক।

থাকবে কেন? বলো।

বলব?

নিশ্চই বলবে।

বলি তা হলে?

বলো।

প্রদীপবাবু মানুষটা কেমন গো?

যাচ্ছ তো, যেতে যেতেই বুঝতে পারবে।

সুখেনদা বলছিল, সুবিধের নয়। তার একটু ...

হবে হয়তো।

অবশ্য নজরুল, বসন্ত, জিৎরা তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

হয়তো হবে।

কি ব্যাপার বলো তো, তুমি ওভাবে উত্তর দিচ্ছ কেন?

ঠিকই তো বলছি, জানো তো, বেশি বলতে নেই, কবে তুমিই ওদেরকে বলে দেবে।

কি বললে, মারব এক ঘুসি, বুঝবে ঠ্যালাটা।

মারো, একটু আগে তো তার থেকেও বেশি মেরেছ।

কিছু মনে কোরো না, ওরা বলছিল বলে মাথাটা গরম হয়ে গেছল।

বেশ, এবার ঠান্ডা তো?

হুঁ।

তা হলে ... এবার

না, ভালো লাগে না, যা গরম?

কোথায় গরম।

না না, ভীষণ শরীর খারাপ করছে। বুড়ি হয়ে গেছি না।

আমিও তো বুড়ো হয়ে গেছি।

ছাড়ো, ছাড়ো ....



বিকেলের আবহাওয়া আজ যেন বেশ গুমোট। ঘাম দিলে শুকোতে চায় না। তাই হয়তো মদন যেমন বিছিয়ে দেয় মাঝে মাঝে তেমনই পলিথিনের থলি থেকে তৈরি ঢাউশ আসনটা বিছিয়ে দিয়েছে দোকানের সামনেটায় বটগাছের তলায়। যদিও সন্ধে হতে অনেক দেরি তবুও এমার্জেন্সি ল্যাম্পটা বের করে রেখেছে ওখানেই। একে একে আসছে সবাই। রামবাবু এসেছেন সবার আগে। এল আবির, আরও অনেকে।

রামবাবু তাসগুলো শাফল করছেন তো করছেনই। হবে টোয়েন্টি নাইন তাও ওইভাবে শাফল।

রেগে যাচ্ছেন বেচুবাবু—কি হচ্ছে ওটা। আপনি কি আজ ব্রিজ খেলবেন ভাবছেন?

কেন?

ওভাবে শাফল করছেন!

যখন শুরু হবে তখন দেখবে সব ঠিক আছে।

ওঃ

হ্যাঁগো বেচু, মদনটা কি চা লাগিয়েছে বলো তো? বেশ সুবাস উঠছে।

জুড়ি দেন বেচুবাবু—হুঁ, বেশ গন্ধ বেরোচ্ছে।

আবির দেখছিল তালগাছটায় অসংখ্য তাল ফলেছে, তালগুলো এখনই কেটে না নিলে ওর তলা দিয়ে রাস্তায় যাতায়াতকারীদের সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। এই অন্যমনস্কতার জন্য হয়তো শোনেনি, ওরা কি কথা বলছে।

রামবাবু বললেন—শুনছ আবির, বলেছিলাম না ও জাতে বামুন, লোভে কেমন সায় দিচ্ছে।

বুঝতে পারেনি আবির, রামবাবু কেন বলছেন। তাই হয়তো শেষ অংশটুকু শুনেই বলে—ব্রাহ্মণরা ওই রকই!

বেচুবাবু বলেন—এই তো তোমাদের বদরোগ, ভালোকে ভালো বললে তোমরা বাঁকাভাবে দ্যাখো।

মদন চিমটি কাটে—ভালমন্দ যাই হোক, এ বেলাতো বেচুবাবুর খাওয়ানোর কথা, কি আবিরদা ঠিক বলিনি?

হ্যাঁ তেমনই তো কথা ছিল।

তোর কানে কানে বলেছিলাম, তাই না মদন?

বারে, আপনি তো সবার সামনেই বললেন, এখন পাল্টি খাচ্ছেন। একেই বলে লোভী বামুন। পরের যখন খাবে, দমবন্ধ করে খাবে।

কি বললি তুই। আমি পরের খাই?

ওই ঘণ্টা নেড়ে খান আরকী...!

আবির জানে, প্রায় প্রতিদিন দেখে আসছে ওদের দুজনের যত ভাব, ঝগড়াও তত বেশি। এই করতে করতে উঠে পড়বেন বেচুবাবু, তার সাথে মদনকে সমর্থন করবেন রামবাবু, ব্যাস শুর হয়ে যাবে তর্কাতর্কি। মুখে যা আসবে বলে যাবে বেচুবাবু।

তাই হয়তো প্রসঙ্গ বদলানোর জন্য সকালের প্রশ্নটা রামবাবুকে মনে কারিয়ে দেয় আবির—আমি কিন্তু সকালের বিষয়টা জানতে পারলাম না।

কোন্‌টা বলো তো?

আপনি বলেছিলেন, এ জয়টা আসলে ......। —আমি জিজ্ঞাসা করলাম আমরা কি কিছুই করিনি?

ওই বেচুর জ্বালায় কি কিছু বলা যাবে। ব্যাটা যেন হাঁ হাঁ করছে।

বলো না, বলে ফ্যালো, এ বেচু গায়েন কখনও লোভকে প্রশ্রয় দেয় না। মদনা যখন বলছে, আমি নাকি সকালে বলেছিলাম, বিকালে আমার খরচ, তখন খরচই করব।

মদনের দিকে তাকিয়ে বলেন বেচুবাবু—এই মদনা এবেলায় যা খরচ সব আমার, তাড়াতাড়ি চা কর।

নগদ দেবেন তো? তা না হলে তো চাইতে চাইতে আলা হয়ে যেতে হবে। তাও দেবেন যেটুকু দক্ষিণা পান তার থেকে যত রাজ্যের খুচরো পয়সা।

কি বললি, তোর খাতায় আমার কি বাকি আছে?

তা নেই, তবে জমার অংশগুলো যে দেখবে সেই বুঝতে পারবে আপনার দুটো আঙুলের ফাঁক কেমন।

তোকে বুড়োমি করতে হবে না। যা বলছি তাই কর। শালা বাগদির দোকানে যে বামুন উঠেছে, সেটেই তোর ভাগ্য।

আপনি কিন্তু বাগদিবামুনই।

হো হো করে হেসে ওঠে সবাই। এখানে না এলে বোঝাই যায় না পৃথিবী এখনও নীরস হয়ে যায়নি। এখনও হাসি আছে, রসিকতা আছে, মন খারাপের দিনগুলোকে ভুলে থাকার রসদ আছে।

হাসতে হাসতেই রবিবাবু বলেন—জানো আবির, যদি রাত না থাকত, অথবা না থাকত তাল তাল আঁধার, যদি সূর্য না ঢাকা পড়ত কালো কালো মেঘে, অথবা গ্রহণ না লাগত সূর্যে, আলো যে এত সুন্দর বুঝতে পারত না কেউ, অথবা বুঝতে চাইত না কেউ। এই যে দেখছ, সমস্ত পৃথিবী আজ কেমন যেন টালমাটাল অবস্থা, একে অপরকে গিলে খাওয়ার জন্য লোভাতুর দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে, চারদিকে চলছে দখলের লড়াই। কখনও ন্যায় পথে, বেশিরভাগই অন্যায় উপায়ে। সন্ত্রস্ত হয়ে আছে মানুষ। প্রতিটি মুহূর্ত ভয়ে, অস্থিরতায় কাটিয়ে চলেছে তারা। হারিয়ে গেছে আনন্দ, হাসি। ঠিক এই অবস্থায় বেচু, মদনরা ভুলিয়ে দিচ্ছে সবকিছু, যদিও ওদের সংখ্যাটা ভীষণ কম, বেশি হলে বোধহয় আজ মানুষের মনে সততা হারিয়ে যেত না, হারিয়ে যেত না সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ।

আবির জানে এবার কোন্ দিকে যাবেন রামবাবু। তাই বলে—কি জানেন, এই যে সবাইকে প্রতি মুহূর্তে ভাবিয়ে তোলা, এটাই রাজনীতি।

সে তোমরাই জানো, ছলচাতুরি তো দুর্বৃত্তরাই বোঝে।

খ্যাঁকখ্যাঁক করে হাসে মদন, হাসি থামিয়ে বলে—এইজন্যই সবাই বলে চা দোকান।

বেচুবাবু বলেন—শুধু চা দোকান কেন বাবা, চা দোকানিটাও যুক্ত করো। নাকি সম্মানে লাগবে। যদি লাগে তা হলে আবিরের সাথে যোগাযোগ করে একটা ইউনিয়ন করো।

সে কথা কী বললাম। আমি বলতে চাইছি চা-দোকানটা আসলে একটা সেতু, যেখান দিয়ে গেলে দুঃখটুঃখ চলে যায়, পৌঁছে যায় আনন্দঘন স্থানে।

রামবাবুর দিকে তাকিয়ে একটু বাঁকা হাসি হেসে বেচুবাবু বলেন—রামসেতু বলো।

আবির বুঝতে পারে বেচুবাবু রামবাবুকে কটাক্ষ করছে। তাই হয়তো যুক্ত করে আপনিও তো যেতে পারবেন।

মদন যুক্ত করে—তা পারবেন, গিয়ে কারও ঘাড় মটকে কুমড়োর ছক্কা, ফুলকো লুচি, বোঁদে, ছোলার ডাল গলা পর্যন্ত খেয়ে, কিছু বেঁধে তার সাথে দক্ষিণাটা, নতুন গামছা কাপড়টা ....

বলেই ফিকফিক করে হাসে মদন, হাসতে হাসতেই তিন কাপ চা তিনজনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে নিজে একটা কাপ নিয়ে শুরু করে খেতে।

মদনের হাতে চা-এর কাপ দেখে রামবাবু বলেন—সারাদিনে কত কাপ হয় মদন? তা ছাড়া তুমি সব খেয়ে নিলে, রোজগারের ভাগটাতো কমে যাবে।

বোধহয় এতক্ষণে একটা মোক্ষম সুযোগ পেয়েছেন বেচুবাবু রামবাবুকে ঘায়েল করার, তাই হয়তো বলে—ওরে মদনা, এতদিনে তোর একটা হিল্লে হবে মনে হচ্ছে।

মদন বোধহয় এবার হার মানল বেচুবাবুর কাছে। কারণ বুঝতে পারেনি বেচুবাবু কি বলতে চাইছেন। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে মদন, হিল্লে হবে কথাটা শুনে।

আবির বুঝেছে এবার মদন কুপোকাত হবে। সেও তাকিয়ে আছে বেচুবাবুর দিকে। বেচুবাবু কাপের গরম চা-টাতে ফুঁ দিচ্ছেন যেন আপন মনে। ফুঁ দিতে দিতে এক চুমুক খেয়ে বলেন—মদনারে রামবাবু আর কতদিন বাঁচবেন। পারিস তো ওনার

কাছে শিখেনে কী করে এক কণা খুদকে পনেরো কণাতে পরিণত করা যায়। ওনাকে দেবলোক থেকে এখানে স্বয়ং নারায়ণ পাঠিয়েছেন তোকে কিছু শেখানোর জন্য।

এবার বুঝতে পারে মদন। সবাই বেচুবাবুকে কৃপণ বলে অথচ কাউকে কিছু বলার সুযোগ পায়নি। এখন সুযোগ পেয়ে কাজে লাগালেন।

কথাগুলো বলার পর বেচুবাবু তাকান রামবাবুর দিকে। রামবাবুর এত সুন্দর ফরসা গালদুটো যেন লাল টকটকে হয়ে গেছে।

চিৎকার করে ওঠেন রামবাবু। রেগে গেলে তার মুখ থেকে এমন কিছু ভাষা রেরোয় যা শুনতে কখনও কখনও ভালোও লাগে, কখনও মনে হয় রামবাবুর মুখে ভাষাগুলো বেমানান।

সে সব বুঝবে যারা শুনছে। রামাবাবু বলেন—শালা লোকের না হলে মুখে ওঠেনি, আবার পরকে জ্ঞান দিচ্ছে। দূর শালা, তোর লজ্জা থাক। আলোচাল ছাড়া তো ভাতের কেমন স্বাদ জীবনে বুঝলি না। ওই লোকের বাড়ি ছাড়া ......

রামবাবু বেচুবাবুকে একবারে তুই-এর পর্যায়ে এনেছেন।

কিন্তু বেচুবাবু নির্লিপ্ত। অন্তত এখন তিনি রামবাবুর কথা গায়ে মাখেননি, উলটে রাগানোর জন্য বলেন—কি করি বলুন তো, সব রামবাবুরাই যদি বেছে বেছে খেতের পড়ে থাকা মাটি কাঁকর সুদ্ধ ধানকে কুটে বামুনদের জন্য রেখে দেয়। কি জানেন রামবাবু, আপনারা হলেন গিয়ে যাকে বলে ......

থামিয়ে দেয় আবির—থাক বেচুবাবু আর নয়। এবার একটু বসলে ভালো হত।

কী করে বসবে, তিনজনে কি খেলা যায়?

সুতরাং আজ আর খেলা হল না। আজ গল্পে মেতে উঠল সবাই। প্রস্তাব দিল বেচুবাবু—খেলা যখন হল না, তখন রামবাবুর কাছ থেকেই শোনা যাক এমন ফলাফল কেন হল? উনিই তো বলেছিলেন এবার একটা ঝড় উঠেছে। অনেক কিছু ওলট-পালট হবে।

রাগ পড়ে গেছে রামবাবুর, উনি ওই রকমই। খুব তাড়াতাড়ি রেগে যান। আবার তক্ষুনি ঠান্ডা হয়ে যান। যদিও সবটার কারণ ওই বেচুবাবু। দুজনে ভাবও তেমন। যাকে বলে হরিহর আত্মা।

রামবাবু যেন হঠাৎ আত্মস্থ হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ ওই ভাবে থাকার পর বলেন—থাক না ওসব কথা, বললে কার মনে ব্যাথা লাগবে, কে হাসবে মুখ টিপে টিপে।

আবির বলে—এখানে এমন কেউ নেই যে প্রতিক্রিয়া জানাবে।

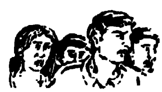
নেই ঠিকই। বলা তো যায় না, ওই শালা বেচুবাবুই সব এ-কান ও-কান করে দেবে।

অমায়িক হাসি হাসেন বেচুবাবু। বলেন—আরে না না, আপনিই আমাকে, যাকে বলে আন্ডার এস্টিমেট করেন। যজমানদের ঘরে গেলে পায়ের ধুলো রাখে না।

আবার খ্যাঁকখ্যাঁক করে হাসে মদন, হাসতে হাসতে বলল—তাই বলুন, এই জন্যই আপনার চরণদুটো এত সুন্দর!

হ্যাঁরে, তোর মতো ছাতুফাটা!

আবির বলে—আঃ মদন। তুই না ......



রামবাবুর স্ত্রী মারা গেছেন বছর দুই হল। এক মেয়ে এক ছেলে। মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন কলকাতায়। জামাই ডাক্তার, ছেলে এম. টেক করে দিল্লিতে। রামবাবু একা কুম্ভের মতো রক্ষা করে চলেছেন তার কেল্লা।

টিনের ছাউনি পুরোনো আমলের বাড়ি। ঘরের মধ্যে বাগান, অবশ্য প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। বাড়িতে অগভীর নলকূপ বসিয়ে দিয়েছে ছেলে। সুইচ টিপলেই জল। রামবাবুকে দেখভাল করার জন্য রয়েছে মদনেরই পাড়ার এক কাকিমা। ভীষণ বিশ্বস্ত। বাগানে নেই এমন ফুল নেই। কয়েকটা আমগাছও আছে। এই সময় প্রতিটি গাছ যেন ভার নিতে পাচ্ছে না তার সন্তানদের। তা বলে একা সব খান না রামবাবু। মদনের চা দোকানে নিয়ে আসেন পাকা আম। সবাই মিলে ভাগ করে খান। বেচুবাবুর জন্য বাড়তি দুটো। ব্রাহ্মণ বলে। আবার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বলে।

ছেলেমেয়ে কতবার বলেছে—এখানে থেকে কি লাভ। সব বিক্রি করে দিয়ে আমাদের কাছে থাকবে চলো।

না-কে হ্যাঁ করাতে পারেনি কেউ। তার ওই এক কথা—বাবার ভিটে। বড়ো মায়ারে, এখনও পারছি তাই আছি। যখন পারব না তখন সব বিক্রি করে নিয়ে যাবি। তা ছাড়া এই যে তোরা, মাঝে মাঝে আসিস, কত ভালো লাগে বল তো, তোরাও তো তোদের কর্মস্থলে বলতে পারছিস দেশের বাড়ি যাব। দেশের বাড়ি গেছলাম। দেশের বাড়ি থেকে এলাম।

ব্যাস সব চুপ। আসলে ওই নাড়ির টান। ওরা তো বিদেশি নয়, যে টান নেই। যা মন চায় তাই করে চলে যাবে নিজেদের জায়গায়, ইংরেজদের মতো। বর্তমানে আমেরিকার মতো। অথবা ওরা তো অন্য কোনো যাকে বলে মতবাদ নয় যে ঢেলে দিয়ে চলে যাবে সবার গলায়। শ্বাসনালিতে গেল নাকি খাদ্যনালিতে গেল বোঝার দরকার নেই। প্রচারের দরকার আমরা ঢেলে দিয়েছি।

ছেলেমেয়ের ব্যাপারে রামবাবুকে এই মদনের দোকানেই সেলিম জিজ্ঞাসা করতে এসব কথাই বললেন রামবাবু।

জানো সেলিম—নিজের দেশের মাটি বড়ো ন্যাওটা গো, ওরা ছাড়তে চায় না। কেন জানো, ওরা হঠাৎ করে গজিয়ে ওঠেনি।

তা হলেও, আপনার তো বয়স বাড়ছে, এভাবে কতদিন চলবে।

চলবে, যতদিন পারি। আসলে কি জানো, এখানের এই সৌন্দর্য, মানুষের এমন হৃদয় ছেড়ে মন চায় না নির্বিকারত্ব নিয়ে থাকতে।

ওখানে তো রাজনৈতিক টানাপোড়েন নেই।

এখানে সবকিছুকে গুরুত্ব না দিলে অপার শান্তি, এই যে ধরো তোমরা—কেউ বামপন্থী, কেউ ডানপন্থী, এই জনার্দনপুরে কেমন মিলেমিশে একাকার হয়ে আছি বলো তো? মদনের চা-র দোকান আছে। এখানটা যেন সবকিছুর মিলন মন্দির। তারপর আছেন কুনালবাবু, যদিও তিনি এখন নেই, ছেলের কাছে গেছেন কয়েকমাস, চলে আসবেন যে-কোনোদিন, উনিও আছেন।

এমনিতে ভীষণ ভালোমানুষ আমাদের স্যার। উনি তো বর্ধমানেই থাকতেন। অবসর নেওয়ার পরও ছিলেন। এই তো ক-বছর হল গ্রামে ফিরেছেন। ওনাকে গ্রামের অনেকেই চেনেন না, আমার মিসেস বা নয়না ওরাও কেউ চেনে না।

চিনে যাবে।

রামবাবুর নামে একটা প্রবাদ ছিল একসময়। ওনার নামে নাকি বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খেত। এখন বদলে গেছেন। তখন অবশ্য অফিসার ছিলেন, যাকে বলে দোর্দণ্ডপ্রতাপ অফিসার। অন্যায়ের সাথে কোনোদিন আপস করেননি। করলে আজ ওনার অনেক কিছু হত। মানুষটা জীবনযাপনে আগেও যা ছিলেন আজও তাই রয়ে গেছেন। অথচ সেই মানুষ আজ যেন অন্যরকম। আর সেই ভয় ধরানো ধার আর নেই। মনেই হয়না তিনি ওই রকম ছিলেন।

রামবাবুর অতীত কথা শুনতে শুনতে জিজ্ঞাসা করে সেলিম—আপনি এভাবে নিজেকে বদলালেন কি করে?

জীবন তো এমনই, তাই না সেলিম। পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিতে হয়। তখন আমার কোমরে বাঁধা থাকত পিস্তল। আজ তো ওসব নেই। যেটা আছে তা সবার কাছে একটু ভালোবাসা পাওয়ার এবং ভালবাসা দেওয়ার সম্বল। এই যে ধরো তুমি, তুমিও আস্তে আস্তে বদলে ফেলছ নিজেকে। বদলে যেতে হয় সেলিম।

হাসতে থাকেন রামবাবু, মনজুড়োনো হাসি, সহৃদয় অভিভাবকসুলভ হাসি।

ততক্ষণে আবার এককাপ চা ধরিয়ে দিয়ে গেল মদন। নিজেও নিল এককাপ। পাশে এসে বসল মদন। এখন কোন খদ্দের নেই। আসবে একজন একজন করে।

সেলিমকে বলেন রামবাবু—একদিন এসো না আমার বাগানে, ওখানে বসে গল্প করা যাবে, কমলা আছে, ও চাও খাওয়াবে। জানো—বেচু এখন আমার প্রায় সঙ্গীই বলতে পারো, ওর কাজ না থাকলে চলে যায় আমার বাড়ি, তুমিও আসতে পারো। আসলে তিনজনে জমবে ভালো।

মদন বলে—আমাকে তো বললেন না?

তোমার সময় কোথায়? সময় পেলে যেয়ো।

স্ত্রী মারা যাওয়ার পর থেকে সত্যিই নিঃসঙ্গ রামবাবু। ঠিক তখন থেকেই বেচুবাবুর ওখানেই প্রাত্যহিক যাতায়াত।

জানো সেলিম চেয়ার বড়ো অদ্ভুত জিনিস। ও তোমাকে শেষ করে দিতে পারে, আবার যা তোমার কল্পনার বাইরে সেই সম্মানও দিতে পারে। সবকিছু নির্ভর করছে তোমার উপর।

তাই!

এই যে আমি এস আই হিসেবে চাকরিতে নিযুক্ত হলাম, তারপর প্রথম প্রোমোশন। আমি জানতাম, কি আমার কাজ। বুঝতাম এই কাজকে মানুষ ভালো চোখে দেখে না, ভয় করে। এই কাজে যুক্তদের সবসময় তোশামোদ করতে হয় রাজনৈতিক নেতৃত্বকে। তা না-হলে বদলি করে করে নাজেহাল করে দেবে। আমাকে ওদের কথা না শোনার জন্য কতবার যে বদলি হতে হয়েছে তার ঠিক নেই, তারপরেও বদলাতে পারেনি আমাকে। যেখানেই গেছি ....। না থাক তোমাকে আর একদিন জায়গাগুলোর নাম বলব তুমি পারো তো খোঁজ নিয়ে জেনে নিয়ো।

কেন এমন হয় বলুন তো, কেন আপস করে অনেকে।

করে না, প্রথমে কেউ করতে চায় না। পুলিশ মানে বদমাশ, ঘুষখোর, অন্যায় প্রশ্রয়কারী বা অন্যায়কারী আসলে তা নয়। বলতে পারো বাধ্য হয়—এই যে তুমি

আমি শুনেছি, আমি জানি, যদিও তোমার বাড়ি গোকুলপুরে, আমার জনার্দনপুরে, দূরত্ব পথের। তোমাকে দল পারল না তাদের পথে হাঁটাতে, বিশেষ করে তরুণ তুর্কিরা এবং ভুল পথে। কি করল, তোমাকে সরিয়ে দিল, তাইতো?

বিশ্বাস করুন আমি কোনো অন্যায় করিনি। আমি তেমনভাবে ধর্মে বিশ্বাসী নই, তবু কোরান ছুঁয়ে বলতে পারি, ওরা যে অপবাদ আমাকে দিল তা সম্পূর্ণ মিথ্যা, মনগড়া।

সেলিমের মনে রাশি রাশি হতাশা, ক্ষোভ। বৃষ্টির দিনে বৃষ্টিহীনতায় খেতের মতো। যে ক্ষেতের দেবার ছিল অনেক, দিয়েছে অনেক, আজ বৃষ্টি নেই। খেত ফেটে চৌচির, তাদের হতাশা—আদৌ বৃষ্টি হবে তো!

জানি, বুঝি সব। অথচ দ্যাখো ওই চেয়ারে বসে যারা অপব্যবহার করল তার ক্ষমতার, অপমান করল চেয়ারটাকে, তারা বহাল-তবিয়তে আছে, যেন অনিঃশেষ সময়। কারণ তারা তোষামোদ করে। কারণ তাদের সাথে আছে যারা নাকি সমাজকে এলোমেলো করে দিতে পারে, সেই সব মানুষগুলি। সে রাজনৈতিক চেয়ারই বলো আর প্রশাসনিক চেয়ারই বলো। তারা ভুলে যায়, যাদেরকে তোষামোদ করছে তারা না শিক্ষাদীক্ষায়, না চেতনায় কোনোদিকেই ধারে কাছে নেই।

এর কি কোনো প্রতিকার নেই?

সেভাবে বলতে গেলে, হয়তো নেই। যদি কেউ ঈশ্বর মানে, সততা অবশিষ্ট থাকে তা হলে সে অনুভব করে তার সমস্ত জীবন কি ভুল করেছে। যদিও ওই সব মানুষ যারা ঈশ্বর মানেন না—অন্তত তাদের কর্মকালীন সময়ে। পরে মানেন, মানুষের কাছে গল্প করেন, তাদের সততার ভাবমূর্তি নিয়ে গল্প। তুমি খোঁজ নিয়ে দ্যাখো, ওই সব মানুষের বংশপরম্পরায় চলতে থাকে টালমাটাল অবস্থা। আসলে কে কেমন, প্রমাণ করে তার পরবর্তী বংশপরম্পরা।

সত্যিই কি তারা অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ হয়।

হয় হয়। সবাইকে বসতে হয় মানদণ্ডে। সে তুমি যত বড়ো, যত দাম্ভিক, যত উচ্চ পদাধিকারী হও না কেন।

আপনার ছেলে মেয়ে তো ভীষণ কিছু ....

জানি না, সে তো তোমরা জানো। আমি সৎভাবে আমার কর্তব্যপালন করেছি শুধু।

রামবাবুর বউমা, নাতি কতবার বলেছে, রাজি হননি রামবাবু, সবার অনুরোধের

উত্তরে একটি রেকর্ডই বাজিয়ে চলেছেন—এ বাড়িতে আমার সব স্মৃতি জড়িয়ে আছে, এখানে যেন আমি দেখতে পাই আমার ছেলে মেয়ের হামাগুড়ির হাঁটুর দাগ। প্রতিমুহূর্তে শুনতে পাই আমার স্ত্রীর নিশ্বাস। এগুলোকে অযত্নের ধুলো চাপা দিয়ে কি করে যাই বলো তো? তার থেকে যতদিন পারি থাকি। যখন বিছানা ছেড়ে আর উঠতে পারব না তখন যদি তোমাদের ইচ্ছে যায় নিয়ে যেয়ো। .

রামবাবুর বউমা মজা করে বলে—এক কাজ করলে হয়না বাবা? আপনার নাতিকে নিয়ে যদি আমি এখানেই থেকে যাই।

তা কেন মা, তোমরা এখনি কেন থাকবে। এখানে থাকলে তোমাদের স্বপ্নগুলোর যে অকাল মৃত্যু হবে বউমা, তবে তোমাদের অবসরের পরে যদি মনে হয়, এখানে আসতে পারো। এখানে সোঁদামাটির ঘ্রাণ আছে। গাঁয়ের মানুষের সুখদুঃখের ছবি আঁকা আছে। মাঠের ফসলের গান আছে। চূড়ান্ত ব্যস্ত জীবনযাপনের পর এখানে শান্তি হয়তো পেতে পারো বউমা।

রামবাবুর মেয়ে আসে যখন-তখন। আসে ডাক্তার জামাই, প্রয়োজনীয় ওষুধ দিয়ে যায়। তা ছাড়া যেটুকু সময় থাকে রামবাবুর অনুরোধে গাঁয়ের অসুস্থ মানুষদেরকেও দেখে যায়।

ধর্মকর্মে ততখানি মন নেই রামবাবুর। কিন্তু ওই বেচুর পাল্লায় পড়ে যেন উপরোধে ঢেঁকি গিলছেন প্রতিদিন। সেখান থেকে নিয়েছেন অনিচ্ছাকৃত অভ্যেসের দাসত্ব। রামবাবু সময় কাটান বাংলা সাহিত্য, বিদেশি সাহিত্য আর যত সব ক্রাইম সংক্রান্ত পত্রিকা পড়ে। তিনি লেনিনের লেখা পড়েছেন। পড়েছেন মার্কসীয় দর্শন, সলমন রুশদির স্যাটানিক ভার্সেস এর অনুবাদ পড়েছেন।

আসলে মানুষটা বিজেপি ঘেঁষা হলেও আদতে বাম বিশ্বাসে বিশ্বাসী। কিন্তু মেনে নিতে পারেননি আজকের ধর্মচ্যুতদের অপছন্দের তালিকায় মুখোশ পরা কংগ্রেসিদের।

রামবাবু বাগানের ফুলগুলো সেলিমকে দেখাতে দেখাতে বলেন—আচ্ছা সেলিম, এই যে সব ফুল দেখছ তোমার ভালো লাগছে না, তোমার মনে হচ্ছে না এদের প্রতি নিজের সব ভালোবাসা উজাড় করে দিতে, এদেরকে ভালোবাসতে?

সে তো স্বাভাবিক। যা কিছু সুন্দর মানুষ তো তারই পূজারি, তার প্রতি ভালোবাসা থাকাটাই তো নিয়ম।

যদি ফুলগুলো পোকায় খেয়ে নেয় ....

কষ্ট হবে, করুণাও হতে পারে, তাদের সৌন্দর্যকে পোকায় নষ্ট করেছে বলে।

ঠিক তেমনই কষ্ট হয়, হচ্ছে আজকের দিনে পোকা নামক নীতি ভ্রষ্টতায় যখন সমাজটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তাই দেখে।

তার সাথে অহংবোধও তো সব কিছু নষ্ট করে দিচ্ছে, তাই না!

এটা তো সবচেয়ে বড়ো বিপদসংকেত, এবং এর থেকে তো অধঃপতন অনিবার্য্য, তুমি দেখে নিয়ো সেলিম, এরা একদিন সবার ঘৃণার বস্তু হয়ে দাঁড়াবে, হয়তো তারপরও মানুষ এদের কুর্নিশ করবে। যেখানে শ্রদ্ধা থাকবে না, ভালোবাসা থাকবে না, বিশ্বাস থাকবে না, তাল তাল ঘৃণা এবং ভয় ছাড়া।



সময় বদলে দেয় অনেক কিছু, অনেককে। তখন পুরাতনকে খুঁজে ফেরার অর্থ কারও কারও কাছে বিলাসিতা, কারও কারও কাছে শুধুমাত্র নস্টালজিয়া। তখন কেউ আড়ালে দাঁড়িয়ে থেকে হাসে। কেউ দেখে তাচ্ছিল্যের চোখে, কেউ লাভ ক্ষতির অঙ্ক কষে বলে—এসব ভেবে কি লাভ!

কালী নন্দী প্রশ্ন করে—সময়ের সাথে সাথে কি সবকিছুর অবলুপ্তি হয়ে যাচ্ছে?

জীবনের এক অদ্ভুত পরিণতি এই কালী নন্দীর। শিক্ষিত বেকার, দারিদ্রের মধ্য দিয়ে তার পড়াশোনা। চাকরির খোঁজে হন্যে হয়ে ঘোরা। স্কুলশিক্ষকতা পাওয়া, ডোনেশন দিতে না পারার জন্য সেটাও চলে যাওয়া, সেখানে থেকে বিতৃষ্ণা, তারপর সমস্ত জীবন টিউশন পড়ানো, চলে যায় কোনোরকমে।

সিদ্ধার্থ রায়ের আমল দেখেছে। দেখছে বামপন্থী সরকার। বয়সতো কম হল না, পঞ্চাশ শেষ করে তিপান্নর ঘরে। অঙ্কে স্নাতক। দারিদ্র তাকে আর এগিয়ে যেতে দেয়নি।

তখন বামপন্থী সরকার এল। আশার আলো দেখল, যুক্ত হল দলের সাথে, তারপর জল গড়িয়েছে অনেকদূর। কিন্তু কালী নন্দীর জল যেন কোনো এক পুকরের বাঁধে আটকে গেছে। বাতাসে মৃদু ঢেউ ছাড়া উথালপাথাল ঢেউ আর দেখল না। নিজে না পারলেও, তার ছেলে মেয়েকে উচ্চশিক্ষিত, শিক্ষিতা করেছে। মেয়ের বিয়ে দিয়েছে স্কুল শিক্ষকের সাথে। ছেলে ইঞ্জিনিয়ার, কাজ করে প্রাইভেট সংস্থায়, উচ্চবেতন।

কালী নন্দী দেখেছে অনেক কিছুই, তার মনে হাজারো জিজ্ঞাসা, তার একটি করেছিলেন রহিম চাচাকে।

রহিম চাচা, ওরফে রহিম গাজি, সাং গোকুলপুর। সেলিমের বাড়ি থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে তার বাড়ি। করত ফড়ওয়ার্ড ব্লক, ছেড়েছুড়ে বর্তমানে তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃস্থানীয়।

উত্তর দেন রহিমচাচা—ঠিকই বলেছেন দাদা, অবলুপ্ত হয়েছে প্রাণখোলা হাসি, গাঁয়ে ঘরে শোনা যায় না ঢেঁকির গান, অবলুপ্তির পথে যৌথ সংসার। হারিয়ে গেছে বিশ্বাস, কথা রাখে না কেউ।

কেন এমন হল?

সেটা তো বলতে পারব না, তবে এটুকু বলতে পারি পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে আবার শুরুতে আসে।

আমরা বোধহয় সেই ফিরে আসাকে স্বাগত জানানোর জন্য বেঁচে থাকব না।

হয়তো তাই।

সেদিন কালী নদীর তীরে বঁইচি গাছের ছায়ায় বসে এমনই একটি মন কেমন করা অলস দুপুর কাটাচ্ছিলেন কালী নন্দী আর রহিম গাজি। ওরা বেরিয়েছিলেন জনার্দনপুরের পথে। আবিরের বাড়ি যাবে বলে। দুজনেই কিছু সমস্যার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে কয়েকদিন হল। সেলিম তার অবস্থানে থাকলে হয়তো সেখানেই সমাধান সূত্র পেয়ে যেত। কিন্তু সে তো নেই যারা আছে তাদের কাছে যেত মন চায়নি ওদের। তারা যেন অন্য রকম, সমস্যা কমানো নয়, সমস্যা বাড়ানো তাদের অভ্যেস। সেলিমই বলেছিল—রহিমচাচা তুমি আবীরের কাছে যাও। কালী নন্দী অবশ্য নিজেই স্থির করেছিল আবিরের দ্বারস্থ হওয়ার। একই পথের যাত্রী দুজন। যেতে যেতে দেখা হয়ে গেল হিজল গাছটার কাছে। তারপর পায়ে পায়ে এই বঁইচি গাছের ছায়ায়। সেখানে বসে বিঁড়ির সুখটান। সমস্যার কথা আলোচনা।

গাছটায় বঁইচি ধরে আছে অনেক। আছে মিষ্টি গন্ধছড়ানো তারার মতো বঁইচি ফুল। আছে মৌমাছির গান। ঘন পাতার শামিয়ানা ছিঁড়ে রৌদ্রের ক্ষমতা নেই গাছের তলার মাটি ছোঁয়ার। এখানে বসলে লক্ষ লক্ষ ঘুম যেন চোখে এসে বাসা বাঁধতে চায়, মন হারিয়ে যায় কোন এক সুদূরে, যেখানে আঁকা আছে যত সব সুখের ছবি।

ওই পথেই আবির চলেছে সেলিমের বাড়ি, এই দুপুরেই।

বেরুনোর সময় নয়না জিজ্ঞাসা করেছিল—কি গো এই ভরদুপুরে কোথায় বেরুলে?

সেলিমের বাড়ি।

হঠাৎ!

দরকার আছে।

আমাকে বলা যাবে না?

আসলে কি জানো, শুনলাম ওরা নাকি ওদের ছেলের কাছে যাবে। ওখানে থাকবে বেশ কিছুদিন। তাই ভাবলাম যাওয়ার আগে একবার দেখা করে আসি।

অনেক দিন হল, সেলিম আসেনি, তাই না গো?

আবার সেই ফেলে আসা স্মৃতি। একসাথে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করা, বড়ো বড়ো সমস্যাকে সমাধান করা। সবার চোখের মণি হয়ে থাকা।

কেমন যেন মন খারাপ করছিল আবিরের, নয়নারও তো। ওরা যেন একই বৃন্তের ফুল হয়েছিল সেই ছাত্রজীবন থেকে। একটা ফুলকে সবাই ছিঁড়ে নিল কিন্তু বৃন্তের দাগ!

জানো নয়না, মাঝে মাঝে মনে হয় আমারও বোধহয় শেষের দিন ঘনিয়ে এসেছে।

ছাড়ো তো। ওসব ভেবে কিছু লাভ আছে?

বলল নয়না ছাড়ো তো। কিন্তু মন। সে কি বলছে? কেন তার সুন্দর বুক ঠেলে বেরিয়ে এল একটা দীর্ঘশ্বাস। পথ হাঁটছে আবির, হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ অগুনতি রৌদ্র কিরণ তার শরীরে বিঁধে চলেছে। হয়তো যন্ত্রণাও হচ্ছে তার। কিন্তু সমস্ত যন্ত্রণাকে সরিয়ে দিয়ে সেলিমকে দীর্ঘদিনের সাথি হিসেবে হারানোর যন্ত্রণা স্থান করে নিয়েছে আবিরের মনে। অন্যমনস্ক আবীর। পথ চলছে, আনন্দ নেই। বাতাস বইছে, সে বাতাস যেন লাগছে না তার শরীরে।

কালী নদীর পার। সেখানে সারি সারি বঁইচি গাছগুলো যেন বলছে—কি হল আবির, তুমি আমাদেরকে দেখছ না কেন? তোমার কি মনে পড়ছে না সেই ছোট্ট আবিরের কথা। আমাদের মনে আছে। তোমার হাতের দাগ এখনও লেগে আছে আমাদের গোড়ায়, তুমি তাকাও আবির। যেমন বলছে গরিব মানুষগুলো।

কেমন যেন অবসাদ ভর করছে আবিরের মনে। যেন আর হাঁটতে ইচ্ছে করছে না তার। একটা বেশ বড়ো বঁইচির তলায় দাঁড়াল আবির। হাত বাড়ালেই ঘন বেগুনি বঁইচি। ওগুলো দেখার পর বদলে গেল আবির, সেলিমের জায়গাটা যেন দখল করে নিল আবিরের ছোটোবেলা। আবার ঝুড়ি ঝুড়ি স্মৃতি ভিড় জমাল আবিরের মনে।

কয়েকটা বঁইচি পাড়ল আবির, খেল সেগুলো। আরও পাড়ল। ভরল প্যান্টের পকেটে। জামার বুক পকেটে।

আটত্রিশ বছর আগেকার দিনগুলো আজ হঠাৎ এসে দাঁড়াল বঁইচির তলায়।

তখন জনার্দনপুর, গোকুলপুর, উত্তরপাড়া, পশ্চিমপাড়া এই সব লাগোয়া গাঁগুলো ছিল যাকে বলে গণ্ডগাঁ। যোগযোগ ব্যবস্থা ছিল না বললেই হয়। জনার্দনপুরের রায় আর মান্না পরিবার ছাড়া তেমন বর্ধিষ্ণু পরিবার এখানে ছিল না। এই সব গাঁয়ের বুক চিরে এই নদীটা। তখন এর গভীরতা ছিল আরও বেশি। সারাবছর জল থাকত সমস্ত নদীটায়। পাড়ে ছিল পারকুল, শেঁকুল, কিছু জামগাছ, তালগাছ, হিজল গাছ। কয়েকটা মাদার গাছ, বঁইচি গাছ। একটা তালগাছ ছিল, সে যেন সোজা হয়ে দাঁড়াতে না পেরে অর্ধশায়িত হয়েছিল। তার মাথা ছিল নদীর দিকে রাখা। সেই গাছটায় উঠত আবিররা, লাফ দিত নদীর জলে। আবার গাছে ওঠা, আবার জলে পড়া। এইভাবে কাটত সমস্ত দুপুর। তখন তো বাধা দিত না কেউ। আজকের বাবা-মার মতো বলত না রোদ্দুরে বেরুবি না। জল ঘাঁটবি না, গাছে উঠবি না। যেখানে সেখানে জল খাবি না, ফল খাবি না পরিষ্কার জলে ধুয়ে, কেবল বাধা আর বাধা। এই প্রাচীরের বাইরের জগৎটা দেখার সৌভাগ্য আজকের ছেলে মেয়েদের প্রায় নেই বললেই হয়। আর বাধার মধ্যে থেকে থেকে মন হারানো মৌলিকতাবাদ যেন তাদের মনগুলোকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে তার প্রতি পদক্ষেপে।

সুদর্শন সরখেলের কথায়—কৌটোতে যদি ঘি থাকে, তাকে একবার যদি গলতে দেওয়া হয় এবং কৌটোকে কাত করে রাখা হয়, এক ফোঁটা ঘিও আর কৌটোতে থাকবে না, মানুষের স্মৃতিও ঠিক একই। আবিরের মনের অবস্থাও তাই। সব মনে পড়ছে। বেরিয়ে আসছে স্মৃতির কৌটো থেকে।

জ্যৈষ্ঠের দুপুর। লাগোয়া প্রায় সব গাঁ থেকে দঙ্গল বেঁধে আসত সব ছেলে মেয়েরা। মেয়েরা আনত নুন লংকা গুঁড়ো করে।

গাছে উঠে জাম পাড়ত, কয়েতবেল পাড়ত, বঁইচি পাড়ত। ওঃ সে কি মজা, সেলিমের বহিন নুরি আসত, আসত সাবির, জুবেদা। আসত রানি, লক্ষ্মী, নমিতা, বিকাশ। বঁইচি তুলে মালা গাঁথা হত। সেই মালা পরত গলায়। সেই মালা থেকে একটি একটি বঁইচি খসিয়ে খাওয়া হত যতক্ষণ না শেষ হয়।

খেজুরের দিনে খেজুর পাড়ত রহমত। ও ছাড়া কেউ খেজুর গাছে উঠতে পারত না। ভীষণ সাহসী আর জেদি ছিল রহমত।

রহমত। মনটা হঠাৎ ভারাক্রান্ত হয়ে গেল আবিরের, ওর কথা মনে পড়ে যেতে।

রহমত আশ্রয় নিয়েছিল বিরোধী শিবিরে। কথায় কথায় রেগে যেত সে। কিন্তু তরে অভ্যেস ছিল সবার আগে হাঁটার। সবার আগে যা কিছু করণীয় তা করার। কত গল্প বলত রহমত, সব ডিটেক্টিভ গল্প। লড়াইয়ের গল্প। সেই রহমত উঠত খেজুরগাছে। খেজুর পাড়ত, তলায় কুড়োত সবাই। খেজুর পাড়া শেষ হলে নেমে আসত নিচে। এসে দেখত তার জন্য তিনটে ভাগ রাখা হয়েছে। এমনই হত সব ব্যাপারে রেগে যেত রহমত—এটা হল কেন?

রানি বলত—তুমি যে সবচেয়ে বেশি কষ্ট করেছ মহারাজ।

হো হো করে হাসত রহমত। রানির মাথায় টোকা দিয়ে বলত—মহারাজ নয়রে গাধা, বল সম্রাট। তারপর তার তিনভাগ থেকে দুভাগ সবাইকে বিলিয়ে দিয়ে বলত এই নে, সম্রাট তার প্রজাদেরকে দিচ্ছে।

সেলিম বলত—জো হুকুম।

একবার জামগাছে জাম পাড়তে উঠে ডাল ভেঙে মাটিতে পড়ে পায়ে মোচড় লেগেছিল রহমতের। বাড়িতে কাউকে না বলে চুন-হলুদ গরম করে লাগিয়ে ছিল নিজেই। শেষ পর্যন্ত লুকিয়ে রাখতে পারেনি। তার আম্মা আব্বা জেনে গেল। বকুনিও দিয়েছিল খুব।

সেই রহমত দেখেছিল তার আব্বাকে, যে আম্মাকে তালাক দিয়ে নিয়ে এসেছিল নতুন আম্মাকে। নতুন আম্মার অত্যাচারে তাকে বাড়ি ছেড়ে আশ্রয় নিতে হয়েছিল মামার বাড়িতে।

সেই রহমত তখন থেকেই ঘৃণা করত তালাক দেওয়াকে। হয়তো তার আম্মাই তাকে বুঝিয়েছিল।

সেই রহমত দুপক্ষের লড়াইয়ে সামনে এগিয়ে গেছল একটা তলোয়ার নিয়ে। ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই কয়েকটা গুলি এসে তাকে ঝাঁঝরা করে দিল।

পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখের জল মুছল আবির। তাকাল সেই জামগাছটার দিকে। জামগাছটা এখন বৃদ্ধ, উলঙ্গ। তার সমস্ত শরীরে পোকা কাটা দাগ। হয়তো হতে পারে সময়, অবস্থা, কালের আঘাতে আহত হতে হতে আজও দাঁড়িয়ে আছে আগামীকে দেখার জন্য। কেউ তাকে কেটে নিয়ে যায়নি, আদর করে ফার্নিচার করেনি তার সমস্ত শরীরকে নিয়ে, আসলে সে অথর্ব বৃদ্ধ, জ্বরাগ্রস্ত একটা গাছ। মানুষের সমাজে অকর্মণ্য বৃদ্ধের মতো।

বঁইচি গাছের তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক একটি বঁইচি খেতে খেতে এই সব স্মৃতি, এইসব ভাবনা ভিড় করছে আবিরের মনে।

আবির যেন দার্শনিক হয়ে গেছে। ছোটো বেলার খেলার স্থল এই কালী নদীর তীরে এসে।

একসময় তার মনে হল এবার যেতে হবে। আরও কিছু বঁইচি পকেটে ভরে হাঁটা দিল আবির একবুক স্মৃতিকে নিয়ে।

যেতে যেতে দেখল কারা যেন বসে আছে একটা গাছের তলায়। চশমাটা খুলল আবির, মুছে নিল রুমাল দিয়ে। পরে নিল চোখে। এবার স্পষ্ট দেখছে সে যারা বসে আছে, তারা রহিম গাজি আর কালী নন্দী।

কাছাকাছি গিয়ে জিজ্ঞাসা করল—কি ব্যাপার, এই দুপুরে তোমরা এখানে যে!

রহিম গাজি প্রতি প্রশ্ন করে—সে কথা তো আমিও জিজ্ঞাসা করতে পারি, তাই না আবির?

তা অবশ্যই পার, তা বলো, তোমরা সব কেমন আছো?

তোমরা কি ভালো থাকতে দেবে?

কেন? আমরা আবার কি করলাম?

জিজ্ঞাসা করো কালীকে।

কালী নন্দীর মুখের দিকে তাকায় আবির, জানতে চায়, রহিম গাজি কি বলতে চাইছে।

কালী নন্দী, রহিম গাজি তাকাচ্ছে এ ওর মুখের দিকে। ওরা যেন সিদ্ধান্তে আসতে পারছে না কে বলবে। অথচ না বললেই নয়। তা ছাড়া ওরা তো আবিরের কাছেই যাচ্ছিল সবকিছু বলে একটা বিহিত করতে।

ধৈর্য ধরছে না আবিরের। কেন-না অনেকটা দেরি হয়ে গেছে। সেলিমের সাথে দেখা করেই আবার ফিরে আসতে হবে। বিকেলে একটা জরুরি সভা ডাকা আছে।

জিজ্ঞাসা করে আবির—কি হল, কিছু বলছ না যে?

জানায় রহিমগাজি—কি আর বলব। তোমরা তো ছেলেদের পাঠিয়ে দাও। জানার চেষ্টাও করো না ওরা গিয়ে কি করল।

একটু খোলসা করে বল তো?

আরে ওই জনা দশ বারো ছেলে, তারা আমার বাড়িতে গিয়ে বলে কিনা, আমরা

একটা সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করছি। আপনাকে তিন হাজার টাকা দিতে হবে।

আমাকে বলে আপনাকে পাঁচ হাজার টাকা দিতে হবে।

তোমরা দিলে?

সেখানেই তো বাঁধল গন্ডগোল। বললাম এত দিতে পারব না, আমাদের সাধ্যমত দেব।

তারপর!

ওরা বলল, না দিলে এমন ব্যবস্থা নেব ....

যেন অবাক হল আবির, এমন নির্দেশ তো কেউ দেয়নি। তা ছাড়া যে অনুষ্ঠানের কথা বলা হচ্ছে সেটা তো গণনাট্য সংঘ করবে। যেটুকু খরচ হবে সে তো দলীয় সংগঠন দেবে। তা হলে ওদের কারা পাঠল, কেনই বা পাঠাল।

আবার মনে হয় এরা যা বলছে সব সত্যি তো। নাকি এদের অভ্যেস মতো এরা প্ররোচিত করতে চাইছে, চাইছে একটা ফাটল ধরাতে।

আর যদি সত্যি হয়, তা হলে কি ধরে নিতে হবে এরা যা খুশি তাই করবে। সামলাতে হবে নেতৃত্বকে, ভাবমূর্তি নষ্ট হবে দলের। নাকি এইভাবেই ...

কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর আবির বলে—আমি দেখছি কি ব্যাপার, তোমরা কাল সকালে একবার আমার বাড়িতে এসো।

মধুর স্মৃতিগুলো কোথায় যেন গোপ্তা খেয়ে পড়ে রয়ে গেল মৃতপ্রায় হয়ে। কালী নন্দী, রহিমগাজি সব এলোমেলো করে দিয়ে গেল।

অস্থির আবির। সে যেন কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না এই সব ঔদ্ধত্য। তার মনে হচ্ছে এর তীব্র প্রতিবাদ করা উচিত। ছেঁটে ফেলা উচিত এই সব সদস্যদের যাদের জন্য মানুষের বিশ্বাস, শ্রদ্ধা হারিয়ে যাচ্ছে।

আবিরের মনে হয়েছে এরা সব অতিবিপ্লবী। এদেরকে কেউ নির্দেশ দেয়নি। মানুষকে সন্ত্রস্ত করে রাখার জন্য। এরা যখন এইসব করে কেউ আটকানোর চেষ্টা করেনি, কিন্তু কেন?



হাঁটছে আবির। পকেট থেকে বের করছে এক একটি বঁইচি। তার মাথার উপরে

চক্কর মারছে কয়েকটা ফিঙে পাখি। তাদের আনন্দ তাদের ডানায় ডানায়। তারা তাদের ডানায় মাখছে মিষ্টি রোদ্দুর। তাদের মনের কথা উপচে দিচ্ছে কিচিরমিচির ভাষায়। গোপ্তা খাচ্ছে, নামছে নীচে, মাটির কাছাকাছি। বোধহয় চুমু খাচ্ছে মাটির বুকে, যেমন প্রেমিক খায়। আবার উঠে যাচ্ছে মাটি থেকে দূরে, ওপরে।

হাঁটছে আবির, হাঁটায় গতিমন্থরতা। মনে হাজার প্রশ্ন। এদের মতো মানুষের মনে আনন্দ নেই কেন? ওদের ডানার মতো কেন রোদ্দুর মাখতে চায় না মন, চায় না আলোকিত হতে কেন রক্ত মাখতে চায় হাতে! কেন অফুরন্ত শান্তি নিয়ে ভিন্ন রঙের ছাতার তলায় থেকেও এক শামিয়ানার নীচে থাকতে দ্বিধাগস্ত হয়, যেখানে মনের স্বাধীনতা আছে, আছে সবকিছুর ওপরে অন্য এক জীবনের স্বাদ।

স্লোগান হওয়া উচিত ছিল সবধর্ম, সম্প্রদায়, রাজনৈতিক ইত্যাদির ভেদাভেদ ভুলে আমরা মানুষ, মানবজাতি এই হোক আমাদের পরিচয়, অথচ হল না।

কারণটা কি? তাহলে কি ওই তিনটি অক্ষর "আমিই" লুকিয়ে আছে শ্রেষ্ঠত্বের কেন্দ্রস্থলে। আমিই একমাত্র—এটাই কি স্লোগান। তা যদি হয় আজ যা ঘটছে ইরাকে, আফগানিস্তানে, ইজরায়েল, লেবানন, পাকিস্তান, ভারত এবং তার অঙ্গরাজ্যে তার থেকেও ভয়াবহ দিন অপেক্ষা করে আছে। যেখানে থাকবে শুধুমাত্র চাপ চাপ রক্ত আর মানুষের লাশ। যারা সংঘটিত করল তাদের উল্লাস।

দলছুট অনুকুলদা, বর্ত্তমানে সর্বভারতীয় একটা দলের সদস্য। যারা বলে আমরা স্বাধীনতা এনেছিলাম। যাদের ইতিহাস আজও পাঠ্যবিষয়।

জিজ্ঞাসা করেছিল অনুকুলদা, ঠিক ভোটের আগে; যখন অনুকুলদার উপরে ভীষণ চাপ সৃষ্টি করেছিল, আবির সেলিমের ভাষায় অতিবিপ্লবীরা—আচ্ছা অনুকুলদা আপনি ওখানে গিয়ে ভালো আছেন?

না ভাই। যা দেখছি, দলটা একবারে জাহান্নামে গেছে। কোনো নির্দিষ্ট নীতি নেই। ওরা যেন দিন দিন স্বর্ণলতা হয়ে যাচ্ছে।

স্বর্ণলতা।

নামটা ভীষণ সুন্দর তাই না আবির। কংগ্রেস। একটা কথা জানো তো—তালপুকুর নাম, তালগাছ নেই, ঘটিও ডোবে না। আসলে গোড়া নেই, আগা আছে এগিয়ে চলেছে নির্ভরতা পাওয়ার জন্য।

হেসেছিল আবির, বলেছিল—কথাটা মন্দ বলেননি অনুকুলদা। সত্যিই ওরা স্বর্ণলতা, কেন্দ্রের ক্ষেত্রে অন্তত তাই প্রমাণিত হচ্ছে। আর রাজ্যে ....

ওখানে কোন ডালপালা নেই, তাই বিস্তার লাভের পথও নেই।

আপনি ফিরে আসুন না, যেখানে ছিলেন। আপনাদেরকে ভীষণ দরকার।

ভাবিনি এখনও। তা ছাড়া এখন আমি ওখান থেকেও সরে এসেছি, তৃণমূলে যোগ দিয়েছি।

ওরা তো যাকে বলে আরও ছন্নছাড়া, অস্থিরমতির একটি শহুরে দল। শুধুই চিতকার করছে "এবার নয় নেভার"।

কথাটা ভুল নয়, আসলে ওদের ভিতটা এখনও কাঁচা। তবে ওরা পারবে।

ভিত কাঁচা, ভিত নেই ইত্যাদি অনেক কথা অনেকেই বলে ওই দলটা সম্বন্ধে। কিন্তু সবাই বিশ্বাস করে ওদের একটা আবেগ আছে। আছে জনসম্মোহনী রূপ, কিন্তু তারপর। ...... কংগ্রেসকে ঘৃণা করে অনেকেই, এমনকী আজও যারা মনে করে ওরা ভারতের স্বাধীনতা এনেছিল। কিন্তু এদেরকে ...

ভাবতে অবাক লাগে, দলটার কালে কালে হলটা কি।

তা হলে কি নজরুলের কথাই সত্যি, "আজ যে রাজা কাল সে ফকির"।

সত্যিই তাই। ওই দলটা ভেঙে টুকরো হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে বাংলায়। কিছুদিন পরে হয়তো গৃহহীন হয়ে যাবে।

হাঁটছে আবির কালী নদীর পথ ধরে। পকেট থেকে বের করছে এক একটি বঁইচি, চিবুচ্ছে তো চিবুচ্ছেই।

কয়েকটা উলঙ্গ ছেলে নদীর জল আর বালি মাখছে মনের আনন্দে। ওদের মনগুলো কত সুন্দর! ফুলের মতো, বঁইচির মতো ওদের মনে রাজনীতির রং নেই। হয়তো একদিন রং মাখবে। তারাও একদিন আবির হবে, সেলিম হবে, অনুকুলবাবু হবে, নজরুল, বসন্ত, জিৎ হবে। একদিন তারাও তাদের বিদগ্ধ মন নিয়ে নদীর পার দিয়ে যেতে যেতে নদীটাকে দেখে স্মৃতি রোমন্থনে ভারাক্রান্ত হবে, অথবা পুলকিত হবে। এখন তারা তাদের শৈশবে নিষ্পাপ। উত্তাল বর্ষার কালী নদীর মতো। বইচির ফুলে ফুলে মৌমাছির মতো। বঁইচির ডালে ডালে ফুলের মতো।

মাথার উপরে সূর্যটা একটু কাত হল পশ্চিমের দিকে। যেমন মাঝলাইনে দাঁড়িয়ে থাকা ফুটবলটা কারও পায়ের টোকায় সরে যায় পূর্ব থেকে পশ্চিমে। সেই হেলে যাওয়া সূর্যের আলোয় পূর্বদিকে হেলে যাওয়া নিজের ছায়াকে টানতে টানতে আবির পৌঁছে গেল সেলিমের বাড়ির দরজায়।

ডাক দিল আবির—সেলিম, বাড়িতে আছিস।

ভিতর থেকে সাবিনা সাড়া দিল—কে?

আমি আবির।

ওঃ আসছি।

বোধহয় ওরা খেতে বসেছিল। মুখে জল নিয়ে কুলি করার শব্দ অন্তত সে কথাই জানান দিচ্ছে।

দরজা খুলেই সাবিনা বলে—আসুন, আসুন। কদিন ধরে ওকে বলছিলাম, নয়নাদি, আবিরদার সাথে অনেক দিন দেখা হয়নি, চলো না একবার ঘুরে আসি।

তাহলে গেলে না কেন?

যেতাম তো, আজ কালের মধ্যেই। ভালোই হল, আপনি চলে এসেছেন।

আমি তো হঠাৎ এসে গেলাম।

সে তো দেখছি।

পায়ে পায়ে বারান্দায় উঠেছে আবির। সাবিনার আধখাওয়া ভাতের থালা তখনও পড়ে আছে। সেলিম বাথরুমে।

বলে আবির,—অসময়ে চলে এলাম, নাও, তুমি খেয়ে নাও।

সেলিম নিশ্চয় বাথরুমে?

হ্যাঁ

বেরিয়ে এসেছে সেলিম, বাথরুম থেকে। এসেই বলে—জানিস আবির একেই বোধহয় মনোপ্যাথি বলে।

কেন?

আমি ভাবছিলাম, তুই আসবি। আর তুই এলি।

ওঃ ভ্রমর বলল, ফুল তুমি ফুটবে! তাই ফুল ফুটল।

হেসে উঠল তিনজনেই। তিনজনেই বলে উঠল—ভ্রমর বলল ফুল তুমি ফুটবে!

সত্যি সেলিম, ভীষণ ভাবতে ভালো লাগছে, তোর আমার, নয়না সাবিনার মধ্যে এতখানি প্রগাঢ়তা আজও রয়ে গেছে। জানি না কতদিন থাকবে।

একটা দীর্ঘশ্বাস শেষে একটা নীরবতা যেন সেলিমের ঘরটাতে ভর করল কোথা থেকে এসে।

সেই নীরবতাকে যেন টুকরো টুকরো করে ভেঙে দিল সাবিনার একটি শব্দ—থাকবে!

যেন একটা ভাদ্রের মেঘ, গুমোট করে রেখেছিল গোকুলপুর গ্রামের আবহাওয়াকে। সরে গেল মেঘটা। এক ঝলক রোদ্দুর আর এক নম্র বাতাস এসে জুড়িয়ে দিল গাঁয়ের মানুষের হৃদয়কে।

আবির বলে—এই সেলিম আয় না, আমরা একবার ঘুরে আসি আমাদের সেই ছোট্ট বেলায় বঁইচি তলায়, বঁইচির মালা আমাদের গলায়।

তোর মনে আছে!

দাঁড়া দেখাচ্ছি, তোরা দুজনেই চোখ বন্ধ কর।

কেন?

যা বলছি শোন।

এই সাবিনা, আবির বোধহয় ম্যাজিক দেখাবে, নাও চোখ বন্ধ করো।

হাসছে সাবিনা, স্বাতী নক্ষত্রের মতো। মন ভরে দেখছে আবির, তার অভ্যেস মতো।

চোখ বন্ধ করল সাবিনা সেলিম। আবির তার বাম পকেট থেকে বঁইচি বের করে বলল—এবার তোরা হাত পাত।

আবার হাত পাততে হবে?

পাততে হবে না, তা না-হলে তোর ছোটোবেলা যে আসবে না।

বেশ, পাতলাম, সাবিনা তুমিও হাত পাত।

আবির বলছে ছোটোবেলা ধরা দেবে হাতে। আবির বলছে। অন্য কেউ নয়, সুতরাং যা বলছে তাই করছে ওরা দুজন।

বঁইচিগুলো দুজনের হাতে দিল আবির। রৌদ্রের তাপ নিয়ে এবং পকেটে থেকে কিছুটা তাপ সংগ্রহ করেছে বঁইচিগুলো। একটু তাপ তো লাগবেই।

হাতে বঁইচিগুলো পেয়ে সাবিনা বলে—কি দিলেন। এযে বেশ গরম দেখছি?

এবার চোখ খোলো, দেখবে ছোটোবেলা তোমাদের হাতে এসেছে। মনে এসেছে তার অজস্র স্মৃতি।

চোখ খুলে অবাক হয়ে গেল সাবিনা, সেলিম—কিরে এযে বঁইচি। কোথা থেকে আনলি?

যেখানে আমরা ছোটোবেলাকে সযত্নে রেখে এসেছিলাম।

কালীনদীর পারে? যেখানে জাম, হিজল, পারকুল, শেঁকুল গাছগুলো ছিল।

অনেক কিছুই নেই, কিন্তু এগুলো আছে।

সেই তালগাছটাও নেই যেটাতে উঠে নদীর জলে ঝাঁপ দেওয়া, বার বার।

তোর সব মনে আসছে নারে!

রহমত!

সেও আসছে তাই না!

দুজনে যেন পটুয়া। একটা একটা পট খুলছে। সেখানে আঁকা আছে ছবি। সেই ছবি দেখে বর্ণনা দিচ্ছে, কখনও আবির, কখনও সেলিম, দর্শক সাবিনা।

অনেক কিছুই সাবিনাকে বলেছে সেলিম। সে তো তার যৌবনের, মধ্যবয়সের। বলেনি ছোটোবেলার কথা। শুনছে সাবিনা। তার মুখের টুকরো টুকরো হাসিগুলো পটুয়াদের বর্ণনার সাথে তাল রেখে চলেছে, সুরের সাথে বাঁয়াতবলার মতো। বেরিয়ে আসছে পুরোনো দিনের অজস্র সুর, সব নতুন করে। সরে যাচ্ছে বর্তমান, অস্থির বর্তমান, এলোমেলো বর্তমান, যেমন সরে গেছে "চোলিকা পিছে চুনরিকা নীচে", রবীন্দ্রসঙ্গীতের আদি সুরমুর্চ্ছনায়। মান্না দে, হেমন্ত, মানবেন্দ্রের পুরোনো আধুনিক রাগাশ্রয়ী গানের মন কেমন করা সুরে।

একসময় শেষ হল পটুয়াদের বর্ণনা। তারপর যেমন অবাক হয়ে যায় শ্রোতারা, মন্ত্রমুগ্ধের মতো, অথবা সম্মোহিত হয়ে যায় বর্ণনার সৌন্দর্যে। পালন করে নীরবতা। তারপর শুরু হয় পর্যালোচনা, পটুয়ারা তখন খোঁজে তাদের পারিশ্রমিক।

আবির বলে আরে একটু চা খাওয়াও।

তখনও মন্ত্রমুগ্ধ সাবিনা। তখনও তার চোখের তারায় ওদের ছোট্টবেলা। আরও জানার ইচ্ছা।

শেষ হয়ে গেল।

সব শেষ হয়ে গেছে সাবিনা।

এত তাড়াতাড়ি।

কোথায় তাড়াতাড়ি, এখন কটা বাজে বলো তো?

কটা আর বাজবে, বড়োজোর দেড়টা।

ঘড়িটা দেখেছো?

ঘড়ি পরে আসেনি আবির। কখনও পরে না, এটা তার একধরনের স্টাইল। তাই

হয়তো সঠিক বলতে পারেনি। কিন্তু সে আন্দাজ করতে পারে, এখন প্রায় চারটে বাজছে।

সাবিনা ঘরে ঢুকে দেওয়াল ঘড়ি দেখে এসে বলে চারটে দশ। —সত্যি একদম বুঝতে পারিনি।

আর বুঝতে হবে না, এখনও অনেক দুয়ারে যেতে হবে, দয়া করে আমাদের পাওনাটা দিয়ে দাও। কি সেলিম ঠিক বলছি তো?

ঠিক তো বটেই, তবে একটা তোর ভুল হয়ে গেছে।

কিরে!

পাওনা-টাওনা বলা উচিত ছিল।

সাবিনা বলে—এবার বুঝেছি। চা-এর সাথে টা।

চলে গেল সাবিনা। হরিণীর মতো ত্রস্ত পায়ে। তার পায়ের নূপুর সুর তুলছে রিনিঝিনি, রিনিঝিনি। তার চুলে মাখা তেলের গন্ধ ছড়িয়ে যাচ্ছে বাতাসে।

আবির জিজ্ঞাসা করে—কিরে সেলিম, কদিন থাকবি?

দেখি।

এভাবে দায়সারা উত্তর দিলি যে?

কি বলব?

জিজ্ঞাসা করছি কদিন আমি বিরহ যন্ত্রণা নিয়ে একা একা কাটাব!

তা ধর একমাস।

একমাস!

হ্যাঁরে, এখানে খুব হাঁপিয়ে উঠেছি। যাই, কিছুদিন থেকে নিজেকে কিছুটা যাকে বলে ফ্রেশ করে নিয়ে আসি।

হঠাৎ বদলে গেল আবির। সে যেন এখন রাজনীতিবিদ আবার। সেই গাম্ভীর্য, সেই হিসেবি কথা।

ধর তোকে যদি আবার ফিরিয়ে আনা হয়।

নারে, বেশ আছি, তা ছাড়া ওরা চাইবে না।

যদি জেলা নেতৃত্বকে সব বলি।

নারে, কিচ্ছু লাভ নেই। ধৃতরাষ্ট্রকে লাল শালু, নীল কার্পেট, হলুদ পর্দা দেখালে কি সে দেখতে পাবে?

সাবিনা ফিরে এল পটুয়াদের চা-টা নিয়ে। কিন্তু কাদের দেখছে সে! একটা ঝড় এসে এলোমেলো করে রেখে যাওয়া খড়ের চাল বাড়ি নয়তো!

ঠিক এভাবেই সেলিমকে দেখেছিল সাবিনা। বহিষ্কৃত হওয়ার পরে কয়েকমাস। বারান্দায় চেয়ারটাতে বসে মার্কসের দাস ক্যাপিটালের পাতা খুলে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে। বইটার পাতাগুলো বাতাসে উড়ত পতপত, পতপত করে। দেখেছিল একটা মিছিল। কয়েকজন মাত্র লোক। তারা সাবিনার অচেনা। বোধহয় ভিনগাঁয়ের, তাদের বাড়ির পাশ দিয়ে গিয়ে ফিরে আসতে। তাদের ভাষা কুৎসিত, সেলিমের বিরুদ্ধে। ভীষণ ভয় করছিল সাবিনার, ভয়ে ফোন করেছিল আবিরকে।

আবির বলেছিল ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমি দেখছি, তুমি সেলিমকে বলো, সে যেন উত্তেজিত হয়ে না যায়।

সেদিন সেলিম ভীষণ একা বোধ করছিল। সমস্ত রাত্রি ঘুমোতে পারেনি, একটা যন্ত্রণা তাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল।

আজ যেন সেই সেলিমকেই দেখল সাবিনা। ভীষণ একা। একটা যন্ত্রণার চিহ্ন তার চোখে—তার মুখে।

সাবিনার উপস্থিতি বোধ হয় কেউ লক্ষ্য করেনি। দুজনেই তাকিয়ে আছে প্রাচীরের ওপারে চাঁপাগাছটার দিকে। তার পাতাগুলো ভীষণ রকমের সবুজ। পাতার ফাঁকে ফাঁকে ফুলগুলো তাদের দল মেলে ধরে বিকেলের রৌদ্রের মৌতাত মাখছে।

সাবিনাই বলল—কি গো, তোমরা চা খাবে বললে, আমি চা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, খেয়াল নেই? কি হয়েছে তোমাদের?

অন্ধকার রাত্রি, তার উপর লোডশেডিং। তখন হঠাৎ যদি বিদ্যুৎ এসে যায়, হঠাৎ আলোয় খান খান করে ছিঁড়ে দেয় অন্ধকারের শামিয়ানাকে, তখন যেমন হয় ঠিক তেমনই হল আবির, সেলিমের। তাদের উদাসীনতা ছিঁড়ে গেল হঠাৎ। তারা তাকাল সাবিনার দিকে। তার হাতে ধরা ডিশে সাজানো নিজের হাতে তৈরি পাঁপড়, তিনকাপ চা।

আবিরই বলল—আরে তুমি এসে গেছ, আগে বলবে তো?

সাবিনা যেন শুনতে পায়নি কথাক-টি অথবা শুনেও না শোনার অছিলায় বলে—কি ব্যাপারে বলুন তো, আপনারা যেন নিজেদের মধ্যে নেই।

না, না, ঠিক আছি তো, আসলে তুমি আসছ না দেখে তোমাকে কল্পনা করছিলাম। ওই যে চাঁপাগাছটা দেখছ, দেখছ ফুলগুলো, ওদের মধ্যে তোমাকে খোঁজার চেষ্টা করছিলাম।

সেলিমের দিকে তাকিয়ে বলে—কিরে সেলিম, কল্পনা করিনি?

হাসল সাবিনা, ওদের কিছু একটা লুকোনো দেখে। যেন একগুচ্ছ শ্বেতকাঞ্চন ফুটল সাবিনার মুখে। লক্ষ্য করল সাবিনা—আবির তার দিকে তাকিয়ে আছে। আবিরও চেষ্টা করল চোখ ফেরানোর, কিন্তু পারল না।

সেলিমও দেখল আবিরকে—কিরে, সব যে শেষ করে দিলি, আমার জন্য কিছুটা রাখ।

হেসে উঠল তিনজনেই। সে হাসিতে বলে দিল এই একটু আগে কিছুই ভাবেনি তারা।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধে নামল। তাড়াতাড়ি ফিরবে এমনই বলে এসেছিল আবির, অথচ তৃতীয়ার চাঁদ উঠল, সাবিনার ভ্রূ জোড়ার মতো, সেলিমের বারন্দায় জ্বলছে বালব। তার সাথে হালকা মিষ্টি বাতাস। সে বাতাস বয়ে নিয়ে আসছে চাঁপার ঘ্রাণ। কেমন আনমনা করা পরিবেশ। অথচ এই পরিবেশ ছেড়ে উঠতে হবে আবিরকে। ওঠার আগে সেলিমকে বলল—জানিস রহিম গাজি আর কালী নন্দীর সাথে দেখা হয়েছিল আসার পথে, ওরা বলছিল ....

জানি রে, সব শুনেছি।

আমাদের বোধহয় আর কিছু করার নেই, তাই না সেলিম?

জানিনা রে।

উঠে পড়ল আবির, দেখে নিল ডান পকেটটা, এখনও অনেকগুলো বঁইচি আছে পকেটে।

সেলিমের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আবির পথ ধরল কালী নদীর। বাতাস বইছে শন্‌শন্‌, সেই বাতাসের সাহচর্যে বোধহয় শীত করছে কালী নদীর পারের গাছের পাতাগুলোর। তারা শব্দ তুলছে শিরশির, শিরশির।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল আজ মিটিং ডাকা আছে। দ্রুত বাড়ি ফিরে দেখল নয়না বসে আছে বারান্দায়, কি যেন পড়ছে নয়না।

কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল—কি পড়ছ?

তোমার একটা কবিতার ডায়েরির কয়েকটা কবিতা।

দেখো, তোমার জন্য কি এনেছি।

দেখতে হবে না, যা এনেছ সেটা তো আমার জন্যই, সেটা দাও।

নয়নার হাতে ডান পকেট থেকে বঁইচি বের করে দিল আবির।

তুমি আমার জন্য বঁইচি এনেছ! ভীষণ ভালো খেতে। কিন্তু সেই ছোট্টবেলার পর থেকে একদিনও খাইনি।

আজ খাও।

জানো আবির, এগুলো আমার খুব প্রিয় ছিল।

তা হলে মনোপ্যাথিটা জানি বলো?

তৃতীয়ার চাঁদ ডুবে গেছে একটু আগে। নেমে আসল অন্ধকার। লোডশেডিং হল এইমাত্র। টর্চ জ্বালাল নয়না। টর্চের আলোটা যেন অন্ধকারকে ফুঁড়ে চলে গেল অনেক দূরে। তারপর আলোটা হারিয়ে গেল কোথাও।



নয়না খোঁচা হজম করতে পারে না কোনোদিন। তার এই অসহিষ্ণুতার সুযোগ নেয় আবির, আবির তখন সম্রাট নিরো হয়ে যায়।

মন্ত্রীসভা যেদিন গঠন হল সেদিন আনন্দের যেন সীমা নেই নয়নার। নয়না, আবির টিভির পর্দায় দেখছে বিজয়ীর বাঁধভাঙা উল্লাস। কিন্তু এরা কারা। দেখে মনে হচ্ছে যেন মুক্ত বাতাসে স্নানের সুখ ভোগে তৃপ্ত। এলিয়ে দিয়েছে তাদের শরীর বটগাছের তলায়। অথচ আর একটা দল, তাদের নেত্রী চরম হতাশায় তাকিয়ে আছে। মাথা তার নীচু। চোখ ভূমি অনুসারী। মনে হচ্ছে কেউ বা কারা যেন লক্ষ লক্ষ দুঃখ ওদের মনের মধ্যে ঢেলে দিয়ে চলে গেছে।

দেখাচ্ছে শিল্পপতিদের, পুঁজিপতি, পুলিশকুলকে। আর তাদের বিবৃতি। তাদের শরীরে মনে অফুরন্ত সুখ, সুযোগ এসেছে, নিশ্চিন্তে আরও পাঁচটি বছর।

বলেছিল আবির—যা ভেঙে পড়েছিলে!

সত্যি। তবে এটা ঠিক আমরা মানুষের পাশে আছি, মানুষ তার মর্যাদা দিয়েছে।

তা অবশ্য ঠিক। তা ওই যে দেখছ, যারা তাদের অমূল্য মতামত জানাচ্ছে তাদের পাশেও আছো তো?

দ্যাখো, দিন বদলাচ্ছে। বদলাচ্ছে পৃথিবীর অনেক পুরোনো নিয়ম। সমাজের বস্তাপচা ধ্যানধারণা। কেউ যদি মনে করে ভারতীয় ফুটবলের মতো পিছোতে পিছোতে চলে যাবে পিছনের সারিতে, তারা ভুল করছে।

তা তোমরা এবার কি ভাবছ?

কি ব্যাপার বলো তো? তুমি কি তারা নিউজের সাংবাদিক, নাকি বর্তমান কাগজের?

তা কেন। তবে যাই বলো নয়না, ওই স্লোগানটা আমার ভালো লাগেনি।

বাঃ বেশ বললে তো! তোমরাই তৈরি করলে ....

তা অবশ্য ঠিক।

আচ্ছা আবির, তোমার কি হয়েছে বলো তো?

কই, কিছু হয়নি তো। তা ছাড়া তোমার বাবাও তো এই ধরনের অনেক কিছু বলেন। তা হলে তিনি কি তোমার ওই .....

একটা কথা জেনে নাও। উন্নয়ন যেখানে শেষ কথা সেখানে হাতটা কার বাছবিচারের কোনো প্রয়োজন নেই। যদিও জানি, তোমার মতো মানুষরা সেই পুরাতন প্রথাকেই আঁকড়ে ধরে অলীক স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকবে চিরকাল।

হয়তো তাই। হয়তোই বা বলি কি করে। আসলে কি জানো, এতদিন জেনে এসেছি মার্কসবাদ বৈজ্ঞানিক এবং চিরন্তন সত্য। জেনে এসেছি কারা শ্রেণিশত্রু। লড়াই করে এসেছি ওদের বিরুদ্ধে। তোমার মনে নেই নয়না, আমাদের স্লোগান ছিল পুঁজিবাদ নিপাত যাক। টাটা-বিড়লা জেনে রেখো ....।

আমরা সংসদীয় গণতন্ত্রের উপরে দাঁড়িয়ে আছি আবির।

হয়তো। তা বলে সবকিছু বিসর্জন। এটা মানা যায় কিভাবে?

তুমি নিজেকে সাবধান করো আবির, তা না হলে .....

জানি, সেলিম হয়ে যেতে হবে। আবার এটাও জানি এভাবে শ্রেণি সংগ্রাম হয় না, হবে না। আমরা শ্রেণিশত্রু হয়ে যাব যে-কোনও সময়।

ছাড়ো তো, সব বিরোধী মার্কা কথা।

জানো নয়না—তখন আমার, সেলিমের স্কুল ছাত্রজীবন। আমাদের প্রিয় মাস্টারমশাই, সোমেশ রায়বাবু। ছুটির ঘণ্টা পড়ার পর বললেন—আবির, সেলিম, সঞ্জীব তোমরা একবার বোর্ডিং-এ এসো তো।

স্যারের কথা মতো খেলতে না গিয়ে বোর্ডিং-এ গেলাম। কিছুক্ষণ পরে স্যার পান চিবুতে চিবুতে ঢুকলেন ঘরের মধ্যে। বসলেন সঞ্জীবের খাটে। কোনো ভূমিকা না করেই বললেন সমাজ এখন সংকটের মধ্যে দিয়ে চলেছে। সংকট তৈরি করছে

এক একদিন এক একটি বিষয়। এইভাবে প্রায় প্রতিদিন আমরা যেন গোগ্রাসে গিলতে শুরু করলাম। রক্তে ধরল আফিং-এর নেশা। কেমন যেন পাগলামিতে পেয়ে বসল আমাদের।

জানো নয়না, আমাদের গোপন আলোচনাটা আর গোপন থাকল না। হাসাহাসি করল অনেকে। তারা বলত—হাতি-ঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল। নকশালরা পারেনি, এরা বলছে সব কেড়ে নেবে। বিলিয়ে দেবে সর্বহারাদের মধ্যে। কেউ কেউ অবশ্য আমাদের ভূমিকাকে সমর্থন করত।

আমরা সোমেশ স্যারের সাথে মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল শহরে গেছ্‌লাম একটা জনসভায়। সে জনসভার প্রধান বক্তা ছিলেন জ্যোতি বসু। যখন পৌঁছেলাম, তখন বিকেল। দেশে চলছে জরুরি অবস্থা। সবকিছুকে উপেক্ষা করে মানুষ আসছিল দলে দলে, অথচ তারা জানত, যে-কোন বিপদ আসতে পারে।

এমনই হয় আবির, মানুষ যখন পিছোতে পিছোতে দেওয়ালের কাছে আসে। পিঠ ঠেকে যায় দেওয়ালে, তখন চেষ্টা করে সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে এবং এটাই হল জীবনের ধর্ম।

তাকাল আবির নয়নার দিকে। যেন বলতে চাইল সে, এর থেকে আক্রমণকারী এবং আক্রান্ত দুজনেই শিক্ষা নেওয়া উচিত। যদি না নেয় আক্রান্তরা যেমন ধ্বংস হয়ে যায় এবং প্রমাণিত হয় মানুষ বোধহীন জড়পদার্থ ছাড়া আর কিছুই নয়, আক্রমণকারীরাও সারাজীবনের মতো হারিয়ে ফেলে তাদের পা রাখার জায়গা।

নয়না দেখছে, আবির যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। হয়তো কিছু ভাবছে সে, কিংবা বিশ্লেষণ করছে নয়নার বলা কথাগুলি।

তার অন্যমনস্ক মনটাকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনার জন্য জিজ্ঞাসা করল নয়না —তারপর কি হল?

কি যেন বলছিলাম।

আবির। আমি বুঝতে পারছি তুমি বার বার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছ।

কই না তো।

তা হলে?

চেষ্টা করছিলাম, সঠিক ঘটনাটা সঠিক করে মনে আনতে।

নিশ্চয় এসেছে, তা হলে শুরু করো।

জানো নয়না, দেখলাম লাল কাপড়ে সাজানো হয়েছে মঞ্চ। বেশ উঁচু মঞ্চটা। সেখানে বক্তব্য রাখছেন জননেতা। বিকেলের মিষ্টি রোদ্দুর মাখতে মাখতে শুনছিল অজস্র শ্রোতা। সঙ্গে ছিল মন কেমন করা মৃদু বাতাস। হঠাৎ কি হল কে জানে, থেমে গেল বাতাসটা। বিকেলের রোদ্দুর ঢাকা পড়ল কালো কালো মেঘে। ঝড় উঠল, লাল ঝড়, সব কালোকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার।

মঞ্চেও, তিনি চিতকার করে বললেন—আমার সাথিরা তাকিয়ে দেখুন, একটা ঝড় উঠেছে। ঝড়টা আছড়ে পড়বে অত্যাচারীর সাধের ইমারত। যার প্রতিটি ইট, বালিতে আপনাদের রক্ত লেগে আছে। ভেঙে চুরমার করে দেবে সবকিছু। এই ঝড় বুকে নিয়ে আপনারা দৃঢ় পায়ে এগিয়ে চলুন। জয় আপনাদের সুনিশ্চিত।

তাঁর কথা মিলে গেল অক্ষরে অক্ষরে। এল সাতাত্তর সাল। তাঁর সৃষ্ট ঝড় উড়িয়ে দিল তৎকালীন সম্রাটের সাধের মহল। জয় হল সর্বহারাদের। বীজ বপন হল সমাজতন্ত্র নামক গাছের।

ওই সময় আমরা ভর্তি হলাম কলেজে। গিয়ে দেখলাম অন্য উন্মাদনায় টগবগে ছাত্র সমাজকে। সেবারই কলেজে প্রথমবার জিতল বামপন্থী ছাত্র সংগঠন। যার নেতৃত্বে ছিল নীরজদা, ফরিদ, সেলিম, আমি।

ওরা এখন কোথায়?

জানো নয়না, ফরিদ ছিল সাধারণ নিম্নমধ্যবিত্ত বাড়ির ছেলে। তার সখ ছিল ফোটোগ্রাফার হওয়ার। হয়েও ছিল। কলেজ জীবন শেষ করে ফিরে গেল তার এলাকায়। একটা দোকান খুলল, ফোটোগ্রাফির দোকান। নাম দিল "কায়া"। জড়িয়ে পড়ল এলাকার রাজনীতির সাথে। ওই "কায়া"তেই পরিচয় এবং প্রেম হল জুবেদার সাথে, তারপর পরিণয়।

নীরজদা ফিরে গিয়ে বসল তার বাবার মুদি দোকানে, সঙ্গে রাজনীতি।

ওরা ব্যাক্তিস্বার্থকে প্রাধান্য দেয়নি। কারণ ওরা দেখেছিল এক নতুন সূর্যের উদয়। তৎকালীন সরকারের গ্রহণ থেকে বেরিয়ে আসা।

সূর্যের খন্ড গ্রহণ হয়েছিল বলো?

ঠিক বলেছ। 'খন্ড গ্রহণ'।

আবির চুপ করে গেল, তাকাল নয়নার দিকে। তার বলা কথাটা যেন তাকে অবাক করল। কত সুন্দর কথা, যা সূর্যকে পুরোপুরি গ্রাস করে না। যে সূর্যের অনাগ্রাসিত অংশ চেষ্টা করে গ্রহণমুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসতে। আলোকিত করতে পৃথিবীকে। পৃথিবীর অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশকে।

জিজ্ঞাসা করল নয়না—কি হল থেমে গেলে যে! ফরিদ, নীরজদার কি হল?

বলব নয়না, আজ সবকিছু বলব, তোমার জানা দরকার, সাবধান হওয়া দরকার, এখন শুধু ভাবছি ...

কী?

তুমি এত সুন্দর কথাটা কোথায় পেলে।

হাসল নয়না গ্রহণ মুক্ত সূর্যের মতোই। যে হাসি আলোকিত করছিল আবিরের আঁধার অংশগুলোকে।

জিজ্ঞাসা করল আবির—আচ্ছা নয়না, সূর্যে আবার গ্রহণ লাগছে না তো?

হঠাৎ এই প্রশ্নটা করলে কেন?

জানি না, আমার মনে হল তাই বললাম।

যদি লাগেও, সে গ্রহণ থেকে সূর্যকে মুক্ত করার দায়িত্ব তো তোমার আমার, ফরিদ, নীরজদা, সেলিম এদের তাই না আবির।

জানো নয়না, ফরিদ, নীরজদা হারিয়ে গেছে, ওরা আর আসবে না কোনোদিন।

কেন?

একটা যুদ্ধ ....

একটা যুদ্ধ!

হ্যাঁ, কায়েমি স্বার্থের সাথে একটি নিঃস্বার্থ মানুষের যুদ্ধ।

বুঝলাম না।

আজ যা দেখছ, সবাই ভয় পাচ্ছে। মাটি হারানোর ভয়। তেমনই ভয় পেয়েছিল পূর্বতন কায়েমি স্বার্থ। তারা চেষ্টা করল হারানো মাটি ফিরে পেতে। ভয় দেখাল। কাজ হল না। শুরু করল লড়াই। চোরা গোপ্তা লড়াই। বুঝতে পারেনি ফরিদ, যে সেই ওদের লক্ষবস্তু। যে ফরিদের পাশে এলাকার প্রায় সমস্ত মানুষ। ওরা বুঝেছিল ফরিদ শেষ হলে মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবে। তখন নতুন কলেবর নিয়ে হাজির

হবে ওরা। একদিন রাত্রে 'কায়া' বন্ধ করে, একটা সভা সেরে বাড়ি ফিরছিল নিশ্চিন্ত ফরিদ। জুবেদার জন্য কিনেছিল একটা শাড়ি, রক্তাক্ত হল সেই শাড়িটা। কিন্তু হাত থেকে পড়ে যায়নি। ওরা ওদের কাজ শেষ করে চলে গেল নিশ্চিন্ত হয়ে।

ইস!

ওখানে শেষ হলে তো একটা নতুন গল্প রচনা হত না নয়না।

মানে?

জুবেদা সেই গল্পের ট্র্যাজিক নারী।

কি হয়েছিল জুবেদার?



সন্তানসম্ভবা জুবেদা। প্রাথমিক ধাক্কা সামলে নতুন স্বপ্ন দেখল তার সন্তানকে নিয়ে। বুঝতে পারেনি গ্রহণ লাগে চাঁদ, সূর্য, নক্ষত্রেও। ওর সন্তান ইসমাইলকে বুকে নিয়ে অসহায়া হল একসময় ওই জুবেদা। ধরনা দিল সবার কাছে। সহানুভূতিও দেখাল সবাই। কিন্তু জল ছাড়া কি চিঁড়ে ভেজে। ভেজে না।

সালটা বিরানব্বই। উত্তাল ঢেউ সমুদ্রে, দিগ্‌দিশাহীন জুবেদা, ঢেউগুলো বলল তোমাকে চাই। তুমি সুন্দরী সৈকত।

পারেনি ওদের গ্রাস মুক্ত হতে। জুবেদা হারিয়ে গেল ঢেউয়ের ধাক্কায়। কেউ মনে রাখেনি ফরিদকে। ওই মৃত্যুদিনে শহিদ বেদিতে মাল্যদান আর এক মিনিট নীরবতা পালনের সময়টুকু ছাড়া।

জুবেদা কি নেই?

আছে। রাত্রির উদ্দাম, উত্তাল অভিসার সঙ্গিনী সৈকত হয়ে। দিনে সবার পায়ের চিহ্ন আর কুৎসা মেখে মেখে।

ইসমাইল।

জানি না, সে কোথায়। তবে শুনেছি, সে জুবেদার কাছে নেই।

জীবন বড় অদ্ভুত, তাই না আবির।

ঠিক বলা হল না নয়না, বলো জীবনের প্রতি আর এক জীবন ব্যবহারিক প্রশ্নে বড়ো অদ্ভুত, ভীষণ জটিলতাময়।

ভুল বলেনি আবির। জীবনকে প্রয়োজন আর এক জীবনের। জটিলতাহীন, সাবলীল। যখন দুজনেই সমান শক্তিশালী, যখন অস্তিত্বের সংকট থাকে না। হারানো এবং হারিয়ে পাওয়ার টানাপোড়েন থাকে না। থাকে না কারও প্রতি নির্ভরশীলতার লজ্জা অথবা স্বজন হারানো একাকিত্বের যন্ত্রণা। এর বিপরীতে আসে সংকট, ভয় হারানোর, হারিয়ে যাওয়ার।

জুবেদা একা, তার সেখানেই সংকট, সংকট মোচনের দল তখন ক্রিয়াশীল। অকারণ, অযাচিত। কেন?

মানুষের অন্যান্য ধর্মের মতো এটা একটা ধর্ম বলে। আসলে মানুষই মানুষের বলির পাঁঠা। যাকে বলি দেওয়ার আগে প্রামাণিক স্নান করায়, সিন্দুর দেয়। এক কথায় সাজিয়ে নেয় বলির উপযুক্ত করে। নৈবেদ্যর উপযুক্ত করে।

সে জুবেদা হতে পারে, সর্বহারা মানুষকে ভোটের প্রয়োজনে হতে পারে, শ্রমিককে তার সবকিছু নিংড়ে নেওয়ার আগে হতে পারে।

সবাই সবকিছু বোঝে। অথচ বোঝে না ভাব দেখায়। হয়তো সেই কারণেই জীবন একটা নাটক। আবার জীবন যন্ত্রণাময়।

কেন যে রবীন্দ্রনাথ বললেন—

“মরিতে চাহিনা আমি
এ সুন্দর ভুবনে
মানুষের মাঝে আমি
....

জানো নয়না, কুনালবাবু এই কবিতাটা নিয়ে বলেছিলেন—It is a cry of life in another meaning.

ঠিকই বলেছিলেন—সুন্দর, অসুন্দর, দেওয়া নেওয়া, ভালোবাসা প্রতিশোধ স্পৃহা, ঠকানো, কামানো, বিভ্রান্ত করা, সেখান থেকে সুবিধা আদায় করা, হয়তো এসবের জন্যই মানুষ মরতে চায় না, চায় বেঁচে থাকতে। ভোগ আর লিপ্সাকে ডান বামে রেখে।

কুনালবাবুর কথা শুনে মদনের দোকানে উপস্থিত সবাই প্রায় বাকরুদ্ধ হয়ে গেছল।

মদন বলেছিল—দারুণ কথা বলেছেন। সঙ্গে যুক্ত করে ছিল—জীবন যখন পর্যন্ত ত্যাগ করার অবস্থায় আসে না ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ মরতে চায় না।

রসিকতা করে রামবাবু বলেছিলেন—মদন তুই কেন যে দর্শনশাস্ত্রের প্রণেতা হলি না, তাই ভাবছি।

খ্যাঁকখ্যাঁক করে হেসেছিল মদন। যেমন সে মাঝে মাঝে হাসে।

জানো নয়না একদিন নীরজদাও হারিয়ে গেল। তাকে আর-এক অন্যায় যুদ্ধে হারিয়ে দিল ক্যানসার। আত্মহত্যা করল গলায় দড়ি দিয়ে।

তার স্ত্রী, ছেলে মেয়ে?

তার ছেলে ছিল না, একমাত্র মেয়েকে নিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল সুন্দরী, শীলা বউদি। বন্ধুত্বের হাত বাড়াল জিৎ রায়ের মতো বন্ধুরা। স্বপ্ন দেখাল তারা—একটা ইমারত। সামনে ফুলের বাগান। অজস্র ফুল, মৌমাছির গুঞ্জন, আরও, আরও। দুর্বল করে দিল ডানপিটে শীলাবউদিকে। তারপরেই সেই কালো গহ্বর। থিকথিক আঁধার, আর যন্ত্রণা।

সেও শেষ পর্যন্ত জুবেদা হয়ে গেল!

না, নয়না, জুবেদা হারিয়ে গেছল, শীলাবউদি হারিয়ে পাওয়ার পথ দেখল। কড়ায় গন্ডায় আদায় করল অনেক কিছু। কারও সাহস হয়নি তার দিকে আঙুল তোলার। কারণ কি জানো? সবারই আঙুল কেটে নেবার ভয় দেখিয়েছিল শীলাবউদি। এমনকী দু-একজনের এমন অবস্থা করেছিল—তারা নিজেদেরকে বাঁচানোর জন্য ....

নয়না অবাক হয়ে যাচ্ছিল অনেক অজানাকে জেনে। নয়নাতো চিরকাল সাদাকে সাদা দেখে এসেছে। খেয়াল করেনি সেই সাদাটা আসলে কৃত্রিম রঙের প্রলেপ। ভেতরে আছে কালো কালো দাগ, সাদা রংটাকে ধুয়ে দিলেই পরিষ্কার বোঝা যাবে। নয়না ধুয়ে দেখেনি। আবির, সেলিমরা দেখেছে। দেখেছে ওই সব বসন্ত, নজরুল, জিৎরা সাদা রং মেখে সবাইকে বিভ্রান্ত করে চলেছে প্রতিমুহূর্ত। যদিও জিৎ-এর মাত্রাতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা জনিত ঘর্ষণ বাইরের প্রলেপটাকে কিছুটা হলেও ফিকে করে দিয়েছে। উচ্চতম নেতৃত্বের নজরেও এসেছে। কিন্তু কোনো এক অজানা কারণে তারা এইমুহূর্তে কিছু বলছে না।

হেসে উঠল আবির। নয়নাকে আরও অবাক করে, অথচ আলোচ্য বিষয়টা ছিল ভীষণ গম্ভীর। ওখানে কোনো হাসির রসদ ছিল না।

হয়তো তাই নয়না জিজ্ঞাসা করল কি হল, হাসলে যে!

না এমনিই।

কিন্তু আমার মনে হচ্ছে ....।

কি মনে হচ্ছে।

তোমার হাসি কোনো কিছু একটা ইঙ্গিত করছে। আবির বলো না!

বলব?

হুঁ।

না বলব না, তোমাকে দেখাব।

নকল অভিমানে নয়না বলে—থাক, তোমাকে বলতে হবে না।

এই তো অভিমান হয়ে গেল। বেশ বাবা বলেছি। কেন হাসলাম জানো? জীবনে যে মানুষটা মদ কেমন জিনিস জানত না, সেই বসন্ত এখন স্কচ, হুইস্কি খাচ্ছে। আর চিরদিনের বিড়িখেকো নজরুল উইলস নেভি কাট ছাড়া নাকি তার চলে না! জিৎ-এর কথা না বলাই ভালো।

অথচ দ্যাখো সুবিমল চক্রবর্তী আজও বিড়ি খাচ্ছেন। সস্তা দামের স্যান্ডেল ছাড়া তাকে দামি জুতো পরতে দেখিনি। আর সেই বিখ্যাত ধুতি পাঞ্জাবি। বিনায়ক রায়ও বদলাতে পারেননি নিজেকে।

কারণ উনারা না জিৎ, না বসন্ত, না নজরুল।

ঠিকই বলেছ।

আচ্ছা নয়না, ওই সব বসন্তরা কবে বিদায় হবে বলতে পারো?

উত্তর দেয়নি নয়না, কারণ তার উত্তর জানা নেই। কারণ সে প্রতিদিন শুনছে ওরা নাকি দলের সম্পদ, ওদের হাত ধরেই নাকি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। ওদের জন্যই দল দীর্ঘস্থায়িত্ব পেয়েছে।

নয়নার মনের কোণায় কোণায় এক একটি ঝড় এসে জমা হচ্ছে। সব ঘূর্ণিঝড়, তারা একত্রিত হচ্ছে, কিন্তু গতিপথ বদলাচ্ছে না, বদলাচ্ছে না কারণ সে সুদর্শন সরখেলের মেয়ে। যার রক্তে বইছে এমন একটা দর্শন যার ভিত অনেক গভীর।

জিজ্ঞাসা করে নয়না—কেন এমন হয়? মাকর্সবাদ তো অন্য কথা বলে। আমরা তো জেনে আসছি ভোগ সর্বস্বতা, ব্যাভিচারিতা, ব্যাক্তিতান্ত্রিকতা. অত্যাচার, স্বেচ্ছাচারিতা শেষ করে দেয় দল ও সমাজকে। লক্ষ্যচ্যুত হয় লক্ষ্যবস্তু। বর্তমান প্রজন্ম কী এইসব পাঠ নেয়নি, নাকি ভুলে গেছে।

এখনও বলার সময় আসেনি নয়না।

কবে আসবে সে সময়?

অপেক্ষা করো! সে দিন উঁকি মারছে ভোরের আলোর মতো।



পোড় খাওয়া, অনেক যুদ্ধের নায়ক বিদগ্ধ মানুষটি উপলব্ধি করেছিলেন—শুধুমাত্র কৃষিতে কোন দেশ, কোনো রাজ্য, কোনো যৌথ সংসার সমৃদ্ধ হয় না। অর্থনৈতিক ভিতকে শক্ত করার জন্য চাই কৃষি এবং শিল্প। স্বাভাবিক নিয়মেই প্রয়োজন বিনিয়োগের। যদিও ওই মানুষটাই একদিন বিরোধিতা করেছিলেন শিল্পের, বলেছিলেন—শিল্প শেষ করে দেবে শ্রমদিবস। বিপন্ন হবে শ্রমিক-মজুর। যার ফলে বাড়বে দারিদ্র। তখন অবশ্য তিনি বা তাঁর দল সরকারে ছিলেন না। বলা ভালো এটাই চিরাচরিত নিয়ম। যেখানে বিরোধীরা কেবল বিরোধিতাই করে যাবে। সোজা কথায় প্রতিক্ষণ বিরোধিতাই মূলতন্ত্র বিরোধীদের।

বদলে গেল সেই স্লোগান। তার কথাগুলো। স্থান নিল দেশ বাঁচলে বাঁচবে মানুষ। দেশ সমৃদ্ধ হলে সমৃদ্ধ হবে মানুষের অর্থনীতি, যার মূল সূতিকাগার শিল্প। তিনি বহুবার পাড়ি দিলেন বিদেশে। উদ্দেশ্য, পুঁজি বিনিয়োগকারীদের আমন্ত্রণ জানানো।

সবচেয়ে অবাক ব্যাপার এই উপলব্ধি আসতে কেটে গেল অনেকগুলো বছর। পতিত, অকৃষি জমি তখন পাট্টা দেওয়া হয়ে গেছে হতদরিদ্রদের মধ্যে। যেখানে তারা তাদের ঘাম রক্ত ঝরিয়ে সোনা ফলাচ্ছে প্রতি বৎসর। হতদরিদ্ররা দুহাত তুলে আশীর্বাদ করছে সরকার, দল এবং নেতৃত্বকে, কেননা ওই সব সংসারকে আর অনাহারের যন্ত্রণা সহ্য করে কোনোরকম করে জীবন্মৃত হয়ে থাকতে হচ্ছে না।

জোনাল মিটিং সেরে ফেরার পথে কুনালবাবুর সাথে দেখা হলে এইসব কথাই বলেছিলেন কুনালবাবু।

কুনালবাবু বর্ধমান জেলার একটি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত দর্শনের শিক্ষক। আবিরদের গ্রাম জনার্দনপুর তাঁরও পিতৃভূমি। কিন্তু জীবনের অনেকটা সময় ওখানে না থাকার জন্য নতুন প্রজন্মের অনেকেই তাকে চিনত না। এখন চিনে গেছে। অবসর নেওয়ার পরে চলে এসেছেন জনার্দনপুরেই। অগাধ পাণ্ডিত্য মানুষটির। রাজনীতিটাও তার নখদর্পণে।

কুনালবাবুর বক্তব্যের শেষে বলেছিল আবির—মানুষ শিক্ষা নেয় অনুশীলনের মধ্যে থেকে, শিক্ষা নেয় পূর্বকৃত ভুল থেকে।

বুঝলাম। কিন্তু তখনতো অনেক কিছু বদলে গেছে। এই যে ধরো ইংরেজি তুলে দেওয়া। বলা হল মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ সমান। আরে বাবা, পৃথিবীর প্রায় সব দেশ তাদের মাতৃভাষার সাথে যুক্ত করেছে একটি বা তারও বেশি ভাষা, যাতে করে তারা মেলে ধরতে পারবে নিজেকে যে কোনো ভাষাভাষী মানুষের দেশে। বিপরীতে নিজেদের পরিধির মধ্যে থেকে হারিয়ে যাবে প্রতিযোগিতার বাতাবরণ। যদিও যারা উৎসাহী তারা বাড়িতে গৃহশিক্ষক রেখে তৈরি করছেন তাদের ছেলেকে আর এক পৃথিবীর উপযুক্ত করে।

শুনলাম, ইংরেজিকে আবার ফিরিয়ে আনা হবে।

তবু ভালো, দেরিতে হলেও সাধুবাদ জানাতে হয় ভুল থেকে শিক্ষা নেবার জন্য। কিন্তু অনেকটা এবং অনেকে যে পিছিয়ে গেল আবির, যারা তাদের দারিদ্র নিয়েও চোখে স্বপ্ন বুনত। তাদেরকে কি ফিরিয়ে দিতে পারবে তাদের হারিয়ে যাওয়া সময়টা!

আসলে কি জানেন স্যার, ব্যাপারটাকে একটু অপব্যাখ্যা করা হয়ে গেছে। সরকার চেয়েছিল আগে নিজের ভাষাটা ভালো করে জেনে নিক, তারপর ...

কেন, তুমি আমি, আমরা আমাদের সময়ে কি ভুল শিখেছি?

এর উত্তর হয়তো জানা ছিল না আবিরের। জানা থাকলেও বলা যাবে না—সিদ্ধান্তটা ভুল ছিল, কারণ রাজনীতি!

অনেক ভালো আছে যা সবসময় স্বীকার করা যায় না, বলে না। জ্যোতিবাবুকে যখন প্রধানমন্ত্রী করার কথা ভেবেছিল অন্যান্যরা যা প্রত্যাখ্যান করেছিল দল, তার সমালোচনা করতে গিয়ে উনি বলেছিলেন "এটা একটা ঐতিহাসিক ভুল"। কিন্তু দল কি স্বীকার করেছিল। দল যদি মেনে নিত তাহলে ভারতবর্ষ আজ অন্যরকম হত। তিনটে রাজ্য ছেড়ে দল তার বিজয়নিশান ওড়াত আরও অনেক রাজ্যে। স্বাভাবিক নিয়মেই ওই ভুল শিক্ষার প্রশ্নে বৃহত্তর সুযোগ থেকে বঞ্চিত হল ছাত্র সমাজ। এই অধিকার সরকারকে দিল কে!

আবিরকে নিরুত্তর থাকতে দেখে কুনালবাবু বললেন—কথাগুলো কি ভুল বললাম?

এই সব কথা নিয়ে আলোচনা করতে ভালো লাগছিল না আবিরের। সে যেন

এড়িয়ে যেতে চাইল। বলল আবির—স্যার আজ থাক, অন্য একদিন এটা নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

বুঝতে পারলেন কুনালবাবু। তাই হয়তো বললেন—তা হ্যাঁগো আবির, সেলিমের খবর কি?

ও ভালো আছে স্যার।

ছেলেটি বেশ ভালো। ভীষণ স্পষ্টবাদী, তোমরা দুজন তো বেশ ভালো বন্ধু ছিলে?

আজও আছি।

বেশ বেশ। ভালো থেকো সব, ভালো রেখো সবাইকে। আনন্দ করো, কেন-না তোমরা এখন একটা প্রায় বিশ্বরেকর্ডের কাছাকাছি।

আপনারও তো আনন্দ হওয়া উচিত। যেহেতু আমাদের শরিক।

তা অবশ্য ঠিক, তবে কি জানো আবির ....

কুনালবাবু বিশ্বাস করেন, কোনো মতুবাদ চিরস্থায়ী নয়। সে মতবাদ যদি সমাজ সম্বন্ধীয় হয়। পরিস্থিতি সময়, কার্যকারণ বদলে দিতে পারে মতবাদ। যেমন বদলে যাচ্ছে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংজ্ঞা। মার্কসীয় দর্শন যেন ব্রাত্য হয়ে যাচ্ছে পরিস্থিতির বিচারে। তার বদলে যা চর্চিত হচ্ছে সে মতবাদ স্বয়ং মার্কস বেঁচে থাকলে সুইসাইডাল স্কোয়াড দাঁড়াতেন।

আবির তাকিয়ে আছে কুনালবাবুর দিকে, তার টেনে রাখা কথাটি বোধগম্যতায় আনার জন্য। কিন্তু সে সুযোগ দেননি কুনালবাবু। বললেন—এখানে তো ভোটের আগে বা পরে আমি ছিলাম না তাই এখনও জেনে উঠতে পারিনি কি ভাবে কি হল।

জেনে যাবেন আস্তে আস্তে।

অবশ্যই জেনে যাবেন কুনালবাবু। কারণ তিনি বিদগ্ধ অভিজ্ঞ মানুষ, তিনি সি. পি. আই. এম না হলেও আদতে বামপন্থী এবং পরম্পরায় বিশ্বাসী। কারণ কুনালবাবুর বাবা পরলোকগত শ্রীজাতবাবু ভীষণভাবে নেতাজি অনুগামী ছিলেন। তিনি ভারতের স্বাধীনতার জন্য জীবনে অনেক কিছু ত্যাগ করেছিলেন।

সুদর্শন, সুদেহী কুনালবাবুকে দেখলে শ্রদ্ধায় সবার মাথা নত হয়ে যায়। ইচ্ছে করে তার সাথে বসে বসে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতে। নেতাজির সম্বন্ধে আরও কিছু জানতে।

প্রশ্ন করেছিল আবির—আপনার কি মনে হয়, নেতাজি বিমান দুর্ঘটনায় ....

শেষ করতে দেননি কুনালবাবু। তার চোখে মুখে যেন কোথা থেকে উড়ে এসে দানা বাঁধল অবিশ্বাস। কংগ্রেসের প্রতি। তদন্ত কমিশন নামক প্রহসনের প্রতি! কিন্তু সব কিছু আড়াল করলেন কয়েকটি কথায় 'সময় বলবে'।

আর দেরি করতে চায়নি আবির, জরুরি সভা আছে। কুনালবাবুর কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় অনুরোধ করল আবির—সময় করে আমাদের বাড়ি একদিন আসুন না। গল্প করা যাবে।

বেশ তো, চলে যাব একদিন। তবে কি জানো, আমি কখন কোথায় থাকি তার তো ঠিক নেই।

চলে এল আবির কুনালবাবুর সান্নিধ্যে ছেড়ে। বর্দ্ধিত এল. সি মিটিং আছে। আজ সেখানে সে উর্ধ্বতন নেতৃত্বের কাছে জানতে চাইবে এমনকী ঘটনা ঘটল যার সম্বন্ধে দলের মূল্যায়ন ছিল "সেলিম দলের সম্পদ, অনুকরণীয়', তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হল। কেনই বা তার মতো একজন সৎ মানুষের নামে এভাবে কলঙ্ক রটনা করা হল।

সভা শুরু হল। শেষ হল সভা। কিন্তু জিজ্ঞাসা করার সুযোগ দিল না কেউ। কারণ আলোচনার সবটুকুই জুড়ে ছিল পদাধিকারীরা, যারা নাকি এই মহতী জয়ের কারিগর। সব শেষে কিছু সিদ্ধান্ত আবিরকে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নিলে নেতৃত্ব।

অপমানবোধ কুরে কুরে খাচ্ছিল আবিরকে, তার মনে হচ্ছিল অবশিষ্ট সম্মানটুকু বজায় রাখতে হলে সরে আসাই উচিত। তা না হলে যেমন আর সবার ক্ষেত্রে হয়েছে, চরিত্রে কালো দাগ ছিটিয়ে তাকেই নিকেশ করে দেবে একদিন। বিচ্ছিন্ন করে দেবে জনগণ থেকে। আবার মনে হল—ছেড়ে দিলে নজরুল, বসন্ত, জিৎরা আরও বেপোরোয়া হয়ে উঠবে। ভুল বোঝাবে অথবা বিভ্রান্ত করে দেবে উচ্চতম নেতৃত্বকে। ক্ষতি হয়ে যাবে দলের। কারণ ওরা পারে না এমন কোনো কাজ নেই।

বাড়ি ফিরছে আবির, এইটুকু পথটা যেন মনে হচ্ছে দূরতিক্রম্য পথ। পা দুটো যেন তার নিয়ন্ত্রণে নেই।

হাঁটছে আবির। রাত্রি তখন প্রায় সাড়ে এগারোটা। সুন্‌সান চারিদিক। রাস্তার কুকুরগুলো সমস্তদিনের ক্লান্তি শেষে একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছে এখানে ওখানে। কেন-না তাদের দায়িত্ব আছে রাত্রি পাহারার। কখনও কখনও ঘুম ভেঙে যাচ্ছে তাদের, হয়তো কোন কিছুর ঘ্রাণে চিৎকার করে উঠছে ঘেউ ঘেউ, ঘেউ ঘেউ, ঘেউ ঘেউ।

তাদের চিৎকার আঁধার দেওয়ালে ধাক্কা মেরে ফিরে আসছে তাদেরই কাছে, তারপর আবার ঘুম।

আকাশে বোধহয় মেঘ জমেছে। চারদিক অন্ধকার। অথচ আজ শুক্লা ত্রয়োদশী। বাতাস বইছে দক্ষিণ-পশ্চিম কোন্ থেকে। কেমন যেন ভিজে গন্ধ বাতাসে। বোধহয় কোথাও বৃষ্টি হয়েছে। একটু আগেই ছিল গুমোট গরম।

নরম মিষ্টি বাতাস। মন, শরীর জুড়ানো। কিন্তু আবিরের মনের ভিতরে জমে থাকা ঝড়ের কেন্দ্রস্থল থেকে পরিবর্তন করছে না গতিপথ। পাক খাচ্ছে, শুধু পাক খাচ্ছে, অস্থির হয়ে উঠছে আবির।

বাড়ির খুব কাছাকাছি এসেছে আবির। হঠাৎ একটা টর্চের আলো এসে পড়ল তার চোখে। হঠাৎ অন্ধকারটা কেমন যেন বদলে গেল আবীরের চোখের সামনে থেকে। অন্ধকারটা এখন কুয়াশার মতো, আলো-আঁধারি।

জিজ্ঞাসা করল আবির—কে? কে ওখানে?

আমি অতীন, এতক্ষণে মিটিং শেষ হল?

হ্যাঁ ভাই, তা তুমি কোথায় গেছলে?

না তেমন কোথাও নয়, ও ভালো কথা, একটা ব্যাপার শুনেছ।

আবার সেই 'ব্যাপার'। সবাই সবার 'ব্যাপার' শোনানোর জন্য ব্যস্ত। অথচ কেউ বোঝে না আবিরের মনের মধ্যে চলতে থাকা দ্বন্দ্বময় নানা ব্যাপার। তাই হয়তো কিছুটা বিরক্ত হয়েই জিজ্ঞাসা করে আবির—কেন? কি হয়েছে?

অবনী তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব হয়েছে।

জানি অতীন।

অতীন এতবড়ো একটা খবর দেওয়ার পর আবিরের এইটুকু কথা শুনে যেন তৃপ্তি পেল না। যেন ইচ্ছে ছিল আবিরের প্রতিক্রিয়া জানার, অথবা ইচ্ছে ছিল এই টালমাটাল অবস্থায় আবিরের মানসিক অবস্থান্তর হয়েছে কিনা।

হতাশ অতীন, আবিরের নিশ্বাসের সামনে দাঁড়িয়ে বলে—তুমি জানো! অথচ আমরাই আগে জানতে পারিনি।

তুমি তো বললে না, কোথায় গেছলে?

আমি একটু সুখময়ের বাড়ি গেছলাম আবিরদা।

কেন?

ওর ছেলের জন্মদিন, কিছুতেই ছাড়ল না। খাওয়াদাওয়া সারতে সারতে দেরি

হয়ে গেল। এখন চলি আবিরদা, মেঘটাও উঠেছে। অনেক কথা আছে, কাল সব বলব।

চলে গেল অতীন টর্চ জ্বেলে। অথচ চলে যেতে পারল না আবির। তার দুটো পা যেন আটকে আছে বাড়ির কাছাকাছি এসে। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে শুনল অতীন ডাকছে—মা, ওমা, দরজাটা খোলো।

খকখক কাশির শব্দ যেন খান খান করে দিচ্ছে রাত্রির নীরবতা। তারপর থু থু করে কফ ফেলার শব্দ। সব শেষ করে বললেন—কে-রে, অতীন এলি!

হ্যাঁ মা।

যাই, যাই। এত রাত্রি। যন্ত্রণায় আর উঠতে পারি না বাবা।

দরজা খোলার শব্দ শুনল আবির, তারপর দরজা বন্ধের শব্দ। ঠিক তখনই কয়েকটা প্যাঁচা ডেকে উঠল ক্যারর, ক্যারর, ক্যারর।

তাদের ডাক শেষ হতেই একটা কুকুর যেন গা ভাঙতে ভাঙতে শব্দ করল কুঁই কুঁই।

আবির পায়ে পায়ে এগিয়ে এল দরজার সামনে। দাঁড়াল একটু সময়। পেচ্ছাব সারল দেয়ালের পাশ দিয়ে চলে যাওয়া নালায়। সব সারা হলে দরজার কড়া ধরে নাড়া দিল ঠক ঠক ঠক ঠক।

এল না নয়না, হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। টর্চ জ্বেলে পকেট থেকে ঘড়িটা বের করে দেখল আবির, রাত্রি বারোটা বেজে সাত মিনিট। এত রাত্রিতে অতীন, অতীনের মা আর আবির ছাড়া বোধহয় কেউ জেগে নেই।

খারাপ লাগছিল আবিরের, বেচারা নয়না, সমস্তদিনের পরিশ্রম, তারপর সন্ধেতে মহিলা সমিতির মিটিং, ফিরে এসে রান্না ....

মনে মনে বলল আবির—আর হয়তো বেশিদিন অন্তত আমার জন্য তোমাকে রাত্রি জাগতে হবে না নয়না। আমিও হয়তো সেলিমের মতো দশটা বাজতে না বাজতে আড্ডা সেরে এসে তোমাকে সঙ্গ দিতে পারব, যদি তুমি চাও।

এভাবে কতক্ষণ আর দাঁড়াবে। তাই ডাকল আবির—নয়না, এই নয়না, শুনছ দরজা খোলো।

কোনো সাড়া নেই ওপাশ থেকে।

আবার ডাকল আবির—এই নয়না, নয়না, দরজা খোলো তার সাথে জোরে জোরে কড়া নাড়ল আবির।

এবার ভিতর থেকে সাড়া দিল নয়না—দাঁড়াও আসছি।

দরজা খুলেই নয়না দেখল একটা ঝড়ের মুখে পড়া বিব্রত মানুষকে। তার চোখে-মুখে বেদনা আর হতাশার স্পষ্ট চিহ্ন।

জিজ্ঞাসা করল নয়না—কি গো? কি হয়েছে তোমার? এত উশকোখুশকো, চিন্তাগ্রস্ত তোমার চেহারা!

ভেতরে চলো, সব বলব।

তার মানে!

দরজাটা বন্ধ করে দাও নয়না, অনেক রাত্রি হয়েছে।

বাড়ি ঢুকে জামা-প্যান্ট ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে বলল আবির—ভীষণ খিদে পেয়েছে। খেতে দাও।

নয়না দেখছে। দেখছে এ এক অন্য আবির। যার সাথে তার আবিরকে যেন মেলানো যাচ্ছে না।

খেতে খেতে নয়না বলে—জানো, আজ তখন রাত্রি প্রায় নটা, অবনী আসছিল। বলছিল অবনী—আজ নাকি নজরুলরা তোমাকে খুব অপমান করেছে।

তাকাল আবির নয়নার দিকে, সে তাকানোতে কোনো বিস্ময় ছিল না। ভালোবাসা ছিল না। আবিরসুলভ রসিকতা ছিল না। ছিল একটা ভয়,—তা হলে কি নয়না আগেই জেনে গেছে।

নয়না কথাগুলো বলে ভাবল, বলা বোধহয় ঠিক হয়নি। তাই তাড়াতাড়ি বলল—জানো আমার আদৌ বিশ্বাস হয়নি। অবনী তো দলবদল করেছে। তাই মিথ্যে অপপ্রচার করে তোমার, আমার মনভারী করার চেষ্টা করছে।

যেন কথাগুলো শুনেতে চায়নি আবির অথবা শুনেও শোনেনি ভাব দেখিয়ে জিক্ষাসা করল—অবনী এসেছিল?

আবির তোমার কি হয়েছে! তুমি এত অন্যমনস্ক হয়ে আছ কেন?

কই কিছু হয়নি তো?

বলো আবির, অবনী যা বলে গেল সেটা মিথ্যা!

ভাতের শেষ গ্রাসটা তুলল আবির। খাওয়া শেষ হলে তার জন্য রাখা দুটা, যেমন প্রতিদিন থাকে এবং খাওয়া শেষে খায়, খেল আবির। উঠে গেল আসন ছেড়ে। হাতমুখ ধুয়ে এসে বসল বারান্দায়, একটা সিগারেট ধরালো।

নয়না সব কিছু পরিষ্কার করে এসে বসল আবিরের পাশে। সিগারেট খাচ্ছে আবির, শেষ হল, ধরাল আর একটা।

নয়না যত দেখছে অবাক হচ্ছে। ভাত খেয়ে একটা সিগারেটের দুই-তৃতীয়াংশ খেয়ে ফেলে দেয় আবির। আজ পরপর তিনটে খেয়ে আর একটা বের করতে গেলে হাত থেকে কেড়ে নিল নয়না।

কী হচ্ছে কী, এত সিগারেট কেউ খায়।

জানি নয়না।

তা হলে খাচ্ছ কেন?

কতকগুলো জোনাকি পোকা বসেছে কৃষ্ণচূড়া গাছের ড়ালে। তাদের আলোগুলো জ্বলছে নিভে যাচ্ছে। আবার জ্বলছে। এখনও আকাশে জমে আছে মেঘ। আজ ত্রয়োদশী। অথচ জোছ্না নেই। অন্ধকারে ভীষণ মায়াবী লাগছে কৃষ্ণচূড়া গাছটাকে।

এত নিঃস্তব্ধতা যে নয়নার নিশ্বাসের শব্দটাও শুনতে পাচ্ছে আবির, এমনকি নিজেরটাও।

তাকিয়ে আছে নয়না। বাড়ছে রাত, কেউ কোনো কথা বলছে না।

হঠাৎ বলল আবির—জানো নয়না, আমার মনে হচ্ছে আমাদের সাধের দলটা বোধহয় ছুটে চলেছে পতঙ্গের মতো আগুনের দিকে। আমি বুঝতে পারছি না এটা কমিউনিস্ট পার্টি নাকি অন্য কোন উচ্ছৃঙ্খল, বিশৃঙ্খল একটা দল। নাকি কোনো লুটেরাদের অন্দরমহল।

এই হল তোমার বদ রোগ, সাদাকে কালো দেখা।

জানি না, আমার যা মনে হয় তাই বললাম। আমার ভুলও হতে পারে অথবা এমনও হতে পারে মতবাদ আদর্শ নয়, দল দীর্ঘস্থায়ী হবে পেশিশক্তির জোরে, এটাই একমাত্র আদর্শ।

কী সব যা তা বলছ।

প্রসঙ্গ বদলাল আবির, বিরক্তিকর সন্ধ্যার পর থেকে এখন রাত্রি একটা। এই এতটা সময় যে ভাবনাগুলো কুরে কুরে খাচ্ছিল, আবির হয়তো চাইছিল সেই আলোচনার গাম্ভীর্য ভেঙে বেরিয়ে আসতে। কারণ সে দেখছিল নয়নার কপালে চিন্তার বলিরেখাগুলো ধীরে ধীরে হলেও স্পষ্ট হচ্ছে।

ও, তোমাকে তো বলাই হয়নি, আজ, অনেকদিন পরে কুনালবাবুর সাথে দেখা হল।

কে কুনালবাবু!

দর্শনের প্রফেসর, বর্ধমানে থাকতেন। এখন এখানে, এই জনার্দনপুরে।

তাকে কি আমি দেখিনি?

হয়তো দেখেছ, যেহেতু তাকে তুমি চেনো না, তাই বুঝতে পারোনি, জানো নয়না, সেই কবে ছোটোবেলায়, তারপর আমরা যখন কলেজে পড়ি তখন আমাদের দেখেছিলেন, অথচ আজও তিনি আমাদেরকে মনে রেখেছেন।

আরও অনেক কথা বলল আবির। কুনালবাবুর জীবন, তার সংসার, তার ছেলে ইত্যাদি নিয়ে। মন দিয়ে একাগ্র শ্রোতার মতো শুনছিল নয়না। সব বলা শেষে, তার মনে খেলে গেল সেই আগেকার দুষ্টু বুদ্ধি। তাই জিজ্ঞাসা করে ফেলল—

হ্যাঁগো, উনি কোন্ দলের!

এতক্ষণের গম্ভীরতা ভাঙল আবিরের। হাসতে হাসতে বলল—কেন? সমগোত্রীয় না হলে কি ভালো লাগে না।

আমি কী তাই বললাম। এই যে ধরো তুমি, তুমি যদি কংগ্রেস বা বিজেপি হতে, কিংবা নকশালপন্থী, অথবা মাওবাদী বা কামতাপুরী, তা হলে কি তোমাকে ডিভোর্স করতাম। নাকি তোমার বিছানা ছেড়ে মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে একা একা ঘুমোতাম! আসলে অনেক ব্যাপার আছে যেখানে ন্যূনতম ঐক্যমতের ভিত্তিতে আঁতাত করতে হয়। স্বার্থ বোঝো তো? এ হল একবারে ব্যাক্তিগত স্বার্থ।

কখনও কখনও আঁতাত তো ভেঙে যায়, যেমন আমাদের সাথে বিজেপির হয়েছিল, এখন আছে কংগ্রেসের সাথে।

এটাই তো রাজনীতি, তাই না আবির! এখানে প্রয়োজনমতো সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

ঠিক সেই মেয়েটির মতো, যে তার স্বামীকে বলে আমি তোমাকেই ভালোবাসি, আবার প্রেমিককে বলে আমি তোমাকেই শুধু ভালোবাসি।

আমি ঠিক ওভাবে বলতে চাইনি। ওটা তো দ্বিচারিতা।

মেনে নিতে পারলাম না নয়না। স্বার্থের চরিত্রে দ্বিচারিতা বলে কিছু নেই। ওটার কোনো বিধিবদ্ধ নিয়মও নেই।

তা হ্যাঁগো, তুমি তো বললে না, ভদ্রলোক কোন্ দলের?

জানার কি খুব দরকার। একটা কথা বলব নয়না?

বলো।

মানুষকে তার ব্যবহারিক জীবনের রং দেখে বিশ্লেষণ করতে যেয়ো না, তা হলে শ্রদ্ধা হারাবে।

তার মানে, উনি নিশ্চয় তৃণমূল করেন?

না, ফরওয়ার্ড ব্লক করেন।

একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল নয়না। তাকে দেখে মনে হল, একটা ইঁদুর যুদ্ধ করতে আসছে একটা বাঘের সাথে।

মুখে বলল—উনি কি কোনো দল পেলেন না। যে দলটা চিরকাল পরজীবী।

কী সব যা-তা বলছ। মানুষের মনের স্বাধীনতা আছে। সে কী করবে, কী করবে না, কাকে চাইবে, কাকে চাইবে না, সেটা তার একবারে নিজস্ব ব্যাপার। তা ছাড়া ওদের এত তুচ্ছ ভাবার কোন মানে হয় না। ওরা আমরা নিয়েই তো একটা ফ্রন্ট, একটা শক্তিশালী ফ্রন্ট।

দূর দূর, একবার এককভাবে দাঁড়াক না, তা হলেই বুঝবে কত ধানে কত চাল।

তোমার এটা মনে হল কেন?

হল, কারণ ওদের বাস্তব অবস্থা। ওনার স্ত্রীও বোধহয় ...

না, সি পি আই করেন।

হায় হায়, যা দেখছি, ওদের দুজনেরই কোনো বাস্তববোধ নেই।

তা হলে কি তুমি বলতে চাইছ সবাই মার্কসবাদী কমিউনিস্ট করুক!

অবশ্যই।

তোমরা এক কাজ করো বুঝলে, পার্লামেন্টে একটা বিল আনো, বিলটা হবে ....

গণতান্ত্রিক দেশে ওগুলো আবার হয় নাকি?

তুমি তা হলে স্বীকার করছ, এটা গণতান্ত্রিক দেশ। তা যদি ভাবো, তাহলে ব্যক্তি মতামতকে তুমি গুরুত্ব দিচ্ছ না কেন? কেন বলছ মানুষ দলে দলে এসে যোগদান করবে আমাদের দলে। বিরোধী বা অন্য কোনো দল থাকবে না!

নয়না বুদ্ধিমতী, কিন্তু সে সুদর্শন সরখেল নয় সেলিমও নয়। রাজনীতিটা ভীষণ ঠান্ডা মাথার মানুষের কারবার। নয়না একটু মোটা দাগের আবেগসর্বস্ব রাজনীতিবিদ। তাই যুক্তির জাল বুনলে সে হেরে যায়। জাল কেটে বেরিয়ে আসতে পারে না। তখন বলতে বাধ্য হয়—ওভাবে ভাবিনি। নয়নারা আসলে সবার চোখের মণি হয়ে উঠতে না পারার কারণও ওই একটাই।

দলও বোধহয় এদের মতো মানুষকেই চায়, কারণ এরা মতাদর্শ বুঝুক না বুঝুক ভোটবাক্স ভরাতে সিদ্ধহস্ত। সেলিমেরা এখন ব্রাত্য। ব্রাত্য দলের কাছে, কিন্তু দলবদল করে চলে যায়নি। যায়নি, কারণ ওদের রক্তের সাথে লাল রংটা মিশে ঘনত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে রক্তের। ওরা যেন সাতপাকে বাঁধা হয়ে আছে। তার অর্থ এই নয় যে ঝগড়াঝাঁটি নেই। নেই মান অভিমানের পালাগান। একটা যৌথ' সংসার তো এসব নিয়েই। এখানে ভুল হয়, ভুল বোঝাবুঝি হয়, সংশোধন হয়, আবার মিলিত হয় একসাথে। তা না যদি হত তা হলে এই ভাবে প্রায় ত্রিশটা বছর একটা দল একটা রাজ্যে ক্ষমতায় থাকতে পারত না। কেউ কেউ যে একেবারে সরে যায়নি তা নয়। আসলে তাদেরকে বাধ্য করা হয়েছে সরে যেতে। তাদের মধ্যেকার অভিমান, ক্ষোভ ইত্যাদি তাদেরকে নিয়ে গেছে অন্যপথে। সময় আসলে হয়তো আবার ফিরে আসবে। সে সময়টা শুধু সময়ের অপেক্ষা। যখন ওই সব ঘামে ঢেকে থাকা ময়লাগুলো বন্ধ করে দেবে রোমকুপ, জন্মাবে ব্যাক্টেরিয়া, ফোঁড়া হবে সমস্ত শরীরে, যন্ত্রণা হবে, জ্বর হবে। অকেজো হবে শরীর।

বলেছিল আবির—জানো নয়না, আমাদের কমিউনিস্ট দলটা যদি একটা সম্পূর্ণ শরীর হয় তা হলে সেই শরীরে বাসা বেঁধেছে দূষিত জীবাণু। ওরা শরীরটাকে শরীরের অজান্তে ঝাঁজরা করে দিচ্ছে। যেমন হয়েছিল সোভিয়েত দেশে।

আরে বাবা দলটার নাম কমিউনিস্ট পার্টি। এত সহজে ও সব হবে না।

হবে কী হবে না সময় বলবে; কিন্তু অভীক—নয়না আবিরের একমাত্র সন্তান। যার ছাত্রজীবন এখনও শেষ হয়নি, তেমন করে পা রাখেনি বাস্তবের রূঢ় নাকি নরম মাটিতে। সে তার প্রিয় মানুষ সেলিম কাকুকে বলে—উর্ধ্বতম নেতৃত্ব দিন দিন ধৃতরাষ্ট্র হয়ে যাচ্ছে কাকু।

আমাকে বলছিস কেন? আমি তো এখন দলের কেউ নই।

ছিলে তো। যখন ছিলে তখন তো বোঝা উচিত ছিল, আরও শক্তবাঁধন দেওয়া প্রয়োজন ছিল। তা ছাড়া তোমরা কেমন গো কাকু, যেখানে সত্যিকারের সংগঠক, সৎ সংগঠককে মূল্য না দিয়ে তাদেরকে বিড়ম্বিত করে যাও প্রতি পদক্ষেপে।

অবাক হয়ে দেখছিল নয়না, ভাবছিল অভীক কি ...., না না তা হবে কেন। ও তো আমাদের সন্তান। যেমন আমি সুদর্শন সরখেলের সন্তান।

একটা অজানা ভয় ভর করছিল নয়নার মনে। পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে তার। তার পরিবর্তন দেখে হাসছে আবির। অবাক হয়ে যাচ্ছে সেলিম।

ভাবছে সেলিম—নতুন প্রজন্ম আজ বদলে যাচ্ছে কেন? ভুলটা কোথায়, তবে কি আমরা ....

ভাবনাটা শেষ করতে দেয়নি আবির—সিদ্ধান্ত তো অনেক দূরে, তার আগেই খোঁচা দেয় আবির—কিগো নয়না, তোমার উত্তরসুরিকে দেখলে?

স্বভাবসিদ্ধ রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে দেয়নি নয়না। রাগের লাগামটা শক্ত হাতে এবার ধরে রেখেছে। অভীক আবীর নয়, আবিরের মতো অভিজ্ঞ নয়। পোড় খাওয়া নয়, নিতান্তই তরুণ। সুদর্শন সরখেলের কথায় অভীক হল ময়দা, ওকে দলতে হবে, লেছি করতে হবে, লুচি করতে হবে, তারপর তেলে ভাজতে হবে, তখন সে রূপ পাবে, সে রূপ কখনো বিরূপ হবে না।

নয়না কিছু বলতেও পারছে না। সেলিমও বলতে পারছে না, কারণ অভীক খুব একটা ভুল বলছে না। সে তো তার খোলা চোখ নিয়ে দেখছে সমাজটাকে, রাজনীতির রীতিনীতিকে। বুঝতে পারছে সেলিম, একটা প্রতিষ্ঠান বিরোধী পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। যেমন হয় প্রতি রাজ্যে, প্রতি রাষ্ট্রে, প্রতি দেশে যখন সেখানকার সরকার দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতায় থাকে। বুঝতে পারছে আবির—এখনও সাবধান না হলে সমূহ বিপদ।



সন্ধ্যা তখনও বিকেলকে বিদায় জানায়নি। জানাবে বলে প্রস্তুতি সারছে। পাখিরা তখনও বাসার পথ ধরেনি, কেউ কেউ ডালে বসে, কেউ কেউ উড়তে উড়তে কিছু জরুরি কথা সেরে নিচ্ছে। আবির নয়না তাদের বারান্দায় বসে। আগামীকাল অভীক চলে যাবে বলে কিনে আনা কিছু দরকারি জিনিস গুছিয়ে দিচ্ছে অভীকের ব্যাগে। অভীক বসে বসে দেখছে নয়নার পরিপাটি করে গুছোনো। তখনই সেলিম এল। বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে তাকে, যেন কোথাও কোন বিপদ হয়েছে।

এসেই দেখে আবির নয়নাকে। জিজ্ঞাসা করে—কি ব্যাপার কী এত গোছানো হচ্ছে, ছেলের ব্যাগে?

উত্তর দেয় নয়না—আর বোলো না। অভীক শুধু লম্বাতেই বড়ো হয়েছে। মনটা সেই আগের মতোই ছোটো রয়ে গেছে।

অভীক বলে বসল—সে কিগো মা, আমার মনটাকে ছোটোবেলায় রেখে দিলে।

তা নয়তো কী! নিজে তো কিছু পারে না। চালিয়ে যাও, বাবা মা যতদিন আছে।

দেখছ কাকু, দেখছ, কেমন চিমটি কেটে কথা বলছে।

কই চিমটি কাটলাম, আমি তো ঠিকই বলেছি। জিজ্ঞাসা কর তোর বাবাকে।

বাধা দিল সেলিম। বলা ভালো প্রসঙ্গ বদলে দিল—এই আবির শুনেছিস?

ওই একটা কথা, ওতেই সবাই চুপ। আবির তাকাচ্ছে সেলিমের দিকে। কোনো পরিবর্তন নেই।

জিজ্ঞাসা করল আবির—কি যেন বলছিলি?

একটু যেন ভেবে নিল সেলিম, তারপর বলল—জানিস গোকুলপুরে যা কোনোদিন ছিল না, আজ তাই হল!

কী বলছিস তুই, কী এমন ঘটল?

শামসুর আলি গলায় দড়ি দিয়ে নিজেকে শেষ করে দিল।

সে কী রে, কেন?

অভাব গ্রাস করছিল শামসুরকে। ছেলে মেয়ে সংসারে মোট সাতজন। জমি যা ছিল, কষ্টেসৃষ্টে চলে যাবার কথা। কিন্তু হলে কি হবে, খামখেয়ালি শামসুরের মন বসত না চাষাবাদে। দরাজ গলার শামসুল কাওয়ালিটা গাইত ভারি সুন্দর, বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও যেত, সবাইকে আনন্দ দিত। তারপর ছিল দলীয় কার্যালয়। সেখানেই কাটাত বেশির ভাগ সময়, সবাই তাকে ভালোবাসত। এটা ওটা ফাইফরমাশ খাটত।

সংসার চলে না, নাজমাবিবি তাকে যখনতখন যাচ্ছেতাই করত। এ নিয়ে কতবার যে ওদের বাড়ি গেছি, ওদের গন্ডগোল মেটাতে তার ঠিক নেই।

বলতাম—চাচা, এবার সংসারে মন দাও। ছেলে মেয়েরা বড়ো হচ্ছে। তাদেরকে লেখাপড়া শেখাচ্ছ, ওসব ব্যাপারে খরচা আছে। তোমার জমিও আছে। ওগুলো নিয়ে নাড়াঘাটা করলে তোমাকে ধরে কে!

বোঝানোর পর কাজে মন দিত শামসুর। সেই দিন কয়েক। তারপর আবার আগের মতোই।

বলতাম—চাচা, আবার কি হল?

ঘরে মন বসেনি যে, যা গিজগিজ করে তোমার চাচি। জান কয়লা হয়ে যায়।

গতকাল বিকেলে ধুম ঝগড়া। যা আগে এতবড়ো আকার নেয়নি। তা ছাড়া ওদের দুজনের ঝগড়ার মধ্যে কোনোদিন নাক গলায়নি ছেলে মেয়েরা। তাদের সময় কোথায়। স্কুল, টিউশন, লেখাপড়া। এবার তার মেজো বেটি আয়েশা সব শুনে থাকতে পারেনি। তা ছাড়া সে নিজের চোখে দেখল—আব্বা আম্মাকে ভীষণ মারছে। সহ্য হল না দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী আয়েশার।

শামসুর নাজমাকে যাই বলুক, যাই করুক, ছেলেমেয়েরা তার জানের উপরের জান। কেউ তাদেরকে কিছু বললে মাথা গরম হয়ে যেত। তারাও ভালোবাসত তাদের আব্বাকে।

আয়েশা তার আম্মাকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে মুখোমুখি দাঁড়াল আব্বার—আচ্ছা আব্বা, তুমি তো ওখানে বসে থাকো দুটো বিড়ির আশায়, নজুচাচাকে দ্যাখোনি, সেও তো ওখানে যায়। তার জমিও নেই কাজ করে খায়। সন্ধে হলে লোকের দোকানে বিড়ি পাকায়, এটা ওটা করে রোজগার করে। তার তো টিউশন ফি বাকি পড়েনি। তাদের বাড়িতে কোনোদিন তো ঝগড়াও হয়নি। আমার মতো ছেঁড়া চটি, টাকি দেওয়া জামাও পরেনি। তা হলে তোমার থেকেই বা লাভ কী? বরং এন্তেকাল হলে আমরা বুঝব আমাদের কেউ নেই। এভাবেই আমাদের চলতে হবে।

জানিস আবির, আমাকে যখন নাজমা চাচি ডেকে নিয়ে গেল, গিয়ে দেখলাম শামসুর চাচার চোখে জল। চোখ-মুখে কেমন যেন অন্যরকম কিছু।

আসলে তার কোনো ছেলে মেয়ে তাকে তো কখনও আঘাত দেয়নি। ভাবলাম, খুব কষ্ট পেয়েছে শামসুর চাচা। আমি বোঝালাম। সব শুনল মন দিয়ে কেমন যেন নির্বাকভাবে।

আমি বাড়ি ফিরে এলাম, তখন রাত্রি অনেক। ক্লান্তিতে খুব তাড়াতাড়ি ঘুম এল চোখে।

তখনও ভোরের স্পষ্টতা আসেনি। আমাদের বাড়ির জানালায় বার বার কে যেন ধাক্কা দিচ্ছিল। উঠে দেখি শামসুর চাচার ছেলে তনবির।

জিজ্ঞাসা করলাম—কিরে, কি হয়েছে?

কাঁদতে কাঁদতে তনবির বলে আব্বা বাড়িতে নেই। চারদিক খোঁজা হয়েছে, কোথাও নেই।

কেমন যেন ভয় পেয়ে গেলাম ওদের বাড়ি। গিয়ে দেখলাম আয়েশা নিজের চুলের ঝুটি ধরে চুল ছিঁড়ছে। বলছে আমি কেন বললাম, ও আব্বা তুমি ফিরে এসো, আমি যে বলতে চাইনি, তোমাকে ছাড়া যে বাঁচব না আব্বা।

নাজমা চাচি কেমন যেন চুপচাপ। হয়তো আশায়। তার খসম রাগ করে কোথাও গেছে। রাগ কমলে ফিরে আসবে।

মহল্লার সবাই বেরিয়ে পড়ল খোঁজ করতে। আমি, নবি গেলাম কালীনদীর পারে।

সেই মাত্র স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সবকিছু। খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে দেখি হিজল গাছটার একটা ডালে দড়ি, সেই দড়ির অপরদিকটা নিজের গলায় বেঁধে ঝুলে আছে শামসুর চাচা।

আবির, নয়না নির্বাক। তারা শুনছে একটি মৃত্যুর কাহিনি।

অভীকও শুনছে। তার চোখ থেকে যেন আগুন ঝরছে। ঝরছে রাগ, হতাশা।

জানিস আবির, সবাই জুটেছিল শামসুর চাচার বাড়িতে। পুলিশ এল, নিয়ে গেল শামসুর চাচাকে। সুরতহাল হল। কবর দেওয়া হল কিছুক্ষণ আগে।

কী লজ্জা, আমি জানলামই না!

এবার অভীক যেন ফেটে পড়ল—তোমার এসব জানার তো দরকার নেই। তা ছাড়া শামসুর রহমান তো কোনো ভি আই পি নয়, যে খবর ছড়িয়ে পড়বে চারদিকে।

নয়না বলে—তুই কি বলছিস অভীক।

বলছি না ভাবছি। মানুষ কেন জীবনের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে, কেন আয়েশারা এমন হয়ে যায় বলতে পারো?

সেলিম আজ গল্প করবে বলে আসেনি, তাই সময় নষ্ট না করে বলে—আজ চলিরে আবির। ওখানে একবার যেতে হবে, নাজমা চাচি ভীষণ ভেঙে পড়েছে। খারাপ লাগছে আয়েশার জন্য, বেচারা ....

বেরিয়ে পড়ল সেলিম, আবিরের বাড়ি থেকে।



সূর্য ডুবেছে সদ্যোমাত্র। এখনও তার অবশিষ্ট আলোয় দেখা যাচ্ছে সবকিছু। সেই আলোতে পথ দেখে দেখে সাইকেলে চড়ে বাড়ি ফিরছে সেলিম কালীনদীর পারের রাস্তা ধরে। গোকুলপুরের কাছাকাছি এসে দাঁড়াল সেই হিজলের তলায়। যে গাছটাতে

শামসুর চাচা শেষবারের জন্য বোধহয় ভোরের আগের পৃথিবীকে দেখেছিল। বিদায় জানিয়েছিল। টর্চের আলো ফেলল সেই ডালটার দিকে, যেখানে দড়িটা বেঁধেছিল। একটা অন্যমনস্কতা গ্রাস করছিল সেলিমকে। সে যেন বিশ্বাসই করতে পারছিল না, যার সাথে গতকাল দেখা হয়েছিল, কথা হয়েছিল, সেই মানুষটা হঠাৎ এত বড়ো একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

মানুষের মন বোধহয় এমনই। ভীষণভাবে আবেগতাড়িত, তখন সে তার বোধে আনতে পারে না সে যা করছে সেটা সঠিক নয়। সে যা করছে তার সুদূরপ্রসারী ফল ভোগ করতে হবে সংসার, সমাজকে। আবার এই আবেগতাড়িত হয়ে অনেকে এমন কিছু করে যার ফলস্বরূপ সমাজ, সংসার পায় আনেক কিছু, তার মধ্যে আছে প্রভূত সম্মান।

শামসুর চাচা, খামখেয়ালি, সংসারের প্রতি উদাসীন, তবুও তার উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা ছিল তার সংসারে, কারণ নাজমাবিবি বিশ্বাস করত ছেলে মেয়ে বড়ো হলেই তাদের শাদি দিতে হবে, নাতি নাতনি নিয়ে গড়তে হবে একটা সুখী গৃহকোণ। সেখানে লেখাপড়া, শিক্ষাদীক্ষার তেমন কোনো গুরুত্ব নেই। সে নিজেও লেখাপড়া জানে না, স্বাক্ষরতার পাঠ নিয়েছে তার মেয়ের কাছ থেকে। শামসুর চাচা মনে করত সংসার তো সবাইকেই করতে হবে, দুদিন আগে অথবা পরে। কিন্তু লেখাপড়া না শিখলে, চিনতে পারবে না সমাজকে, এমনকী নিজেকেও। তাই তার প্রতিটি মুহূর্তের প্রশ্রয় ছিল ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া শিখুক।

শামসুর চাচার চেতনায় আবিষ্ট তার ছেলে মেয়েরা আবার উদ্‌বুদ্ধও বটে। তার অভাবে ছেলেমেয়েরা ফিরে যাবে নাজমার সেকেলে চেতনার গুহায়, হারিয়ে যাবে আয়েশারা। স্থান নেবে কোনো এক গৃহকোণে। সেখানে তাদের একমাত্র কাজ হবে, সন্তান ধারণ, প্রসব, আর সারাদিনের আক্লান্ত পরিশ্রম, খসমের মন জোগানো।

হিজল গাছটার সেই ডালটার দিকে তাকিয়ে আরও কত ভাবনা খেলা করছে সেলিমের মনে। সেই ভাবনার কোনো বাঁধন নেই, সম্পূর্ণ স্বাধীন তারা, ভিন্ন পথগামী। হঠাৎ একটা দমকা বাতাস এসে নাড়িয়ে দিল সেলিমের মাথার চুলগুলো, তার জামাটাকেও। ঠিক তারপরেই একটা কাল প্যাঁচা ডাকল কুঁক কুঁক কুঁক, কুঁক কুঁক কুঁক।

জিন বিশ্বাস করে না সেলিম। কিন্তু একটা অজানা ভয় তাকে গ্রাস করল। হয়তো সে একা বলে। অথবা এলোমেলো ভাবনাগুলো মনে বাসা বেঁধেছে বলে। অথবা মনটা এইমুহূর্তে শামসুর চাচাময় হয়ে আছে বলে।

এই এক মানসিক রোগ মানুষের। মন যখন দুর্বল থাকে তখন ভর করে ধর্মীয়

বিশ্বাস। জিন, ভূত প্রেত, অশরীরী আত্মা ঠিক তখনই সেই সুযোগ নেয় সমাজের বুকে ঘুরে বেড়ানো নকল সাধুসন্ত, পির, তান্ত্রিক ইত্যাদিরা।

আসলে সেলিমের মনে দুর্বলতা নামক একটা মানসিক রোগ সেলিমের অজান্তেই আশ্রয় নিয়ে বসে গেছে। ঘামছে সেলিম। দুর্বল হয়ে যাচ্ছে তার দুটো পা। মন চাইছে এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে যেতে। তেমনই সিদ্ধান্ত নিল সেলিম। উঠতে গেল সাইকেলে, সাইকেলের প্যাডেলে জড়িয়ে গেল প্যান্টটা। পড়ে গেল সাইকেল। ঠিক তখনই কয়েকটা শৃগাল ডেকে উঠল হুক্কা হুয়া, হুক্কা হুয়া, হুক্কা হুয়া। তাদের ডাক শুনে হয়তো ভয়ে কতকগুলো পাখি কিচিরমিচির শব্দ তুলল তাদের বাসায় বসে।

সাইকেলটা তুলল সেলিম, ঠেলতে ঠেলতে দ্রুত পা চালাল, তার যেন মনে হল, তাকে কেউ অনুসরণ করছে। তাড়াতাড়ি নদীর পার ছেড়ে একটা আল-রাস্তা ধরে নতুন রাস্তাতে এল সেলিম।

একরকম হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ি ফিরল সেলিম। ঘরে ঢুকেই ডাক দিল সাবিনা, তুমি কোথায়? আমাকে একটু পানি দাও তো।

বারান্দার টিউবলাইটটা জ্বালাল সাবিনা। সেলিমকে দেখেই অবাক হল সে। ভয়ও পেল, ঘামছে সেলিম, চোখে মুখে আতঙ্কের স্পষ্ট চিহ্ন।

কি গো তুমি তো ঘেমে স্নান করে গেছে। কি হয়েছে তোমার?

না তেমন কিছু নয়। তুমি তাড়াতাড়ি পানি দাও।

সাবিনা তাড়াতাড়ি পানি নিয়ে এসে দেখে সেলিম মেঝেতেই বসে পড়েছে। তাকিয়ে আছে প্রাচীরের দিকে।

পানি দিল সাবিনা। পানি খেয়ে জামার হাতা দিয়ে সেলিম মুছে নিল মুখটা। তারপর তাকাল সাবিনার দিকে।

সাবিনাও তাকিয়ে আছে সেলিমের দিকে। তারপর একটা গামছা এনে বলল—জামা প্যান্টটা ছাড়ো তো, সব ঘামে ভিজে গেছে।

সেলিম বাধ্য ছেলের মতো জামা প্যান্ট ছেড়ে গামছা পরতে পরতে সাবিনা টেবিলফ্যানটা বের করে আনল বাইরে, চালিয়ে দিল ফ্যানটা।

সেলিম এদিক ওদিক ভালো করে দেখল। তারপর বলল—সাবিনা, আমার কাছে একটু বোসো।

কেন? কি হয়েছে তোমার।

সব বলছি, আগে বোসো।

সবকিছু বলল সেলিম—জানো, আমার মনে হল শামসুর চাচা যেন আমার পিছনে পিছনে আসছে।

এই প্রথম সেলিমের মনে একটা বিশ্বাসের হালকা আস্তরন পড়তে শুরু করল—কিছু একটা আছে। কিন্তু মুখে বলল—কি জানো সাবিনা, সারাদিনের ধকলে শরীরটা ক্লান্ত তো। তা ছাড়া শামসুর চাচা হঠাৎ করে এভাবে চলে গেল, তাই মন আর শরীর দুটোই দুর্বল হয়ে গেছে।

তুমি মিথ্যে বলছ সেলিম। এর থেকেও অনেক ঝড় তোমার মন আর শরীরের উপর বয়ে গেছে। কই তখন তো তোমার চোখমুখ এমন আতঙ্কগ্রস্ত হয়নি!

না গো না, তুমি যা ভাবছ ....

কিচ্ছু ভাবছি না, আমি পরান চাচাকে ডাকছি।

তাকে কেন?

একটু ঝাড়ফুঁক করে দেবে।

না সাবিনা কাউকে ডাকতে হবেনা, তুমি একটু চা করে যদি খাওয়াও ....

তা না হয় করছি। এখন চুপ করে বোসো তো!

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সাবিনা, বোধহয় পরান চাচাকে ডাকতে।



মুম্বাইতে বেশিদিন থাকা হল না সেলিম সাবিনার। কারণ শওকতের কোম্পানি শওকতকে কলকাতার ফার্মে পাঠিয়ে দিল সাত তাড়তাড়ি। স্বাভাবিক নিয়মেই পাততাড়ি গুটালো শওকত মুম্বই থেকে। ফিরে এল কলকাতায় সাবিনা, সেলিমকে সাথে করেই। কলকাতায় ফিরে এসে কয়েকদিন থাকার পর ওরা সিদ্ধান্ত নিল শওকতের শাদি দেবে।

সেলিমের এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়র একমাত্র মেয়ে, থাকে হাতিবাগানে। ওখানেই দেখাশোনা হল শওকতের। সুন্দরী মেয়ে, লেখাপড়া জানা। সেলিম ওদেরকে কথা দিয়ে ফিরল—ওখানেই শওকতের শাদি দেবে।

বাড়ি ফিরেই অসুস্থ হয়ে পড়ল সাবিনা। এই বয়সে এই বাতটাই সাবিনাকে যেন পঙ্গু করে দিতে চাইছে।

এমনিতেই ফিরে আসার সম্ভাব্য দিনের আগে ফিরেছে শুনে অবাক হয়েছে আবির, তারপর জরুরি ডাক পেয়ে আরও অবাক হয়ে গেল।

জিজ্ঞাসা করল—নয়না কি ব্যাপার বলো তো, ওরা এত তাড়াতাড়িই ফিরল কেন? বা এত জরুরি ডাকই বা দিল কেন?

সেটাই তো ভাবছি। আচ্ছা সাবিনার শরীর খারাপ হল না তো?

আমি বলি কী, এক্ষুণি চলো।

এই দুপুরেই?

না না, এখনই চলো, আমার মন কেমন কু গাইছে!

দুপুরেই বেরিয়ে পড়ল নয়না আবির, এসে দেখল সাবিনা শুয়ে আছে। পা ফুলে গেছে। মুখটাও কেমন ফোলা ফোলা। ভীষণ ক্লান্তির ছাপ চোখে মুখে।

সাবিনার কাছে বসল নয়না। তার মাথায় হাত রেখে জিজ্ঞাসা করল খুব কষ্ট হচ্ছে, তাই না সাবিনা?

হচ্ছিল, এখন আর হচ্ছে না।

কেন? ওষুধ খেয়েছ?

সে তো খাচ্ছিই, তার জন্য নয়। এই যে তোমরা এলে।

আমরা এসেছি বলে সুস্থ হয়ে গেলে?

হাসল সাবিনা। যদিও তার হাসিতে লুকোনো ছিল ভীষণ কষ্ট। নয়নার হাতটা নিজের বুকে রেখে তাকাল নয়নার দিকে—আচ্ছা নয়নাদি, কেন এমন হয় বলো তো? যখন তোমরা আসো তখন মনে হয় আমাদের সব দুঃখ, যন্ত্রণা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে।

মনগুলো যে একই সুরে বাঁধা সাবিনা।

তুমি বলছ?

কেন বিশ্বাস হচ্ছে না?

না তা নয়। জানো নয়নাদি, সেলিমও বলে আমরা দুটো সংসার যেন একে অপরের জন্য।

আবিরও তো ওই একই কথা বলে। অথচ দ্যাখো সামাজিক প্রশ্নে আমরা অভিন্ন নয়।

কিন্তু মনের প্রশ্নে...

জানি না ঈশ্বর আছেন কিনা, যদি থাকেন, তা হলে তার কাছে প্রার্থনা করি আমরা আজ যে অবস্থায় আছি, চিরদিন যেন তাই থাকি এবং আমাদের ছেলেরাও।

ওদের কথা বলছ কেন? ওদেরকেই ভাবতে দাও।

ওরা তো আমাদেরই সন্তান। আমাদের মতো হোক এটাই তো কাম্য। তাই না?

হুঁ। হ্যাঁগো আবীরদা, সেলিম কি গল্প করছে?

না, ওরা কোথাও গেল মনে হচ্ছে।

কোথায়?

বলে যায়নি তো!

কোথায় গেল, কেন গেল এই নিয়ে যখন নয়না সাবিনা চিন্তা করছে ঠিক তখনই ফিরে এল আবির সেলিম। সাথে ডা. সোমশংকর রায়! যাকে নয়না চেনে, সেলিমও চেনে। কিন্তু সাবিনা চেনে না।

জনার্দনপুর রায় বাড়িরই ছেলে সোমশংকর। পড়াশোনা জনার্দনপুর সারদাময়ী স্কুলে। তারপর ডাক্তারি পড়তে যাওয়া। বর্তমানে অর্থোপেডিক সার্জন। বাড়ি আসে বৎসরে দুবার। এবারও এসেছে। জানত আবির। তাই সেলিমকে নিয়ে চলে গেছল তার কাছে।

নয়না তো দেখেই অবাক। সোমশংকর এই চড়া রোদ্দুর মাথায় নিয়ে এসেছে। অবাক সাবিনাও, ওদের যেন এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না। না হওয়ার কারণ তো অনেক।

সারা পশ্চিম বাংলার মানুষ জানে, জানে নয়নাও। দেখেছে টিভি, খবরের কাগজে। ডাক্তাররা পয়সার পিছনে ছুটে চলেছে রাত্রি দিন। কেউ কেউ যে ব্যতিক্রমী চরিত্রের নয় এমন নয়। তারা সংখ্যায় ভীষণ কম, শতকরা পাঁচভাগও নয়, বিভিন্নভাবে তাদের রোজগার, পরীক্ষানিরীক্ষাতে কমিশন, ওষুধ কোম্পানির কাছে কমিশন, নার্সিংহোমে রোজগার, তারপর চেম্বারে রোজগার। অথচ তারা বলে, তারা নাকি সেবার ব্রতে ব্রতী।

এই সেবা শব্দটা একটা পুঁজির মতো। যেমন রাজনৈতিক নেতাদের পুঁজি দলের ছত্রছায়া—এটাকে পুঁজি করে অনেকে ডান হাত বাম হাতে কামাচ্ছে দেদার। ডাক্তাররা যেহেতু সমাজের বন্ধু, সেই ধারণা থেকে তাদেরকে বলার কেউ নেই। বললেও তাদের

পাশে দাঁড়ানোর জন্য অনেক জননায়ক আছেন। রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে মুখ খুললে যাকে বলে বাঘে ছুলে আঠার ঘা ওরা ছুঁলে কুড়ি ঘা।

সেই ডাক্তার এসেছে সেলিমের বাড়ি। সে হয়তো শতকরা পাঁচের দলে।

সোমশংকর বয়সে আবির সেলিমের থেকে অনেক ছোটো। হয়তো বয়সজনিত পার্থক্য থেকে শ্রদ্ধা অথবা গ্রামের মানুষ এই কারণেই সম্পর্ক থেকে তুমি বলেই সম্বোধন করছে আবির।

সাবিনাকে দেখার পর জিজ্ঞাসা করল আবির—কি দেখছ?

তেমন কিছু নয়। একটু রক্তাল্পতা আছে। তার উপর বাতের রোগ। ওষুধগুলো লিখে দিচ্ছি। কিনে খাওয়ান সব ঠিক হয়ে যাবে।

আরও কিছু গল্প করে চলে গেল সোমশংকর। সোমশংকর, চলে যাওয়ার পর তাকে নিয়ে কিছু আলোচনা চলল তিনজনে। সোমশংকর মেধাবী ছাত্র ছিল। সোমশংকর ভালো ডাক্তার। সোমশংকর আর পাঁচটা ডাক্তারের মতো নয় আরও কত কী। এমনই হয়। কেউ যদি একটু ভালো ব্যবহার, একটু উপকার করে মানুষ সেই 'কেউ'-এর প্রতি মজে যায়। তার কারণ সম্বন্ধে সেলিম বলে—কী জানিস আবির উপকার, সহানুভূতি, ভালো ব্যবহারগুলো ভীষণ রকমের আণুবীক্ষণিক হয়ে গেছে। অথবা হারিয়ে গেছে। তাই কেউ যদি ওগুলো দেখায় বা করে তা হলে মানুষের মন নতুন করে বিশ্বাস করতে চায়। বলা যায় মন প্রাণ ভরে অনুভবে আনতে চায়।

নয়না বলে—কথাটা বোধহয় ঠিক।

আবির বলে—আবার 'বোধহয়' শব্দটা যুক্ত করলে কেন?

আবির, তুমি বোধহয় সেকেলেই রয়ে গেলে।

কেন?

তুমি ভালো করে কোনোদিন দ্যাখোইনি ব্যাংক বা আর্থিক সংস্থায় বা কোনো আর্থিক চুক্তিতে কোটি কোটি টাকা লেনদেন হলেও টাকার অঙ্কটার পরে মাত্রটা. যোগ করা হয়। আর নিশ্চিত ঘটনা দেখা এবং প্রমাণিত হতে পারে এমন প্রামাণ্য জানার পরেও বলতে হয় বোধহয়। আসলে দুটোতেই একটা করে ফাঁক।

অসুস্থ সাবিনাও নয়নার ব্যাখ্যা শুনে না হেসে পারল না। আবির সেলিম তো হেসেই খুন।

সেলিম বলে—এই নয়না, পা দুটো একবার আমার দিকে বাড়াবে, একটু ধুলো নিতাম।

আবির হলে·হয়তো বাড়িয়ে দিত। নয়না তা করল না, উলটে বলল—যা দেখছি তোমাদের ওই যাকে বলে ভীমরতি, তাই ধরেছে।

সায় দেয় সাবিনা—ঠিক বলেছ। ওরা যে কি করে রাজনীতি করছে জানি না।

আবির বলে—আরে এটাও শিখতে হয়।

কী যে বলেন! এটা শিখতে হয়।

আরে বাবা হয় হয়, এর দ্বারাই মোক্ষ লাভ হয়।

এমন সব হেঁয়ালি করেন না, অবাক লাগে।

তা বলতে পারো। তবে এই বিদ্যেটা সেলিম যদি এক বছর আগে শিখে নিত, তা হলে ওকে দল থেকে এভাবে বহিষ্কৃত হতে হত না।

কথাগুলো একটানে বলে সেলিমের দিকে তাকাল আবির। হাসছে সেলিম, তাই দেখে আবির বলে—কি আমি ঠিক বলিনি?

সেলিম বেশ তেজ নিয়েই বলল—আলবাত বলেছিস।

আরে কোন্‌দিন আমি ভুল বলি বল তো? অথচ নয়না, ও তো সবসময় বলে, তুমি কিছু জানো না, বোঝো না।

বিলকুল ঝুট, ও মেয়েছেলে। এমনিতেই গ্রেম্যাটার একটু কম, ও বোঝেটা কি!

খেপে উঠল নয়না—কি বললে? আমি বুঝি না। যদি নাই বুঝতাম তা হলে এত বড়ো দায়িত্ব পার্টি আমাকে দিল কেন?

ওই যে, সেলিম যা তোমাকে বলল, তুমি যেমন বলেছিলে।

রেগে যাচ্ছে নয়না, আবিরের রূঢ় রসিকতা শুনে। সাবিনা দেখছে, নয়নার দুটো গাল ঘন গোলাপি হয়ে যাচ্ছে। তাই হয়তো সেলিমকে বলল—আচ্ছা, তোমরা থামবে। দেখছ একটা অসুস্থ মানুষ এখানে পড়ে আছে .....

আবির বলে—বাঃ, বেশ ম্যানেজ করতে পারো তো!

ম্যানেজ আবার কি করলাম। আসলে আপনাদের না চোখ, না মন, দুটোই নেই।

বোধহয় সাবিনার কথায় থামল আবির, থামল সেলিম। কিন্তু ভীষণ চা তেষ্টা পায় যে! সাবিনা অসুস্থ, করবেই বা কে।

সাবিনা বুঝতে পারছে। কারণ সে তো জানে দু'জনই বার বার চা খায়। নয়নাও জানে। কিন্তু তার মুড খারাপ, তার উপর সেলিমের বাড়ি।

সাবিনাই বলে—নয়নাদি, অনেক কথা তো হল, একটু চা হলে ভালো হত।

ওদের জন্য নাকি তুমিও খাবে?

সবার জন্যই।

ওদের জন্য হলে হয়তো চা করতে যেত না নয়না। সাবিনারও যেহেতু খাবার ইচ্ছে হয়েছে তাই চা করতে গেল নয়না। সাবিনা বলল—একটু পাঁপড়ও ভাজবে। আবিরদা পাঁপড় খেতে খুব ভালোবাসে।

ও তো অনেক কিছুই ভালোবাসে। ভালোবাসলেই সাপ্লাই দিতে হবে এমন কথা কি কোথাও লেখা আছে।

সেলিম বলে—ভালোবাসার যাতনা অনেক সখী, এও জানি তুমি যাতনা সহ্য করতে পারবে না।

আমার বয়ে গেছে।

নদী তো বয়েই যায়, তাই না।

এইতো, সব অন্য মানে করা।

সাবিনা আবার নিরস্ত্র করে—আচ্ছা তোমাদের কি কোন জ্ঞান নেই, নাকি কেউ কষ্ট পেলে তাকে আরও কষ্ট দিতে ভালো লাগে।

আবির বলে—দ্বিতীয়টা।

সত্যি আপনারা পারেনও। এবার একটু চুপ করে বসুন তো, তা না হলে টিভিটা খুলে সিনেমা দেখুন। আজ ওগো বধূ সুন্দরী চলছে।

কি বললে "ওগো বধূ সুন্দরী"?

তাইতো দেখলাম, খবরের কাগজে দিয়েছে।

ভুল দেখেছ।

বললেই হল, ওই তো খবরের কাগজটা পড়ে আছে দেখুন না।

দেখেছি, ওতে লেখা আছে "ওগো পরের বধূ তুমি সুন্দরী"।

ধ্যাত, এত ইয়ার্কি মারেন না।

সেলিম বলে—ইয়ার্কি না, পরের বধূ হলে সত্যিই তাকে সুন্দরী লাগে।

তা লাগবে বইকী। যে দিন ঝাঁটা ধরবে ওই পরের বধূটি সেদিন ভালোলাগা ছুটে পালাতে পথ পাবে না।

সাবিনা বলল টিভি খুলতে। ইচ্ছে করছে না দুজনেরই। তার থেকে যা চলছে সেটাই ভালো। কিন্তু রেগে যাচ্ছে নয়না। সাবিনাও বোধহয় বিরক্ত হচ্ছে। তাই আবির সেলিম বসে রইল চুপচাপ। অপেক্ষা, কখন নয়না আসবে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে। এসে বলবে জনাব আপনাদের জন্য শরাব এনেছি।

অপেক্ষার যেন শেষ নেই। আসছে না নয়না। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে আবির দেখনা রে চা করতে গিয়ে নয়না পিঠটান দিলে নাকি।

দেবে না। শিবকে ছেড়ে উমা কি যেতে পারে। তারও তো ভয় আছে। শিব যদি অন্য নারী সঙ্গে লিপ্ত হয়।

সাবিনা শুনছে। কিছু বলার নেই তার। বলেও লাভ নেই। অবশেষে নয়না আসল চা এবং টা নিয়ে। অবশেষে শান্ত হল আবির সেলিম। আর উত্তক্ত করেনি নয়নাকে। নয়নাও আর মনে রাখেনি।

চা খেতে খেতে আবির দেখছে সেলিমের চার দেওয়াল। দেখে মনে হচ্ছে দেওয়ালের ছবিগুলো আবার নতুন করে সাজিয়েছে। একটাই মাত্র ছবিকে দেখা যাচ্ছেনা। সেটা মহম্মদ জিন্নার। নেতাজি দিয়ে শুরু হয়েছে, শেষ হয়েছে মাও জে দঙ-এর ছবি দিয়ে।

ছবিগুলো দেখতে দেখতে জিজ্ঞাসা করল আবির—মহম্মদ জিন্নাকে দেখছি না যে।

হাসে সেলিম—আর বলিসনা ছবিটা হাত থেকে পড়ে গিয়ে ভেঙে গেল, তাই নতুন করে বাঁধাতে দিয়ে এসেছি।

আমি ভাবলাম তুই শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ করলি নাকি।

করিনি, তবে করা উচিত ছিল।

আবির দেখল সেলিমকে, কেমন যেন বিরক্ত সেলিম। জিন্নাসাহেবের নাম করতে কেন যে বদলে গেল বোঝা গেল না। যদিও সবকিছু বোঝার দরকারও আবিরের নেই।

আবিরের চোখ পড়ল নেতাজির ছবিটার দিকে। জিজ্ঞাসা করল—ছবিটা বদলেছিস বোধহয়।

হ্যাঁ।

ভালোই করেছিস। ওটাতে কেমন কালো আস্তরণ পড়ে গেছল।

এখনও তো পড়ে আছেরে আবির।

পড়ে আছে মানে।

বুঝলি না, তার রহস্যঘন মৃত্যুরহস্য।

আচ্ছা সেলিম, বলতে পারিস এতবড়ো একটা মিথ্যাকে, সত্যের পূজারিরা প্রকাশ্যে আনতে চাইছে না কেন? আরে বাবা মুখার্জি কমিশনের রিপোর্টটা প্রকাশ্যে আনলেই তো ল্যাটা চুকে যায়। তা ছাড়া জওহরলাল নেহরু তো বেঁচে নেই।

আমরাই বা কি ভূমিকা নিয়েছি বল তো? আর ওই যে ফরওয়ার্ড ব্লক, ওরাও তো দেখলাম খোলসে ঢুকে গেল।

সাবিনা বলে—নেতাজি অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে 'খোঁজখবর' যা তোলপাড় করছে।

নয়না বলে—সত্যি, কি জঘন্য রাজনীতিটাই না করল কেন্দ্রীয় সরকার। ওরা বোধহয় ভয় পেয়ে যাচ্ছে সত্যিটা উদ্‌ঘাটন হয়ে গেলে ওদের প্রতি মানুষের যেটুকু বিশ্বাস সেটা তলানিতে চলে যাবে, এই ভেবে।

আবির বলে—শুধু নেতাজি রহস্য বলছ কেন। এই ভারতে হাজার অন্যায় হাজার কেলেঙ্কারি, হাজার খুন, ধর্ষণ কোন্ ব্যাপারটা নিয়ে সরকার তার স্বচ্ছতা দেখাচ্ছে বলো তো!

সেলিম বোধহয় এমনই স্বীকারোক্তিই চেয়েছিল। বোধহয় কেন, অবশ্যই চেয়েছিল। বলেছিল—এমন একটা সরকারের সাথে যে-কোনো ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে সমর্থন করার অর্থ মানুষের কাছে ভুল বার্তা পাঠানো।

গর্হিত অপরাধ করেছিল সেলিম, কেউ মেনে নেবে কেন! সুতরাং শেষ করে দাও ওকে।

কথাগুলো বোধহয় মনে পড়ে গেল সেলিমের। তখন থেকে আর একটা ধারণা জন্মে গেছল রাজনীতির প্রশ্নে—বোধহয় সততা, স্বচ্ছতার কোনো দাম নেই, যে-কোনো মূল্যে টিকে থাকা, টিকিয়ে রাখাটাই হল আসল, এবং তা করতে গেলে নেতাজিকে হত্যা করতে হলে হতে পারে। সেলিমকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে হলে হতে পারে। কিন্তু আবির, সে তো অন্য ধাতুতে গড়া, যে সাদাকে সাদা বলে, লাল কে লাল। তার কথা শুনে সেলিম বলে—তাহলে স্বীকার করছিস বল।

বুঝতে পারেনি আবির, এমন একটা খোঁচা খেতে হবে। কিন্তু সেলিম তো ভুল বলেনি। এমন তো অনেক ঘটনা আছে। যার উদাহরণ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে

রয়েছে তা হল আসল ঘটনাকে চেপে দেওয়া এবং সাধারণ মানুষের চোখে রঙিন কাচ লাগিয়ে দেওয়া যাতে করে মনে বিভ্রান্তি তৈরি হয়। দুরে সরে যায় মূল সমস্যা থেকে। আমেরিকা যেমন মূল সমস্যাটাকে চেপে রেখে যুক্তি দেখাল ইরাকে পরমাণু অস্ত্র আছে, আক্রমণ করো ইরাককে। প্রমাণ হল পরমাণু অস্ত্র নেই। সাজানো হল রাসায়নিক অস্ত্র আছে। তাও প্রমাণ হল না। এবার সাজানো হল গণহত্যার অপরাধে অপরাধী সাদ্দামকে গদিচ্যুত করতেই হবে। আসল কারণ ছিল সাদ্দামের ঔদ্ধত্যকে তাদের সহ্য হচ্ছিল না। আসল উদ্দেশ্য হল তেলের অধিকার নিজেদের হাতে নিয়ে নেওয়া। ধোঁকা দিল পৃথিবীর অন্যান্য দেশকে। বোকার মতো সমর্থন করল অনেকে। প্রথমে গৃহযুদ্ধ লাগানো হল। একে অপরের প্রতি লিপ্ত হল বিশ্বাসঘাতকতায়—যা তাদের ঐতিহ্য, অন্তত ইতিহাস তাই বলে।

এমনই ঘটছে প্রতিটি দেশে, প্রতিটি রাজ্যে। মানুষকে বিভ্রান্ত করে দাও। অথচ ওরা বুঝতে পারেনি, একটা সুপ্ত আগ্নেয়গিরির উপর ওরা দাঁড়িয়ে আছে। যে কোনো মুহূর্তে ও লাভা উদ্‌গিরণ করতে পারে, ধ্বংস করে দিতে পারে সব। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠাদের অহংকার, মিথ্যাচারিতা এবং তার থেকে পতনের ইতিহাস অন্তত তাই বলে।

আজ সেলিম বলছে—তুই স্বীকার করছিস তা হলে!

অসুস্থ সাবিনা বলল—আপনারাও তো কোনো আলাদা দ্বীপ নন আবিরদা।

শৃগাল হয়ে বাড়ি ফিরেছিল আবির। চেষ্টা করছিল আগামীর দেওয়াল লিখন পড়তে। দেখেছিল অভীককে যা সাবিনা, সেলিমের ধারণার সাথে মিলে যায়।



নয়না গল্প বলে মহিলা সমিতির সাংগঠনিক দৃঢ়তার। গল্প করে নিজের বর্তমান অবস্থানের। তার চোখে মুখে আনন্দলহরি। দল তাকে ভীষণ গুরুত্ব দিচ্ছে। আবির শুনছে, আবির ভাবছে, আবির ভাঙছে, কেন-না সে দিন দিন ব্রাত্য হয়ে যাচ্ছে দলের কাছে। মনে পড়ছে আবিরের শ্রীপদ চৌধুরি, প্রভাকর সেনগুপ্তকে, রামশংকর বোসকে। যাদের ঘাম-রক্ত এবং ত্যাগের বিনিময়ে আজ এই স্থায়িত্ব, অথচ তারা তাদের শেষ জীবন কাটিয়েছে ভীষণ কষ্টের মধ্য দিয়ে। যা অবর্ণনীয়। তাদের মৃত্যুর পর অবশ্য তাদের নামে টাউন হল, কলেজ হচ্ছে।

ভয় হয় আবিরের ওদের শেষজীবন দেখে। ভাবে আবির—সে কি সরে যাবে নিজের সম্মানটুকু নিয়ে। যেমন অনেকেই সরে গেছে। যারা নিজেদের বৃত্তে থেকে কেবল সমর্থক হয়ে কাটিয়ে চলেছে অবশিষ্ট জীবন।

আবার ভাবে—তা হলে তো লাগামছাড়া কর্তাব্যক্তিরা বেপরোয়া হয়ে উঠবে। শেষ হয়ে যাবে একদিন লক্ষ শ্রমের বিনিময়ে তৈরি ইমারত।

আবিরের মনে বৈরাগ্যের ছায়া রাজনৈতিক বৈরাগ্য। কিন্তু কেন? সে কী নয়নার উত্থান, নিজের ব্রাত্য হয়ে যাওয়া, নাকী আরও অন্যকিছু ভাবনা!

ভালো লাগছে না নয়না। সব কেমন যেন এলোমেলো লাগছে। মনে হচ্ছে সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে স্কুল নিয়েই কাটিয়ে দিই বাকি জীবন।

তোমার এসব মনে আসছে কেন?

জানো নয়না, আমার মনে হয়, জমিটা পতিত ছিল, আগাছায় ভর্তি ছিল। আমরা কর্ষণ করলাম। তারপর বীজ বুনলাম, জল দিলাম, ওই জমিতে কে বা কারা ইউক্যালিপ্টাস লাগিয়ে দিল। তারা বড় হতে হতে মাথা তুলে দাঁড়াল। জমির তলায় সঞ্চিত রক্ত খেতে শুরু করল, হারাল উর্বরতা। তারপর একদিন মরুভূমি হয়ে গেল।

তোমার সব বাজে কল্পনা।

না নয়না, অলীক কল্পনা নয়। আমি যেন সবকিছু দেখতে পাচ্ছি। শুনতে পাচ্ছি তাদের অহংকারী পদধ্বনি।

এদেরই আসার কথা, তোমরা তো চিরকাল থাকবে না। এরাইতো তোমাদের উত্তরসুরি।

হয়তো।

একটা কথা বলব?

বলো।

তোমাদের পছন্দ না হলেও উর্ধ্বতনরা তো এদের দুহাত তুলে আশীর্বাদ করছে।

তুমি বোধহয় ভুল করছ নয়না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওরা কিছুই জানে না। কিংবা ওদের কাছে ভুল বার্তা পাঠানো হচ্ছে। কিংবা জেনেও ধৃতরাষ্ট্র....

সে তো তোমরাই পাঠাচ্ছ তা হলে?

এখানেই তো যত সমস্যা। তবে এটাও ঠিক, আমাদের অন্তর্দলীয় অবনিবনা এবং দলভারী করার প্রবণতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। ফলে কি হচ্ছে জানো?

কি?

বন্যা তো দেখেছ। নদীর বাঁধ যদি পলকা হয়, কেমন ভেঙে যায় সেই বাঁধ, ধ্বংস করে সবুজ মাঠ। পচে যায় সবুজ। তারপর যখন নদী খালি হয় মাঠ ভাসানো বেনো জল বেরিয়ে আসে। ধূসর করে দেয় মাঠটাকে।

এসব হবে না আবির। উচ্চতমরা সব খোঁজ রাখে।

কে জানে!

না রাখলে তার ফল ভোগ করতে হবে। তুমি, আমি, সেলিম, আমাদের কি করার আছে বলো।

সত্যি আমাদের কিচ্ছু করার নেই। কিন্তু সাধারণ মানুষ যারা জীবনের যে একটা মানে আছে সেটা জেনেছে আমাদের সময়েই। তারা হাসতে পারছে। গাইতে পারছে। তাদের চোখে লেগেছে স্বপ্নের আবেশ তাদের কি হবে? তারা তো কোনো অপরাধ করেনি! আমরা তো নগন্য যারা নেতৃত্বে আছি। নেতৃত্বে আছি ওদেরই অকৃপণ সহযোগিতায়।

আমরা ওই সব নেতৃত্বকে বোঝাতে পারি না কেন?

ওরা যে সংখ্যায় বেশি নয়না।

তা হলে উপায়!

জানি না, তবে বুঝতে পারছি গ্রহন লেগেছে সূর্যে। ঠিক অন্ধকার নয়। কিন্তু আঁধারের মতোই কালো আবরণ জমছে সমাজে।

আর এসব ভালো লাগছে না আবির। ছেড়ে দাও ওসব দুর্ভাবনা, তার থেকে যত দিন আছো ততদিন ভালোবেসে থেকে যাওয়াই ভালো।

পারবে কি?

যতদিন পারা যায়।

যেন সত্যি গ্রহণ লেগেছে সূর্যটায়। সে গ্রহণের নাম নজরুল হতে পারে, জিৎ হতে পারে, বসন্ত হতে পারে, অথবা অন্য কেউ। ওরা নয়-এর দশকের প্রথম দিকে এসে থিতু হয়েছে সূর্যটার মাঝামাঝি। বাকি দুটো দিক এখনও অনাবৃত। সেখানে আছে সুবিমল চক্রবর্তী, কীর্তনীয়া বাস্‌কী, বিনায়ক রায়রা। মাঝের ওরা তো একসময় তীব্র বিরোধী ছিল বামপন্থার।

সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা, ওই তথাকথিত বামপন্থীদের নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে সবাই। হয়তো ভয়ে। ওদেরকে দল বলছে "দলের সম্পদ" সেই সুযোগে ওরা বদলে যাচ্ছে, বদলে যাচ্ছে ওদের জীবনশৈলী, কথাবার্তা, চালচলন। যে মানুষগুলো একদিন খেতে পেত না পেট ভরে, ভাড়াটিয়া সমাজবিরোধী হিসেবে খ্যাত ছিল। ওদের গাড়ি চলছে বিভিন্ন রাস্তায়। নামে, বেনামে, ব্যাংকে টাকা জমছে বেনোজলের মতোই।

হয়তো দল চাইছে দরকার নেই গুণগত মানের, দরকার সংখ্যাগত মান। যদিও সব দলই তাই চায়।

বলেছিল সেলিম, তখন সে রাজনৈতিকভাবে তার মধ্যগগনে—দরকার নেই এই সব সদস্যের, যাদের চেতনা মানে—টু আর্ন সামথিং। আমরা চাই এমন সব মানুষকে যারা পার্টির প্রতি দায়বদ্ধ থাকবে। যাদের গুণগত মান হবে সমালোচনার ঊর্ধ্বে। যারা খুনের রাজনীতি চালু করে মতবাদকে কলঙ্কিত করবে না।

দল এখন নেতাদের ইঁদুর দৌড় করা বাবা মা হয়ে গেছে। যারা চায় তার ছেলেটি যেনতেনপ্রকারেন চাকরি পেয়ে যাবে, কী দরকার উচ্চশিক্ষায়। চাই রোজগার।

রোজগার না হলে সংসারের অসারত্ব প্রকষ্ট হয়।

কথাটা একবারে ভুল নয়, কিন্তু ওই সব ছেলেরা, যারা টুকলি করে সার্টিফিকেট নিল, তারা সমাজকে কতটুকু দেবে!

আগে কোনো কোনো দক্ষিণপন্থী দল চাইত নজরুল, বসন্ত, জিৎদের মতো মানুষকে। তাদের স্থান ছিল যাকে বলে দলের হৃদয়মধ্যস্থলে। ওরা ছিল দুধে-কলায়। হাতেনাতে ফল পেয়েছিল ওই সব দক্ষিণপন্থীরা। তারপর একটা ইতিহাস! ওই সব কালসাপ, যাদের অভ্যেস দুধকলা খাওয়া, তারা আজ বামপন্থীদের মধ্যমণি।

বলেছিল সেলিম, বহিষ্কৃত হওয়ার পর—আল্লার কি দোয়া তিনি কিছু কিছু মানুষকে জন্মজন্মান্তরে নেতা করে পাঠান এই দুনিয়াতে। ওরা হয়ে যায় দুনিয়ার মালিক। তাদের বিরুদ্ধে কারও কোনো প্রতিবাদ নেই। প্রতিকার নেই। তারা মধুপায়ীদের মতো ফুলে ফুলে মধু খেয়ে চলে যাবে অন্য ফুলে। ফুল গ্রহণ করবে সাদরে।

ওরা ওদের জীবনকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। ভালোবাসে বলেই বিড়ম্বিত হতে চায় না কখনও। তার আগেই পথ খুঁজে নেয়। তারা জানে পথ আছে পথেই।



মনটা ছটফট করছে আবিরের। মনটা টানছে আবিরের। যেখানে রাখালিয়া বাঁশি বাজে। বাজায় মদন।

মদন যে কি ওষুধে বশ করেছে আবিরদের যে কেবল সেই জানে। একটা দিন না গেলে মনে হয় যেন এক যুগ যাওয়া হয়নি।

মদনেরও তাই অবস্থা। কৃষ্ণের রাধার প্রতি যেমন। একদিন এই দলটার কেউ যদি না যায়, পরের দিন সে বলবেই—ও কতদিন আপনাকে দেখিনি।

সন্ধে হয়ে গেছে, নয়না আবিরের জীবন যন্ত্রণার ছবি আঁকতে আঁকতে, হঠাৎ আবির বলে—এই নয়না একবার ঘুরে আসি।

এখন কোথায় যাবে?

ওই যে মদনের দোকানে।

আজ আর নাই বা গেলে।

ওর বাঁশি যে ভীষণভাবে টানছে নয়না।

সেটাই তো বলবে। কথায় বলে বউ যতই সুন্দরী হোক অবৈধ প্রণয়ী ডাকলে ছুটতে হবে তার কাছেই। অথবা উলটোটা, যেমন রাধা সব ছাড়ল কৃষ্ণের জন্য।

বা বেশ তো বললে। আমি কি তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি নাকি?

তা নয়। আর যদি যাও, আমার কিই বা করার আছে।

বেশ তা হলে যাব না।

হয়ে গেল। সত্যি, তোমার বয়স যত বাড়ছে, তত বেশি সেন্টিমেন্টাল হয়ে যাচ্ছ। তোমাকে যেতে দেব না কি বললাম। বললাম সন্ধে হয়ে গেছে ....

আবির জানে সে যাবে, নয়না জানে ওকে আটকানো যাবে না। অথচ নকল অভিমান করে বসে রইল আবির, যা হয় আর কী, পত্নীঅন্তপ্রাণ যেন। এমনই ভাবখানা।

নয়না বলে—যাচ্ছ যখন, কয়েকটা সাবান আর চা এনো তো, একবারে শেষ হয়ে গেছে।

আবির যেন এইরকমই কিছু একটা শুনতে চাইছিল নয়নার কাছ থেকে। তাহলে তাকে কিছু অন্তত বলা যাবে।

দেখলে তো, যদি যাওয়ার কথা না বলতাম তা হলে ওগুলো আনা হত না। কাল ভোরেই ঘুম ভাঙিয়ে আনতে পাঠাতে।

সত্যিই পাঠাতে হত।

তা হলে যাই?

যাও, তবে একটু তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে, তা না হলে .....

চলে এল আবির মদনের দোকানে। ওখানে আজ যেন চাঁদের হাট বসেছে, অথচ আবিরই ছিল না।

আবিরকে দেখে মদনের যেন আনন্দের শেষ নেই। বেচুবাবুকে ঠ্যালা মেরে বলল—খুড়ো, আবিরদা এসে গেছে। তাকিয়ে দ্যাখো।

রামবাবু বললেন—আরে আবির, এসো এসো। তোমার বিহনে মদনের মন খারাপ হয়ে গেছল!

মদন বলল—আমার না আপনাদের।

আমাদের সবারই।

তাহলে এক প্রস্থ হয়ে যাক।

চা বসাল মদন। রামবাবুর বাগানের ধন্বন্তরি পাতা সহযোগে। দোকানটা যেন ম-ম করছে ধন্বন্তরি পাতার গন্ধে।

বেচুবাবু তো বলেই বসলেন—মদন রে, তুই দেখছি সবার ঘর ভাঙিয়ে ছাড়বি।

আমি!

তবে কে? যা করছিস, ঘরে আর মন বসবে? নাকি গিন্নির গিজগিজানি শুনতে শুনতে গুমোগন্ধ চা খেতে ইচ্ছে করবে?

খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে উঠল মদন—কি বললেন? গুমোগন্ধ চা, নাকি কাকিমার ঘ্যানঘ্যানানি। কোনটার ভয়ে এখানে। তা ছাড়া আপনি তো কোনোদিন ঘরে চা খাননি।

না হে না, ইদানীং খাচ্ছি।

চা কিনে খাচ্ছেন? নাকি কোনো যজমানের ঘর থেকে দানে পেয়ে খাচ্ছেন।

বোধহয় সম্মানে লাগল বেচুবাবুর। তাই মাথা নিচু করে বসে গুম হয়ে রইলেন। দেখল সবাই।

কুনালবাবু মদনকে বললেন—মদন, বয়স বাড়ছে। এবার একটু .....

কী যে বলেন, এটুকুই তো আমার সম্বল, বাড়িতে গেলে তো মুখবোজানি ব্রত পালন করতে হবে।

ঠিক আছে। কিন্তু .....

অনুকুলবাবু আর থাকতে পারলেন না, বলেই ফেললেন—ওরে মদন, তোর বোঝা উচিত ছিল, মানুষটা জাতে বামুন, মানে ওই বিশ্বামিত্রের জাত। তোর সাবধানে কথা বলা উচিত। তা না হলে এই দোকানটাই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

অবনী বলে—মাফ চেয়ে নে।

হাসছে আবির। সেলিম, কুনালবাবু উপভোগ করছেন রসিকতা। ইসমাইল-সাহেবের যেন কোনো কিছুতে মন নেই। তাকিয়ে আছে মদনের সামনের তালগাছটার দিকে। ঠিক তখনই সবাইকে অবাক করে মদন নিজের কান ধরে কয়েকবার মুলে নিয়ে বলল—এবার হয়েছে।

হো হো করে হেসে উঠল সবাই। সবার হাসি দেখে বত্রিশ পাটি বের করে আবার বন্ধ করে নিলেন ইসমাইলসাহেব। সেটাও লক্ষ্য করল মদন।

ইসমাইলসাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল—দেখলেন তো, ইসমাইলসাহেবের হাসিটাও কেমন রেশনিং হয়ে গেছে।

আবার হাসির রোল উঠল মদনের দোকানে। সবাইকে দেখে ইসমাইলসাহেবও হাসলেন। বন্ধ করলেন মুখ। ঠিক যেন একটা কপাটিকা।

চাঁদের হাট ভাঙল মদনের দোকানে। এবার সবাই চলে যাবে যে যার বাড়ির পথে।

দোকান থেকে বেরিয়ে কুনালবাবু বললেন—সত্যি সেলিম, এখানে আসলে মনে হয় জীবনের কোনো কিছু হারিয়ে যায়নি।

অনুকুলবাবু বললেন—জীবন চলছে তার ছন্দ নিয়েই।

তারপর একটু নাটকীয় ভঙ্গিতে বললেন—কি মনে হয় জানেন—জীবন রে, তুই এটুকুর আশায় আছিস চিরদিন।

মদনকে বললেন—মদন রে, তুই বেঁচে থাক চিরকাল। তোর বাঁশি শুনে এই অধমেরা আজও দেখে মিষ্টি সকাল।

বিনয়ী হয়ে উঠল মদন—কি যে বলেন, আপনাদের পায়ের ধুলো পড়ে বলেই এ অধম এখনও বেঁচে আছে। তা না হলে বাড়ির তিনি কবে শ্মশান সেবায় পাঠিয়ে দিতেন।

আবীর বলে কি যে বলো মদন—তেনারা আছেন বলেই দুটো হাত দুটো পা মেলতে পারছি, তা না হলে ....

বেচুবাবু বলেন—তা হলে সবাই মিলে বললেই হয় ওগো অর্ধাঙ্গিনি, তুহুঁ মম শ্যাম সমান।

মদন বলে—খুড়োর লিঙ্গ জ্ঞানই নেই। শ্যাম তো পুরুষ।

ওই হল নারীপুরুষ সমান সমান।

ইসমাইলসাহেব এতক্ষণ চুপ করেই ছিলেন। বেচুবাবুর কথা শুনে তার নীরবতা ভেঙে গেল, বললেন—তা হলে এবার থেকে আপনার চিনির বরাদ্দ ছেঁটে লবণ এক প্যাকেট বাড়িয়ে দেব।

কেন?

নুন চিনি তো সমান সমান, দুটোই তো ক্রিস্টাল।

না ভাই ইসমাইলসাহেব, ওটা করতে যেয়ো না। তা হলে আর ঘরে ঢুকতেই দেবেনা। উনি এমনিতেই সারাদিনে রাত্রে যাকে বলে ত্রিসন্ধ্যার মতো তিনবার ঝাঁটা মারবেন বলেন।

না না, ওটা আসলে আপনাকে ভালোবেসে বলে।

যাও না একদিন। তোমার দাঁড়ি ছিঁড়ে দেবে।

মদন খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে ওঠে। তার হাসি দেখে সবাই হেসে ওঠে, বেচুবাবু ছাড়া।



শাদি হয়েছে শওকতের। সেলিম সাবিনার পছন্দের পাত্রী তমান্নার সাথেই। শাদির পর একটা নতুন ফ্ল্যাটে উঠে গেছে শওকত, তমন্না। নতুন ফ্ল্যাট। গোছগাছ করতে হবে, সাজাতে হবে। তাই শওকত ডেকে পাঠিয়েছে সেলিম সাবিনাকে। আরও একটা উদ্দেশ্য। সোমশংকর রায়ের চিকিৎসায় অনেকটা ভাল আছে সাবিনা। তাকে একবার দেখিয়েও নেবে।

এতগুলি উদ্দেশ্য নিয়ে কলকাতায় এসেছে সাবিনা সেলিম। আসার দিন দেখেছে বিরাট মিছিল চলছে কলকাতায়। শামিল হয়েছে সরকারী কর্মচারী, আধাসরকারি কর্মচারী, সংগঠিত অসংগঠিত শ্রমিক। রাস্তায় গাড়ি প্রায় নেই বললেই চলে।

দূরদূরান্ত থেকে আসা মানুষরা হাপিত্যেশ করে দাঁড়িয়ে আছে হাওড়া ব্রিজের কাছে। যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেলিম, সাবিনা। তাদের আলোচনায় হতাশায় সুর।

কেউ কেউ বলছে—কলকাতায় সবই আছে কিন্তু বড্ড বেশি শৃঙ্খলার অভাব। এখানে জরুরি কোনো কাজে এলে হবে কি না তার ঠিক নেই। জ্যাম জ্যাম আর জ্যাম। যদিও বা কষ্ট করে সরকারি দপ্তরে পৌঁছোনো যায়, গিয়ে দেখা যাবে দফতর আছে, চেয়ার আছে, টেবিলে ডাঁই হয়ে আছে ফাইল, যারা করবে তারাই নেই।

একজন তো বলেই বসল—এই যদি কর্ম সংস্কৃতির নমুনা হয় তাহলে কেন ফালতু ফালতু এসব বলা।

মিছিলে স্লোগান উঠেছে—বামফ্রন্ট চলছে চলবে। বলছে কর্মসংস্কৃতি ফেরাতে হবে ফেরাতে হবে। হায় হায় দিদিভাই এবার নয় নেভার, কোথায় গেল এবার।

হাঁটছে সেলিম সাবিনা। হাঁটছে অসংখ্য মানুষ। তাদের চোখে অসহিষ্ণুতা, একরাশ বিরক্তি। তারা কোনো আশার বাণী শুনছে না। শুনছে সদম্ভ স্লোগান।

কলকাতায় কয়েকদিন কাটাল সেলিম। বাড়িতে বসে সময় যেন কাটতে চায় না। এখানে তো আর মদনের দোকান নেই। সকাল বিকাল বেরিয়ে পড়তো রাস্তায়। এই কদিন পরিচয় হল অনেক মানুষের সাথে। তাদের মধ্যে শিক্ষকও ছিল। কোনো কোনো শিক্ষক নেতার সাথেও পরিচয় হয়েছিল সেলিমের। দেখেছিল, তারা স্কুল পালিয়ে সংগঠনের কাজে ব্যস্ত রেখেছে নিজেদেরকে। ছাত্রছাত্রীরাও জেনেছে স্কুলে কিছু হয় না। হয়তো হবেও না আর, তারা বা তাদের অভিভাকরা ছুটছে কোথায় ভালো শিক্ষক পাওয়া যায়। কেন-না ছেলে-মেয়েদের থেকেও বেশি স্বপ্ন তাদের অভিভাবকদের চোখে।

অফিস পাড়াতেও একই অবস্থা, কাজ করে না অনেকেই। যারা দায়িত্বশীল, যারা ভাবে সমাজকে দিতে হবে অনেককিছু, তারা ছাড়া। সাধারণ মানুষের মনে জমছে ক্ষোভ। তাদের ক্ষোভের মূল্য দেবে এমন কেউ নেই বললেই হয়। অথচ সপ্তম বামফ্রন্টের সবচেয়ে আকর্ষণীয় কর্মসূচি ছিল কর্মসংস্কৃতি ফেরানো।

কলকাতা থেকে ফিরে এসে আবির, নয়নার কাছে গল্প করেছিল সেলিম। বলেছিল কর্মসংস্কৃতির সংজ্ঞাটা আমার ঠিক বোধগম্য হল না।

বলেছিল নয়না—দরকার নেই বোঝার। একটা কথা জেনে রাখো সেলিম, সরকারকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে জোরদার করতে হবে সংগঠন। সেখানে একটু এদিক-ওদিক হলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না?

তাবলে ....

আচ্ছা সেলিম, তুমি স্কুল পালিয়ে মিটিং মিছিলে যাওনি? নাকি আজ দলের সক্রিয় সদস্য নয় বলে সমালোচনায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছ। আরে বাবা ওভাবে হিসেব হয় না।

তার মানে তুমি বলছ, আগে রাজতোষণ, তারপরে প্রজামনোরঞ্জন! তা হলে তো তুমি সেই রাজতন্ত্রের দেশের বাসিন্দা হয়ে গেলে।

মজা করে আবির—আরে বাবা জংলি ছিটের জামা তো দেখেছ? কত সুন্দর দেখতে। আসলে ওটা কিন্তু সেই সুতি বা নাইলন অথবা টেরিকটনের। আমরা শুধু "খুব ভালো" বলার মালিক।

হঠাৎ করে বদলে যায় আবির। দেখে নেয় নয়নাকে। যে এখন মহিলা সমিতির একজন দায়িত্বশীল নেত্রী। নয়নার চোখে মুখে পাক্কা রাজনীতিবিদের ছাপ।

ইদানীং মাঝে মাঝে অনেক হিসেব করে কথা বলতে হয় আবিরকে, তা না হলেই শুনতে হয়,—তুমি কি বিভ্রান্ত! কখনও শুনতে হয়—তুমি দেখছি বিরোধীদের মতো কথা বলছ। নিজেকে বদলাও আবির।

দেখল আবির—নয়না এখন স্বাভাবিকই আছে। থাকারই কথা, গতকাল মিটিং-এ তার ভূয়সী প্রশংসা করেছে উর্ধ্বতন নেতৃত্ব।

আবির বলে—কি জানিস সেলিম, "কর্ম সংস্কৃতি" আসলে একটা শব্দ। একটা সাহিত্য, একটা সুন্দর গভীর অরণ্য। যা শুনে, যা পড়ে, যা দেখে চমকৃত হতে হয়। যার মধ্যে প্রবেশ করতে হলে দরকার বোধগম্যতা, মননশীলতা, সাহসিকতা। কেউ কেউ যে ঢোকে না তা নয়। তারা বোদ্ধা, সৎ, সাহসী! এই টান টান, রোমাঞ্চকর, ভয় ভয় অবস্থার মধ্যে তারা তপস্যা করে। সেখানেও যে সমস্যা নেই তা নয়। জটিলতা থাকে, দূরাধিগম্যতা থাকে, উর্বশীরা থাকে, যেগুলো তাপসকে বিভ্রান্ত করে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়।

এখন স্বয়ং কৃষ্ণ ধরাধামে এসে বলছেন—ব্যাটা আমি এসেছি। বল তোর কি চাই। অথবা তোর যা যা চাওয়া আমি সব দিলাম, কি দরকার কৃচ্ছ্রসাধনের। কি সেলিম ঠিক বলিনি? কৃষ্ণ তো এখন চাকরিজীবী নেতৃত্বের প্রতি সহৃদয় সুতরাং মাভৈঃ।

একরাশ বিরক্তি নিয়ে নয়না বলে—তোমার কথাগুলো একটু সংযত করো, তা না হলে পস্তাতে হবে।

জানি ম্যাডাম, কিন্তু তুমি কি অস্বীকার করতে পার, যা ঘটছে সেগুলো সব ঠিক।

আবিরের এই কথাগুলোই সেদিন একটা ছোট্ট জনসভায়, জনসভা না বলে বৈঠক বলাই ভালো, বলেছিলেন কুনালবাবু।

সেদিন রবিবার। মদনের দোকানের আখড়ার সবাইকে ডেকেছিলেন তিনি। সেলিম, আবিরকে বিশেষ ভাবে ডেকেছিলেন, বামফ্রন্টের বড়ো শরিক হিসেবে।

কথাটা কি ভাবে জেনে গেছল জোনাল নেতৃত্ব। সঙ্গে সঙ্গে বলে দেওয়া হল, আমাদের কেউ ওই সভাতে যেন না যায়। দরকার হলে ওরা আসবে।

যায়নি আবির। সেলিমের অবশ্য বাধা ছিল না, কিন্তু সেও যায়নি। দূর থেকে শুনেছিল। শুনতে পাচ্ছিল মাইকের মাধ্যমে। মদনের দোকান থেকেই।

কুনালবাবুর বক্তব্য শেষে গুটিকয় লোক যখন হাততালি দিচ্ছিল, তখন দোকানে বসেই একটি মধ্য পঁচিশের ছেলে ওদের তালে তাল মিলিয়ে হাততালি দিয়ে উঠল, ওর অতি উৎসাহ দেখে জিজ্ঞাসা করল আবির—আপনাকে তো চিনলাম না!

পরিচয় করিয়ে দিল মদন—ইনি তো রমজানের ভায়রাভাই।

কি নাম আপনার?

অত্যন্ত বিনয় দেখিয়ে ছেলেটি বলল—আমার নাম শুকুর আলি, বাড়ি হুগলি জেলায়।

তারপর আরও বিনয় দেখিয়ে বলল—কিছু মনে যদি না করেন তা হলে আপনি আমাকে 'তুমি' বলে ডাকবেন, বয়সে আপনার থেকে অনেক ছোটো।

এরপর শুরু হল অন্যান্য পরিচয় পর্ব। শুকুর আলি জানাল সে একটা হাই মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করে। সদ্য বিবাহিত।

তা তুমি ....

মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক করতাম, এখন ফরওয়ার্ড ব্লক করি।

হঠাৎ হাততালি দিলে কেন?

আসলে যিনি বক্তব্য রাখছিলেন তার প্রতিটি কথাই একদম সাচ্চা বাত। জানেন খুব ইচ্ছে করছে ভদ্রলোককে দেখতে।

যাও না দেখে এসো।

যাব বলছেন? তা হলে ঘুরেই আসি।

সত্যি চলে গেল শুকুর আলি। একটু পরেই ফিরে এল। এসে বলল—জানেন, আমাদের ওখানে হলে বহু মানুষ জমত।

তাই!

সে তো বটেই।

শুকুর আলির সদম্ভ কথা শুনে কেউ কোনো মন্তব্য করেনি। তা ছাড়া কুনালবাবু তো কিছু ভুল বলেনি। তিনি বলছেন নাভিশ্বাস উঠেছে কর্মসংস্কৃতির। কাজ বন্ধ ধর্মঘটে, জমায়েতে, বিরোধীদের বাড়াবাড়িতে কাজবন্ধ। কাজ করতে মন চায় না বলে কাজ বন্ধ। আদালত বলছে চলবে না এসব, কিন্তু শুনছেটা কে। ওরা তো আদালতকেও বুড়ো আঙুল দেখায়।

সেদিন কুনালবাবু বললেন, আজ সেলিম বলল—হচ্ছেটা কি?

রে রে করে উঠেছিল নয়না—তুমি দেখছি যত দিন যাচ্ছে তত প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে যাচ্ছ। আর আবিরের মাথাটাও খাচ্ছ।

প্রতিবাদ করে ওঠে আবির—সেলিম খাবে কেন? এটা তো তোমারও মনে হওয়া উচিত। তাছাড়া তোমাকে তো কোথাও কোন অফিশিয়াল কাজে যেতে হয়নি। বুঝবে কি করে? গেলে বুঝতে এসব ফাঁকিবাজি বন্ধ হওয়া উচিত।

ছাড় তো, যত সব জ্ঞানের কথা, আরে বাবা দাবি আদায় করতে হলে, বিরোধীদের বাড়াবাড়ি বন্ধ করতে হলে, কেন্দ্রের খামখেয়ালিপনা রুখতে হলে এগুলো করতেই হবে। তোমরা করোনি?

তা হলে গণতন্ত্র?

আগে সংগঠন। কথায় বলে, নিজে বাঁচিতো বাপের নাম।

তা হলে তো বলতে হয় আমরা ধর্মীয় মৌলবাদের মতো রাজনৈতিক মৌলবাদের পথে এগিয়ে চলেছি।

এমন সব কথা বলছ, যা কেউ খাবে না।

আচ্ছা নয়না, ধরো আমাদের সন্তান অভীক, সে যদি একই কথা বলে।

নয়নার সবচেয়ে দুর্বল জায়গায় আঘাত হেনেছে আবির। ওখানেই থেমে থাকেনি। যেমন বর্তমান রাজনীতির নীতিই হল বিরোধীকে সবদিকে আঘাত করো, ধনে প্রাণে, মনে, ঠিক সেইভাবেই শেষ আঘাত করল আবির, যা হয়তো আবিরসুলভ নয়।

দল যখন জেনে যাবে, তোমার অভীক তোমার বিরুদ্ধে বিরুদ্ধবাদীদের সাথে একই আসনে বসেছে। তখন তোমার কি হবে, একবারও ভেবেছ?

এইমাত্র রৌদ্রঝলমল আকাশ ছিল। ছিল পেঁজাতুলো মেঘ, নীল আকাশ,

পৃথিবীতে বইছিল মিষ্টি দক্ষিণা বাতাস। হঠাৎ গ্রহণ লাগল সূর্যে। তার সাথে যুক্ত হল একটা ঝড়ের রক্তিম মেঘ। কেমন যেন অস্বস্তিকর আবহাওয়া, অসহ্য করা।

নয়না কেঁদে ফেলবে না তো স্বপ্ন ভঙ্গের সম্ভাবনায়। না, কাঁদেনি নয়না। পাক্কা রাজনীতিবিদের মতো সবকিছু কষ্ট করে হজম করে অনুরোধ করল আবিরকে, যেমন খুব শক্ত প্রতিপক্ষকে আর এক শক্ত প্রতিপক্ষ অযথা রক্তক্ষরণ এড়িয়ে যেতে সন্ধি প্রস্তাব পাঠায়।

আবির, তুমি অভিককে বোঝাও, ও যে পথে হাঁটছে, ওটা সঠিক পথ নয়। ওকে ফিরে আসতে বলো, নইলে ....

ও আসবে না নয়না। সদ্যযুবক মন খুব বেশি স্পর্শকাতর। ওরা বাধা মানে না, বাধা দিলে বাঁধ ভাঙার খেলায় মাতে।

আমার কথাই ভাবো না। আমি তখন সদ্য কলেজে ঢুকেছি। তার আগেই যাকে বলে দীক্ষা নিয়েছি মার্কসীয় ভাবনায়। প্রাথমিক ভাবে বাড়িতে কেউ জানত না। একদিন সব জানাজানি হয়ে গেল। তীব্রভাবে বাধা দিল আমার বাড়ির সবাই। এমনকী পাড়া প্রতিবেশীদের কেউ কেউ। ঠিক তুমি আজ অভীককে যেভাবে বাধা দিতে চাইছ। শুনিনি কারও কথা, কেন জানো? সে আমার ভালোবাসা, অভীকও হয়তো ভালোবাসে।

তার মানে তুমি ...

শুধু আমি নয় নয়না। প্রতিটি জীবনই একটা আদর্শে বিশ্বাসী। সে বা তারা চেষ্টা করে তার প্রতিপক্ষকে আঘাত হানতে। পর্যুদস্ত করতে। এই যে তুমি, আমি, সেলিম, বা আমাদের মতোরা, যারা দেখেছিল একটা শ্রেণির মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে, শোষিত হচ্ছে। আমরা চেয়েছিলাম, চাইছি এসব মানুষকে সংঘবদ্ধ করে কায়েমি স্বার্থের বিরুদ্ধে আঘাত হানতে। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে। অথচ দ্যোখো সেই আমরা, আমাদের মতাদর্শ গাঁটছড়া বাঁধছে তাদেরই সাথে, যাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম। ঠিক এই জায়গা থেকেই বিবেকতাড়িত হচ্ছে অভীক বা অভীকরা।

কিন্তু ইতিহাস। যেখানে উন্নয়নের জন্য হাত মেলাতে হয় ওদের সাথে। .....

জানি তুমি কি বলতে চাইছ, কিন্তু একবার ভেবে দ্যাখোতো ওদের শ্রেণিচেতনার, শ্রেণিচরিত্রের কথা।

সেলিম যেন নীরব দর্শক হয়ে শুনছিল আবির, নয়নার এক অদ্ভুত লড়াই। ওদের রাজনৈতিক মতাদর্শগত ভুলভ্রান্তির শুদ্ধিকরণের লড়াই। সহ্য হল না সেলিমের।

কারণ নয়না বাস্তব থেকে সেরে গিয়ে এমন একটা তত্ত্ব খাড়া করছে যাতে করে মনে হওয়া খুব স্বাভাবিক, বামপন্থীরা তোষণ প্রক্রিয়াকে বিশ্বাস করে না।

সেলিম আজ দলীয় সদস্য নেই। খোলা চোখ, খোলা মন তার, দায়বদ্ধতা হয়তো আছে। কিন্তু দায়িত্ব নেওয়ার কোন নির্দিষ্ট নির্দেশ নেই। ঠিক সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সেলিম বলে—মাঝে মাঝে কি মনে হয় জানো নয়না, আমরা সবাই বোধহয় মানুষকে বিভ্রান্ত করছি দিল্লির লাড্ডু দেখিয়ে।

নয়না দেখল সেলিমকে। দেখল আবিরকে। একই মেরুর তিনজন, অথচ যুক্তি বিন্যাসে, ভাবনায় কত যেন পার্থক্য, কিন্তু কেন? সেটা বোধগম্যতায় আনতে পারছে না।

তাই হয়তো জিজ্ঞাসা করল—সেলিম, তুমি কি বলতে চাইছ, আমরাও নিজেদেরকে আড়ালে রেখে সাম্প্রদায়িক তাস খেলছি?

তুমি ওভাবে নিচ্ছ কেন?

তুমি তো নিতে বাধ্য করছ।

নয়না, তুমি একবার খোলা চোখে তাকিয়ে দ্যাখো আমাদের দেশ এই ভারতবর্ষকে। এটা তো একটা দেশ, এই দেশের একটা আইনসভা আছে। তার দ্বারা রচিত আইন হওয়া উচিত জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সর্বজনগ্রাহ্য। কিন্তু হচ্ছে কোথায়। একই দেশে বসবাসকারী এক একটি সম্প্রদায়ের জন্য এক একরকম নিয়ম ও আইন। এবার রাজনৈতিক ব্যাপারে দ্যাখো—সেখানে আছে তোষণ প্রক্রিয়া। এটা কেন বলো তো?

হাসছে আবির, সে যেন দেখছে দুটো মুরগির পায়ে বাঁধা আছে ধারালো ছুরি। তারা পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে তাদের মাথায় লালটকটকে ফুলটাকে সোজা করে রেখে লড়াইয়ে নেমেছে। নিজে যেন লড়াইয়ের মাঝে থেকে দুটো মুরগিকে উৎসাহিত করছে একটা জমাটি লড়াই উপহার দেওয়ার জন্য।

বলে আবির—তুই এতবড়ো, ঝানু রাজনীতিবিদ হয়ে সরল কথাটা বুঝতে পারছিস না। আরে বাবা সবই ওই ভোটের কথা মাথায় রেখে।

আবিরের কথাটা যেন কানে যায়নি সেলিমের। সে যেন ব্যাঘ্রবিক্রমে আজ ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়, জমে যাওয়া অনেক না বলা কথা উগরে দিতে।

আচ্ছা নয়না, তুমি বল তো, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কেন পাশ করতে দেওয়া হল না। কেন সবাই হাঁটল তোষণ প্রক্রিয়ায়।

সায় দিল আবির—সংখ্যালঘু ভোট যে নির্ণায়ক ফ্যাক্টর।

এই যে আমরা, বলছি সংরক্ষণ ব্যবস্থা থাক। আমরা কি একবারও মেধার কথা ভেবেছি, ভাবিনি! ভাবিনি সব সম্প্রদায়, সব জাতি, উপজাতি, সংখ্যালঘিষ্ঠ, সংখ্যাগরিষ্ঠ, তফশিলি সবাইকে শিক্ষার আলোতে নিয়ে এসে সমান চেতনায় উদ্ভাসিত করার কথা বা পরিকল্পনা করতে। বলো তো নয়না, আজ স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরেও ভারতে স্বাক্ষরতার হার এত নীচে কেন?

নয়না বলে—এটা তো কোনো জাদুমন্ত্র নয়, যে একদিনে সবকিছু হয়ে যাবে, তা ছাড়া আমরা তো মাত্র তিনটে রাজ্যেতে আছি। সমগ্র ভারতের ব্যাপারে আমাদের কিই বা করার আছে, আমরা চেষ্টা করছি। হয়তো কিছু ব্যর্থতা আছে।

আবির বলে—সে কী গো, ব্যর্থতা বলছ কেন, আমরাতো হারিকেন, শ্লেট পেনসিল, শিক্ষক, মাঝে মাঝে মাসোহারা সবকিছু দিচ্ছি। তারপরেও যদি সংরক্ষিত আসন ভরাট না হয়, কী বা করা যাবে।

তারপরেও সবাই চাইছে সংরক্ষণ। এটা কি তোষণ নয়? তারপরেও অভীকরা যদি অন্ধ বিশ্বাসে হাত তুলে দেয় সেটাই হবে লজ্জার কথা।

নয়নার সুন্দর দুটো চোখে লাল আভা। গোলাপি দুটো গালে কে যেন চাবুক মেরে লাল দাগ কেটে দিয়েছে। ফুঁসছে নয়না। সে যেন প্রথম ভাদ্রের নদী হয়ে যাচ্ছে, সে যেন বোবা হয়ে যাচ্ছে।

দেখছে নয়না সেলিমকে। যে একজন মুসলিম হয়েও মেনে নিতে পারছে না তাদের প্রতি কোনো দল বা সরকারের তোষন প্রক্রিয়া। তার মনে হচ্ছে এটা তোষন নয়, স্রেফ করুণা।

ভাবছে নয়না, এই সেই আগের সেলিম তো! নাকি অন্য কেউ।

থামছে না সেলিম। যেমন কালবৈশাখী ঝড় সহজে থামতে চায় না, সব লন্ডভন্ড না হওয়া পর্যন্ত। সব উড়িয়ে না নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত। উড়িয়ে নিয়ে যায় ঠিকই, কিন্তু জমে থাকা আর্বজনাও তো পরিষ্কার করে দেয়। রেখে যায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পৃথিবী।

বলে সেলিম—এই যে তোমার অভীক, তুমি কি নিশ্চিন্ত, হাইফাই রেজাল্ট করে উচ্চশিক্ষিত হওয়ার পরে সে চাকরি পাবেই। এমন নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারবে! পারবে না। সেখানে হয়তো সংরক্ষণ নামক শব্দ আটকে দেবে মেধা নামক শব্দকে।

যদি কিছু মনে না করো, আমি তোমাকে সাবধান করে দিতে চাই নয়না, এবং

আমাকে দেখে শিক্ষা নিতে অনুরোধ করি। অন্ধ অনুসরণ করতে যেয়ো না। এমন একদিন আসবে যেদিন তোমার সব স্বপ্ন মুখ থুবড়ে পড়বে। তুমি যেন ভুলেও ভেবো না ওই বোকা বাক্স চিরকাল বোকা হয়েই থাকবে।

নয়নার ঘরে আজ ভারী আবহাওয়া। যা হওয়ার কথা ছিল না, অভীককে নিয়েই এটা হল। একটি অভীককে নিয়ে একটি ঘরে। এমন হাজার হাজার অভীককে নিয়ে তো হাজার হাজার ঘরে এভাবেই চলছে ভারী হয়ে যাওয়ার কাহিনী। কি হবে আগামী দিন।

হাঁপিয়ে উঠছে নয়না, সেলিমই যেন সবকিছু ওলট-পালট করে দিচ্ছে। অথচ এখানে যেটা হয় একটুকরো রোদ্দুর, একঝলক মিষ্টি দক্ষিণা বাতাস, স্নান সারা। শুধু এখানেই বা কেন, সেলিমের বাড়িতেও তো তাই হয়।

ভাবছে আবির, এবার থেমে যেতে হবে। থামিয়ে দিতে হবে এই যুদ্ধ। উড়িয়ে দিতে হবে সাদা নিশান। তারই প্রস্তুতি সারল আবির।

এই নয়না, এবার একটু চা খাওয়াবে?

নয়নাও জানে সেলিম ঠান্ডা হয় এই একটি মাত্র ওষুধেই।

বলে নয়না—সত্যি একেবারেই ভুলে গেছলাম। কিগো সেলিম চা খাবে তো? নাকি আজ শুধু কথার উপরে কথা, তার উপরে কথা দিয়েই কেটে যাবে সমস্ত সময়।

না না, তুমি চা করে খাওয়াও, আমি মুখে আগল দিলাম।

হাসল নয়না, অনেকটা সময় পরে, এরপর চা, ভাল ককটেল।

চা করে আনল নয়না। চা খেল তিনজনেই। খাওয়া শেষ করে সেলিম যেন ব্যস্ত হয়ে উঠল।

আরে, এতক্ষণ বসে আছি, বাড়ি ফিরতে হবে যে!

আমিও তো বেমালুম ভুলে গেছি। আজ আমার মিটিং ডাকা আছে।

তিনজনই বেরিয়ে পড়ল বাড়ির থেকে। নয়না যাবে মিটিং করতে, সেলিম বাড়ি, আবির যাবে সেলিমকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসতে।

যেতে যেতে সেলিম বলে—কি গো নয়না, আজ মিটিং-এ মন বসবে তো? নাকি সব গুলিয়ে যাবে।

কি ভাবলে আমাকে। আমি কার মেয়ে জানো তো?

কাল সব জানতে পারব।

তাই জেনে নিয়ো।



আবির গেটের দরজা খুলে রেখে বসে আছে বারান্দায়। শুধু বসে নেই, আকণ্ঠ পান করে চলেছে মিষ্টি জোৎস্নাটাকে। যে জোৎস্না নিজেকে মেলে ধরেছে আবিরের উঠোনে। যেমন নিজেকে মেলে ধরত সদ্যবিবাহিতা নয়না নিজের বিছানায়। স্পর্শ করত না আবির। কেবল পান করত তার সৌন্দর্য। সমস্ত ঘরটাকে নাইট বালবের নীল আলোয় ভরিয়ে দিয়ে।

এই হালকা শীতে বারান্দায় বসে গুনগুন গান গাইছে আবির।

তার খেয়াল নেই নয়না এসে দাঁড়িয়েছে তার পিছনে, নয়নাও তাকে জানায়নি। কারণ সেও শুনছিল আবিরের গান, যেমন জোৎস্না শুনছিল। শুনছিল শীতের উত্তুরে বাতাস, গেটের ওপারে কৃষ্ণচূড়া গাছটা।

কিন্তু কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে নয়না। প্রায় পাঁচ মিনিট হয়ে গেল।

বাধ্য হয়েই ডাকল—কি গো, এই ঠান্ডায় এখানে বসে বসে গান গাইছ?

চমকে ওঠে আবির। যেমন চমকে ওঠে কোনো যোগী, উর্বশির উপস্থিতিতে।

সমস্ত জোৎস্না শরীরে মেখে নয়না আবিরের পিছন থেকে এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। প্রাথমিক চমক শেষ করে আর এক চমকে চমকে গেছে আবির। নয়না পরে আছে হলুদ রং-এর শাড়ি, সেই শাড়ির উপরে নিজেকে লেপটে দিয়েছে জোৎস্না, ভীষণ মোহময়ী লাগছে নয়নাকে। নয়নার শরীর থেকে হালকা পারফিউমের ঘ্রাণ আরও মোহময়ী করেছে রাত্রি দশটার নয়নাকে। তাকিয়ে আছে আবির সেই নয়নার দিকে।

হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করে নয়না—কি গো কার কথা ভাবছিলে?

ভাবছিলাম না, তোমাকে দেখছিলাম।

সে তো এখন। একটু আগে, যখন গান করছিলে?

সেও তোমাকে, তবে কল্পনায়।

নাকি বুড়ো বয়সে কারও প্রেমে মজেছ।

সে তো তোমারই। অবশ্য আরও একজনের। জানো সেও তোমার মতোই, ছাড়তে চাইছে না। আমাকে জড়িয়ে ধরে বসে আছে।

সে কি গো, এমন ভাগ্যহীনা কে আছে, যে তোমার মতো বুড়োকে জড়িয়ে ধরে আছে।

আরে, ওই যে জোৎস্না।

তাই!

জানো কবিতাও আসছিল। তাকে ধরার চেষ্টা করছিলাম, সে শুধু হারিয়ে যাচ্ছিল। তাই চেষ্টা করছিলাম তাকে সুরে বাঁধত।

কবিতাও আসছিল!

হ্যাঁগো।

তা হলে তো দেখছি আমাকে কোর্টে যেতে হবে।

কেন?

তিন সতিন নিয়ে ঘর করা যায় নাকি! আমি বুড়ি হয়ে গেছি, তাই ডিভোর্স করে এখান থেকে চলে যাই।

কেন, থাকতে পারবে না, তিনজনে মিলে।

না বাবা, এত মনের জোর নেই।

জোৎস্না আর কবিতাকে যদি বলি, তোমাদের স্থান নয়নার পরে, তা হলেও থাকবে না?

ভেবে দেখতে হবে, তা হ্যাঁগো কবিতাটা কেমন?

বর্ণনা দেব? সহ্য করতে পারবে তো? তোমার ইদানীং যা হিংসে বেড়েছে।

বাঃ, তুমিই তো বললে ওরা পরে আসবে।

তা হলো শোনো।

শুরু করল আবির

আমি ভাসছি জ্যোৎস্নার ডানায় ভর করে
আমার বুকে মাথা রেখে
শুয়ে আছে কবিতা
এলোমেলো ....

বাঃ বেশ সুন্দর তো, তারপর?

আর আসল না, ওটাকে সুরে বাঁধলাম, তারপর তুমি আসলে।

তার মানে?

এই নয়না, বসবে এসো, একবারটি।

কেন?

এসো না বলছি।

কাছেই তো আছি।

আরও কাছে, আমার নিশ্বাসের কাছাকাছি।

কেন, বলবে তো?

কবিতাটাকে আটকে রাখতে।

আমি? সতিন কে!

হ্যাঁ।

এই এখন, এই সন্ধেতেই।

কোথায় সন্ধে, এখন তো রাত্রি সাড়ে দশটা।

সত্যি, তোমার বয়স যত বাড়ছে ....

না বলো না।

ওঠো তো, খাবে চলো।

পরে, আরও পরে। জানো নয়না, মনে হচ্ছে, এই জোৎস্নার ডানায় ভর করে আবার নতুন করে উড়ে যাই, যেখানে তোমার আমার জন্য বাসা বাঁধা আছে। যেখানে রাজনীতির নীতিহীনতাকে মানুষের সমাজে জোর করে ছড়িয়ে দেওয়া নেই। মগজ ধোলাইয়ের জন্য হাজার মিথ্যার রোশনাই নেই। নেই অন্তর্দলীয় কোন্দলে বিড়ম্বিত হওয়ার অন্যায্য যন্ত্রণা। মানুষকে ভুল বুঝিয়ে লড়াইয়ের ময়দানে পাঠিয়ে দেওয়া। আচ্ছা নয়না আমরা যদি রাজনীতিটা ছেড়ে দিই। মিশে যাই আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের সাথে ....

হঠাৎ এসব মনে আসছে কেন?

ভালো লাগছে না নয়না। মনে হচ্ছে মূলস্রোতটা ভাগ হয়ে গেছে। তৈরি হয়েছে আর একটা নদী, যার জল ঘোলাটে। সেই নদীটাতে বয়ে চলেছে বেশিরভাগ জল। মূল নদীটাতে জমছে স্তূপ স্তূপ বালি। তাকে সংস্কার করার ইচ্ছে নেই কারও, ইচ্ছে

নেই ঘোলাজল নদীটাকে বেঁধে দেওয়ার। ওই নদীটার জল পাক খাচ্ছে, ভেঙে দিচ্ছে মাটি।

অবাক হয়ে যাচ্ছে নয়না আবিরের হতাশার কথা শুনে। ভয় পাচ্ছে নয়না, সত্যিই কি নদীটা ভাগ হয়ে যাচ্ছে। সেদিকে বইছে ঘোলা জল, ভেঙে দিচ্ছে মাটি।

নয়নারও যেন খিদেটা কমে যাচ্ছে, অথচ না খেলেই নয়। রাত্রিও বাড়ছে, আবিরের আবার বেশি রাত্রি করে খেলে পেটের সমস্যা হয়। তাই হয়তো বলে চলো, খেয়ে নিই।

কোনো এক দিগন্তবিস্তৃত মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে উদাস পথহারা পথিকের মতো আবির বলে—চলো।

আবির বলছে—চলো, কিন্তু নয়নার দুটো পা যেন আটকে যাচ্ছে নদীর চোরা বালিতে। সে যেন অনুভব করছে এবার তলিয়ে যেতে হবে। কেউ কোথাও নেই তাকে তুলে আনার।

ডাকলো আবির—কি হল, আমাকে ডেকে তুমি দাঁড়িয়ে রয়ে গেলে কেন?

মৃত্যুর আগে শেষ কথা বলার মতো নয়না বলল—হুঁ, যেতে তো হবেই।



কেউ খেতে পারেনি। না নয়না, না আবির। সাদা সাদা ভাতগুলো যেন ওদেরকে দেখে হাসছে। যেন বলছে, তোরা না খেয়ে থাকবি কেন? তাকিয়ে দেখ সবাই খাচ্ছে, পেটভরে খাচ্ছে, নিয়ে যাচ্ছে ছাঁদা বেঁধে।

অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল নয়নার মুখ থেকে—না!

আবির বোধহয় চমকে গেল, অবাক হল আবির—এই নয়না কি হল তোমার! কি হল?

বোধহয় সম্বিতে ফিরল নয়না—কই কিছু হয়নি তো।

আমি যে স্পষ্ট শুনলাম তুমি 'না' বললে।

না তো, তুমি বোধহয় ভুল শুনেছ।

তা হলে তাই। নাও, খেয়ে নাও অনেক রাত্রি হল।

অনেক রাত্রি! তাই না আবির। গভীর রাত্রি। থিক্ থিক্ অন্ধকার। নিস্তব্ধ, অব্যক্ত, তারপর কি হয় আবির।

তাকিয়ে আছে আবির নয়নার দিকে, এক অন্য নয়না যাকে কোন দিন দেখেনি।

কি হল আবির, তুমি কি দেখছ? কিছু বলছ না কেন? কিছু তো বলো?

কী বলার আছে, নয়না, আমিও তো জানি না।

সাজানো ভাতের থালা এলোমেলো। খেতে পারেনি কেউ। উঠে পড়েছে দুজনেই। ভাতগুলোর হাসি উপেক্ষা করে একসময় বিছানায় গেছে দুজনেই। কিন্তু ঘুম আসেনি।

নয়না ভাবছে সেলিমের কথাগুলি। কখন যে ভোর এসে কড়া নেড়েছে রাতের দরজায়। কখন যে কে এসে টকটকে লাল রং ঢেলে দিয়েছে পূবের আকাশে জানে না ওরা। সেই রং জানালার ফাঁক বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে আবির নয়নার ঘরে।

প্রথম খেয়াল হল নয়নার। লেপের তলা ছেড়ে বেরিয়ে এসে এই শীতেই পূবের জানালা খুলে দিল নয়না।

ঠিক তখনই সেই লাল রং তার অজস্র হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরল নয়নাকে। জড়িয়ে ধরল ড্রেসিং টেবিলের সাথে সেট করা ঢাউশ আয়নাটাকে।

দুটো কোকিল ডাকছে প্রাচীরের ওপারে কৃষ্ণচূড়া গাছটার ডালে।

সমস্ত রাত্রি না ঘুমোনোর ক্লান্তি আর লেপটা যেন ছাড়তে চাইছে না আবিরকে। দুটো চোখ জ্বালা করছে আবিরের। নয়না বসে আছে, তার চোখ আয়নার দিকে।

চোখ বন্ধ রেখেই ডাকল আবির—নয়না, শুনতে পাচ্ছ?

ভোরের গান।

অনেক দিন যেন শুনিনি।

আমারও শোনা হয়নি।

জানো নয়না, আবার ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে অভীক পৃথিবীর আলো দেখার আগের দিনগুলোতে! নতুন করে মনের মধ্যে একটা নীড় গড়তে ইচ্ছে করছে।

আমরা যে অনেক বুড়ো হয়ে গেছি আবির।

পৃথিবীটাও তো বুড়ি হয়ে গেছে, অথচ দ্যাখো রাত্রি আসে আগের মতোই, ভোর হয়, পুব আকাশ লাল হয়। সেই লাল রং পড়ে তোমার মুখে। পৃথিবীর গাছের মাথায় মাথায়। সকাল হয়, দুপুর আসে। আগুনে দুপুর, বিকেল আসে। আমাদের মতো বিকেল, সন্ধে নামে।

আবির!

বলো?

তুমি এখন কোন দলের?

তুমি কি সত্যিই সেই দিনগুলো ফিরিয়ে আনতে চাইছ?

তখনও কোকিল দুটো ডালে বসে ভোরের সুরমূর্ছনায়।

নয়না উঠে গিয়ে বন্ধ করে আসল পুবের জানলাটা। জানলার ফাঁক বেয়ে তখনও হালকা লাল আলো এসে যেন সাজিয়ে দিল নয়নাকে। ফিরিয়ে দিল প্রথম রাত্রিটা।

আবির বলল—নয়না, আজ কিন্তু খাট সাজানো নেই রজনিগন্ধায়, লাল গোলাপে।

নাই বা থাকল...



সেলিম বিশ্বাস করে একটি দেশ শুধুমাত্র কৃষিনির্ভর হয়ে সমৃদ্ধ হয় না। শিল্প এবং কৃষির যুগলবন্দিই পারে পূর্ণ সমৃদ্ধি আনতে। যা দেখিয়েছে চিন, জাপান এবং এমন অনেক দেশ। প্রথমে ছোটো, মাঝারি শিল্প, তারপর বড়ো শিল্প, এই প্রক্রিয়ায়। যেমন ধর্ষণ করে মন পাওয়া যায় না বা সুখী নীড় গড়া যায় না ঠিক তেমনই। চাই ভালোবাসা, মানিয়ে নেওয়া।

কুনালবাবু যতই চিৎকার করুন না কেন অথবা বিরোধী শিবির। কিন্তু সবাই একবাক্যে চায় শিল্প গড়ে উঠুক, সেখানে হয়তো পরিবেশের উপর কিছু খারাপ প্রভাব পড়বে, জনমানবে তৈরি হবে বিভ্রান্তি।

অনুকূলবাবুও তাই চান। কিন্তু একটু অন্যভাবে। তিনি বলেন—আগে দেখতে হবে মানুষ কি চায়, কতখানি চায়, কোথায় চায়। মানুষকে বোঝাতে হবে, একবারে না হলে বারবার। প্রমাণ দিতে হবে সুফল কুফল নিয়ে। তার থেকেও বড়ো কথা বড়ো শিল্প নয়। ছোটো, মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠা করে জনগণের চাওয়াটাকে বাড়িয়ে দিতে হবে বহুগুণ। তখন তারাই বলবে হোক না শিল্প। আমরা রাজি সব কিছু দিতে।

দুহাজার ছয়ের বিদায়ী বাজনা বাজছে সকরুণ সুরে। বিশ্বজুড়ে একটা আতঙ্কের ছায়া যেন কায়া হয়ে নিজেকে মেলে ধরেছে বিশ্বসমাজের উপরে। ন্যায়-অন্যায়

বিচার নেই। সবাই মেতে উঠেছে প্রতিহিংসা চরিতার্থতার খেলায়। দেখছে সবাই, প্রতিবাদগুলোকে বুকে বামহাত দিয়ে চেপে রেখে। প্রতিকার ভাসছে মহাশূন্যে। অথচ এসব প্রত্যাশিত ছিল না। সব যেন চাপিয়ে দেওয়া।

বিশ্বের যত সমস্যা যেন আটকে গেছে পশ্চিমবাংলায় সীমান্তের ওপারে এসে। এখানে মানুষ হাসছে, মানুষ গাইছে। সমস্যা যে নেই তা নয়, সে সমস্যা ভীষণভাবে নগন্য অন্যান্য স্থানে অন্যান্য দেশের সমস্যার তুলনায়। পশ্চিমবাংলা যেন একটা গর্বের স্থান বেশিরভাগ বসবাসকারীর কাছে। তেমনই ভাবছে সবাই। ভাবেনি পশ্চিমবাংলা বিশ্বের শান্তি সংকটের আওতার বাইরে কোনো আলাদা ভূখন্ড নয়। বুঝতে পারেনি ভিত না গড়েই ইমারতের ছাদ ঢালাই-এর কাজ শুরু করেছে রাজমিস্ত্রি, শুরু হয়েছে পক্ষের এবং বিরুদ্ধবাদীদের চাপানউতোর।

সেলিমের চোখ টিভির পর্দায়। বিরুদ্ধবাদীরা বাড়াচ্ছে আন্দোলনের তীব্রতা। সরকারি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ হটানোর চেষ্টা করছে আন্দোলনকারীদের।

যেখানে এই ঘটনা ঘটছে তার পটভূমি সিঙ্গুর। সাবিনার চোখ খবরের কাগজে সিঙ্গুরের ছবির দিকে।

সহ্য হচ্ছিল না সেলিমের। সে তো মনে প্রাণে চায় গড়ে উঠুক শিল্প। পশ্চিমবাংলা শীর্ষস্থানে উঠুক অর্থনৈতিক দিক থেকে। যেখানে অন্যান্য রাজ্যগুলো হু হু করে উন্নতি করছে। সেখানে কেন পিছিয়ে থাকবে এই হতভাগ্য বাংলা।

সেই বোধ এবং বর্তমান ঘটনা দেখে বিরক্ত সেলিম বলে ওঠে—এগুলো হচ্ছেটা কি? এরা কি পুরোনো প্রস্তর যুগে ফিরে যেতে চায়।

সাবিনা উচ্চ মাধ্যমিক পাশ না করলেও পড়েছে পুরোনো প্রস্তর যুগ। পড়েছে তাদের জীবন-জীবিকার কথা। 'প্রস্তরযুগ' কথাটা সেলিমের মুখে শুনে বলে—বেশ বললে তো সেলিম!

কেন? কিছু ভুল বলাম কি?

ভুল কি ঠিক জানি না, তবে প্রয়োগস্থলটা বোধহয় ঠিক বাছা হয়নি।

কেন?

এখন কেউ কাঁচা মাংস খায় না। পাথরের অস্ত্র নিয়ে লড়াইও করে না। অথবা একজন মাত্র সর্দার দলকে নিয়ন্ত্রণ করে না।

সেটা অবশ্য ঠিক বলেছ। তবে আমি তো ওভাবে বলতে চাইনি। আমার বক্তব্য ছিল মানুষ সামনের দিকে না তাকিয়ে পিছনে হাঁটার কথা ভাবছে কেন?

তোমরা যদি দুম করে ঘুসি চালাও তার ফলতো এমন হবেই। তোমাদের উচিত ছিল প্রচণ্ড জোরে মারার আগে ছোটো ছোটো ঘুসি মেরে অভ্যেসটা করিয়ে নেওয়া।

হাসে সেলিম, সাবিনার বুদ্ধিমত্তা দেখে। কথাটা তো খুব একটা মন্দ বলেনি সাবিনা। ওই ভাবে এগিয়ে গেলে হয়তো এতবড়ো আন্দোলন হত না। কিন্তু সে তো সময়সাপেক্ষ। ততদিনে যে হারাতে হবে অনেক কিছু।

খবরের কাগজ দেখছে সাবিনা। সাদ্দাম হোসেনের বিচার হবে। আমেরিকা চায় তার মৃত্যুদণ্ড। অপরাধ—প্রাথমিকভাবে পরমাণু অস্ত্র রাখা। সর্বশেষ অপরাধ কুর্দ গণহত্যা।

পড়তে পড়তে আপনমনেই বলে ওঠে সাবিনা যত সব বাজে অজুহাত। ওদের আসল উদ্দেশ্য তেল সমৃদ্ধ একটা দেশকে নিজেদের দখলে আনা। তারই উদ্দেশ্যে এক এবং অবিসম্বাদিত সম্রাটকে শেষ করে দেওয়া।

সেলিম শুনল সাবিনার কথা কটি। মনে মনে ভাবছে সেলিম—সাবিনা শুধু বুদ্ধিমতীই নয়, ওর দূরদর্শিতারও কোনো জবাব নেই। সাহসও আছে বলতে হয়, তা না হলে আমেরিকার বিরুদ্ধে এত বড়ো কথা। ভাগ্যিস এখানে কোনো আমেরিকান নেই। থাকলে সে নিশ্চয় সাবিনার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কিছু ব্যবস্থা নিত।

সাবিনা পুরো খবরটা গিলছে গোগ্রাসে। শেষ করে বলছে—ছিঃ ছিঃ।

হাসছে সেলিম। বলছে সেলিম—তুমি ঠিকই বলেছ সাবিনা। ওদের আগ্রাসন নীতি এবং তেলের ভাণ্ডারের প্রতি লোভ ওদেরকে জঘন্য অপরাধ করতে উৎসাহিত করছে।

আচ্ছা আবির, সমগ্র বিশ্ব নিশ্চুপ কেন! কেন বলছে না আমেরিকা এবার থেমে যাও! তা না হলে ওই আগুনেই তোমাদেরকে পুড়ে যেতে হবে।

বলবে না সাবিনা, কেউ বলবে না। কেন জানো? সবারই মেরুদণ্ড বেঁকে আছে।

রাষ্ট্রপুঞ্জ!

ওরা আছে শক্তিমানদের তোষণের জন্য।

সত্যি সেলিম, ভাবতে অবাক লাগে, ওদের মুখ আর মুখোশ দেখে।

অথচ দ্যাখো, সাধারণ মানুষের মধ্যে উঠছে তোলপাড় করা ঝড়। কিন্তু তাদের আবেগের দাম দেবে এমন নেতৃত্ব আজও তৈরি হয়নি।

আশ্চর্য হতে হয়। আমেরিকা বলছে গণহত্যার অপরাধে অপরাধী সাদ্দাম হোসেনকে উচিত শিক্ষা দিতে না পারলে নাকি তাদের এবং বিশ্বের শান্তি হবে না। কিন্তু চিনে যে গণছাত্র হত্যা হল, তখন কি ওরা ঘুমিয়ে ছিল।

ওদের কেউ কিছু করতে পারবে না। কেন জানো? ওরা পরমাণু অস্ত্রধর দেশ, ওরা হাজার অপরাধ সংগঠিত করলেও সাত খুন মাফ হয়ে যাবে। একটা কথা জানো তো? শক্তের ভক্ত নরমের যম।

শক্তরা চিরকাল শাসন করে আসছে নরমদেরকে। এই হল পৃথিবীর ইতিহাস। এখানে আবেগের মূল্য নেই। নেই সততার দাম। তবু মানুষ চেষ্টা করে। শেষ চেষ্টা। জীবনের প্রশ্নে, জীবিকার প্রশ্নে, অধিকারের প্রশ্নে। সেখানে হয়তো থাকে কিছু ভুল। তবুও।

সিঙ্গুরে দিন দিন বাড়ছে আন্দোলনের তীব্রতা। বিস্মিত হচ্ছে সাধারণ শান্তিপ্রিয় মানুষ। বিস্মিত হচ্ছে অনেকেই। তাতে কার বা কি যায় আসে। বিরোধীরা তাদের কাজ করছে। সরকার করছে তাদের কাজ। যাদের জন্য করছে, তারা নিশ্চিন্ত সরকার সব দায়িত্ব নিয়েছে। সুতরাং মাভৈঃ।

দিনটা ১৮ই ডিসেম্বর ২০০৬। আবিরের বাড়িতে আড্ডা জমিয়েছিল সেলিম। অভীকও বাড়িতে ছিল।

শীতটা যেন আজ সেভাবে কামড় দিতে পারছে না কাউকে, হয়তো ইচ্ছেও নেই। নরম শীত।

নরম অভীকও। সেলিমকে বলে—আচ্ছা কাকু, একটা কথা বলব, যদি কিছু মনে না করেন।

এতখানি নরম এবং বিনয়াবনত অভীককে দেখে হাসল নয়না, নয়নার হাসির কারণ জানে আবির, হয়তো আবিরও একটু অবাক হল। হাসল সেও। অভীক দেখল বাবা-মা তাকে দেখে হাসছে। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল—তোমরা হাসছ কেন?

আবির নয়না তাকাল দুজন দুজনের দিকে। ভাবখানা এমন, এবার বোঝো, ঠ্যালা কাকে বলে। কিন্তু কিছু তো বলতেই হবে। তা নাহলে অভীক ভাববে অন্যকিছু। হয়তো অভিমান হবে অভীকের। অথবা রেগে যাবে মা বাবার প্রতি।

দায়িত্বটা নিল নয়নাই। কেন হাসলাম জানিস? তোকে তো এতখানি বিনয় দেখাতে বহুদিন দেখিনি, তাই ভাবলাম ....

তোমরা আমাকে কি ভাব বলো তো?

বুঝতে পারছে আবির, সাপের লেজে পা পড়ে গেছে। কিন্তু কিছু বলল না সে। ভাবল, নয়না যখন লেজে পা দিয়েছে সামলানোর দায়িত্বও তার। কেন খামোখা

নিজেকে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে। ভেবেই তাকাল নয়নার দিকে। হাসল একটু। সে হাসিতে রয়েছে—হল তো, এবার কী বলবে বলো।

আদর্শ মায়ের মতো নয়না অভীকের মাথায়, পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলল কেন? বলতে নেই বুঝি। হ্যাঁরে অভীক, মা-বাবা কি কারও খারাপ চায়। এই যে তুই এত সুন্দর করে জিজ্ঞাসা করলি ....

কথাগুলো হয়তো ভালো লাগল না অভীকের। ভালো লাগল না নয়নার অযাচিত আদর করা। নয়নার হাতটা সরিয়ে দিয়ে অভীক বেরিয়ে যেতে উদ্যত হল আসর থেকে।

বাধা দিল সেলিম—কি হল অভীক, কি বলবে বলেছিলে, বললে না তো?

না থাক আর বলব না। আসলে কি জানো কাকু, মা-বাবা ভাবে আমি বোধহয়...

ওভাবে বলছ কেন। তা ছাড়া প্রত্যেক মা বাবা চায় অনেক কিছু, বলে অনেক কিছু। সে অধিকার তাদের আছে। সব সময় অন্য মানে করতে গেলে মন থেকে শান্তি চলে যায়।

সেলিমের কথায় রয়ে গেল অভীক।

এই একটা মানুষকে ভীষণ ভালো লাগে অভীকের। যে মানুষটা সত্যিকে সত্যি বলেই জানে, তোষামোদ করে না কখনও।

মুসলিম হয়েও মুসলিমদের যা কিছু অন্যায় তার প্রতিবাদ করে। সে জানে, এতে বিরাগভাজন হতে হবে, তবুও।

কেমন যেন হতাশ হয়ে গেছে নয়না। সে বুঝতে পারছে না, মা, ছেলের সম্পর্কটা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। বুঝতে পারছে না কি ভাবে মন জয় করবে অভীকের।

আবিরেব ভাবনায় ওসব নেই। সে বিশ্বাস করে নদী তার পথেই বয়ে যাবে। বাঁধ বেঁধে আটকানো যাবে না, লাভও নেই। সে নদী যদি মনে করে উত্তরাভিমুখ থেকে দক্ষিণাভিমুখবাহী হওয়ার পর পুনরায় উত্তরাভিমুখ হবে, ফিরে যাবে মূল পথে, তাহলে তাই মেনে নিতে হবে। বিশ্বাস করে—অভীক যখন সমাজটাকে বিশ্লেষণ করতে শিখবে, তখনই তার চেতনা তাকে সঠিক পথ দেখাবে।

সেলিম ব্যস্ত, অভীক কি বলতে চায় জানতে। তাই বলে—বলো, কি বলবে বলছিলে।

না তেমন কিছু নয়, তোমাদেরকে নিয়েই বলব ভাবছিলাম।

আমাদেরকে নিয়ে! কেন? আমরা কোনো ....

না, আসলে ভাবছি, অনেকের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে যায়। কারও কারও ঘর ভেঙে যায় অন্যের প্ররোচনায়। কিন্তু দেখে অবাক হচ্ছি, তোমাদের বাঁধন এমন কি দিয়ে বাঁধা আছে যে ছিঁড়ছে না।

যেন নিশ্চিন্ত হয় নয়না। কোনো রাজনৈতিক জিজ্ঞাসা অভীক রাখেনি। রাখেনি বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধীয় জিজ্ঞাসা। হাসছে আবির, অভীকের এই ধরনের প্রশ্ন শুনে।

সেলিম বলছে—ফেভিস্টিক।

হো হো করে হেসে ওঠে নয়না, আবির। অভীকও হাসি চেপে রাখতে পারেনি।

কাকু, তুমি না ....। এই জন্যই তোমাকে এত ভালো লাগে।

বেশ তো, আমাকে যখন ভালো লাগে, তখন আমার কথাও তোমার ভালো লাগার কথা।

ভালো লাগা তো সবদিক থেকেই আসে, ঠিক বলিনি কাকু।

নয়নার হাসিটুকু যেন ডান হাত দিয়ে চেপে দিল অভীক। বুঝতে পারল নয়না, কাকে উদ্দেশ্য করে কথাকটি বলল অভীক। একরকম নিরুৎসাহ, হতাশ হয়ে টিভিটা চালিয়ে দিল নয়না। আবির দেখল নয়নাকে। এক হতাশ মাতৃত্বকে দেখল সেলিম।

রিমোটের বোতাম এলোমেলো ভাবে এলোমেলো মন নিয়ে টিপে চলেছে নয়না। কখনও চ্যানেল এক তো কখনও পনেরো।

অভীক, সেলিম তখন তাদের মধ্যে কথপাকথনে ব্যস্ত। চুপি চুপি বলে আবির কি হচ্ছে, এভাবে চ্যানেল বদলাচ্ছ কেন, একটা জায়গায় রাখো।

বিরক্ত নয়না বলে—খুঁজছি।

কী

তারা নিউজ।

আচ্ছা নয়না, আর কি কোনো নিউজ চ্যানেল নেই এটা ছাড়া? ওতো ওর জন্মলগ্ন থেকেই আমাদের বিরোধিতা করে চলেছে।

না গো, ওর ওই লাইভ টেলিকাস্টগুলো আমরা ভীষণ ভালো লাগে।

দাও। এতদিন টিভি দেখছ এখনও মুখস্থ করতে পারলে না তারা নিউজ কততে।

আবির রিমোট নিয়ে বোতাম টিপতেই ভেসে উঠল তারা নিউজ।

তারা নিউজ তখন দেখাচ্ছে একটা নৃশংস বর্বতার শিকারের ছবি, বার বার।

নিজের অজান্তেই নয়না বলে ওঠে—ইস, মানুষ এতখানি নীচে নামতে পারে!

সেলিম অভীকের যেন ওদিকে খেয়ালই নেই। বিশেষ করে সেলিমের, সে অভীকের সাথে আলোচনায় মশগুল।

আবীর থামিয়ে দিল সেলিমকে—এই সেলিম, এদিকে দ্যাখো, কি সব চলছে।

সেলিম, অভীক তাকাল টিভির দিকে। একটা গর্তের চারিদিকে অনেক মানুষের জমায়েত। পুলিশের উদ্‌বেগ, রিপোর্টার বিবরণী দিচ্ছে অবস্থাটার। মাইক্রোফোন রাখছে কারও কারও মুখের কাছে।

একটি মেয়েকে কে বা কারা মেরে আগুনে আধপোড়া করে অথবা গর্তে ফেলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

থাকতে পারেনি অভীক। সে যেন ছটফট করছে উত্তেজনায়—জানো কাকু, আমি নিশ্চিত, এটা একটা পরিকল্পিত খুন। মানুষকে ভয় দেখানোর জন্য, অথবা মানুষের আবেগকে উসকে দেবার জন্য অথবা বিভ্রান্ত করার জন্য।

সেলিম রাজনীতি করেছে বহুদিন, আজও করে। যদিও সে বহিষ্কৃত। সে জানে মানুষের উত্তেজনাকে কিভাবে প্রশমিত করতে হয়, তখন কি বলতে হয়। তাই হয়তো বলে—যে কারণেই হোক, এটার প্রয়োজন ছিল না।

আবির বলে—এটা প্রেমঘটিতও হতে পারে।

নয়নার ছোট্ট মাতৃসুলভ মন্তব্য—এর কি কোনো প্রয়োজন ছিল!

কিন্তু একটা অন্য ভয় ভর করছিল নয়নার মনে, সে ভয়ের উৎস অভীক। অভীক তারুণ্যে ভরপুর। অভীক এমনিতেই বিরোধী মনোভাবাপন্ন। অভীক মেনে নিতে পারেনি বর্তমান ভোগসর্বস্ব রাজনীতিটাকে। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া যদি চরম আকার নেয় অভীকের মনে, তা হলে তো সমূহবিপদ। আর কোনোদিন তাকে নিজেদের বশে আনা যাবে না।

নয়নার ভাবনা এবং ভয় প্রমাণ করে দিল অভীক—এটা প্রতিষ্ঠান পক্ষ আশ্রিত সমাজ বিরোধীদেরই কাজ। উদ্দেশ্য আন্দোলনের গতি পথকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া।

তারা নিউজ বিশ্লেষণে মেতেছিল তাদের মতো করে। যা ভালো লাগেনি আবির, নয়না বা সেলিমের। তাই হয়তো আবির সেলিম উঠে পড়েছিল টিভির কাছ থেকে। চলে এসেছিল বাইরে।

বাইরে এসে সেলিম আবিরকে বলে—আবির, আমি চললাম রে।

এক্ষুনি চলে যাবি?

হ্যাঁরে, মনটা ভীষণ খারাপ লাগছে।

কী আর বলব। আয় তা হলে।



সেলিম বাড়িতে নেই। একা সাবিনা বসে থেকে অপেক্ষা করতে করতে ভারী হয়ে যাচ্ছিল চোখ দুটো। একটু যে ঘুমিয়ে নেবে তারও উপায় নেই। সেলিম আসবে, গেট খুলতে হবে। ঘুমকে চোখের বাইরে আটকে রাখার জন্য টিভির সুইচে চাপ দিল। আকাশ বাংলা চ্যানেলে ভেসে উঠল একটা সিরিয়াল। এত বেশি টানটান উত্তেজনায় ভরা সিরিয়ালটা, কেমন যেন অস্বস্তি লাগছিল সাবিনার। রিমোটের বোতাম টিপতে টিপতে থামল স্টার আনন্দে।

দেখল সাবিনা একটি নৃশংসতম ঘটনা, আর তার বিশ্লেষণ। বন্ধ করে দিল টিভিটা। কেমন যেন ভয় করছে সাবিনার। মনে মনে ভাবছে এখনও যে সেলিম কেন আসল না কে জানে। ঘামছে সাবিনা একটা চাপা উত্তেজনায়। তার ভাবনাগুলো হঠাৎ যেন হারিয়ে গেল শরীরের যন্ত্রণার উপস্থিতিতে। ভীষণ রাগ ধরছিল সাবিনার। ঘড়ি দেখল সে, এখন রাত্রি দশটা বেজে পাঁচ মিনিট।

একটু গড়িয়ে নিতে ইচ্ছে করছে সাবিনার। ইচ্ছেটাকে প্রশ্রয় দেবে দেবে ভাবছে, সেলিম এসে ডাকল—সাবিনা, গেটটা খুলে দাও।

সাবিনা যেন নিশ্চিন্ত হল সেলিম আসতে। যন্ত্রণাকাতর সাবিনা, ধীর পদক্ষেপে গিয়ে গেট খুলল। সেলিম গেট লাগিয়ে সাবিনাকে দেখেই জিজ্ঞাসা করল—কি গো যন্ত্রণাটা বেড়েছে?

ভীষণ।

সেঁকটাতো নিতে পারতে।

উঠতে ইচ্ছে করছিল না যে।

ওই টুকু পথ গেট থেকে বারান্দা, হাঁটতে পারছে না সাবিনা।

এমনই হয় মাঝে মাঝে। হাত, পা, কোমরের প্রতিটি সন্ধিস্থল তখন তার কথা শোনে না। তখনই মনখারাপ করে সাবিনার। যেমন মন খারাপ করে প্রতিটি বাবা-মায়ের যখন তাদের সন্তান বা সন্তানেরা অবাধ্য হয়।

সেলিম সাবিনার হাত ধরে নিয়ে গেল আস্তে আস্তে, ঠিক যেমন সদ্য হাঁটতে শুরু করা বাচ্চাকে হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে নিয়ে যায় তার বাবা অথবা মা।

সাবিনার মন খারাপ করে। এই বয়সেই যদি এমন হয়, বয়স আর একটু বাড়লে কি হবে। সেলিমও তো ...

আর ভাবতে ইচ্ছে করছে না সাবিনার। তার থেকে হাজার কষ্ট নিয়ে সেলিমের বাহু বন্ধনে হাঁটতে তার যেন ভালোই লাগছে। হয়তো আল্লার কাছে দোয়া চাইছে সাবিনা—এইভাবেই যেন সমস্ত জীবন কেটে যায়।

বারান্দায় ওঠার সময় সেলিম সাবিনাকে একরকম শূন্যে তুলে ওঠাল বারন্দায়। কষ্ট হচ্ছিল সেলিমেরও। কেননা সাবিনা বেশ ভারী হয়েছে। সে কষ্ট বুঝতে দেয়নি সেলিম। কিন্তু সাবিনা বুঝতে পারছে। তাই হয়তো বলে—ছাড়ো আমি ঠিক উঠতে পারব।

পারবে না কেন, হাঁটুটাতে তো লাগবে!

হাসে সাবিনা, এত যন্ত্রণা নিয়েও, বলে—এইভাবে সমস্ত জীবন .....। তুমি পারবে তো?

পারব সাবিনা, তুমি দেখে নিয়ো।

অপটু হাতে সেলিম খাবার জায়গা করছে। খাবার থালা সাজাচ্ছে। ধরে আনছে খাবার টেবিলে। বসে বসে সব দেখছে সাবিনা। তার মুখে লেগে আছে অমায়িক হাসি।

খাওয়া শেষ হল দুজনের। বিছানায় গেল সাবিনা সেলিম।

সাবিনা?

বলো?

আজ একটা যন্ত্রণার ওষুধ, একটা ঘুমের ওষুধ দিই?

দেবে বলছ?

সোমশংকর তো তাই বলেছিল।

তবে দাও। ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে। হ্যাঁগো আজ অমাবস্যা তাই না?

হবে হয়তো।

তাই এত যন্ত্রণা হচ্ছে।

ওষুধগুলো সাবিনার হাতে ধরিয়ে দিয়ে জল দিল সেলিম। ওষুধগুলো খেয়ে সাবিনা বলে—এবার শুয়ে পড়ো। অনেক রাত্রি হল।

তুমি ঘুমোনোর চেষ্টা করো।

বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে সাবিনা। জেগে বসে আছে সেলিম। তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে ওই মেয়েটির আধপোড়া প্রায় নগ্ন শরীর। ভাবছে সেলিম—কেন করল এটা। কারাই বা করল। কিন্তু উত্তর মেলাতে পারছে না। ঠিক তখনই অভীকের ঘৃণাভরা দুটো চোখ ভেসে উঠল থিক থিক অন্ধকার ভেদ করে। রাত্রির নিস্তব্ধতাটাকে খান খান করে অভীকের বলা কথাগুলো যেন ছড়িয়ে গেল পৃথিবীময়। "এটা প্রতিষ্ঠান পক্ষ আশ্রিত সমাজ বিরোধীদেরই কাজ"।

গলা শুকিয়ে যাচ্ছে সেলিমের। ছটফট করছে সেলিম, অভীক কেন বলল! কেন? কেন? কেন?

দাঁড়াল সেলিম। হাঁতড়ে হাঁতড়ে সুইচটা খুঁজে আলো জ্বালাল। জল খেল কয়েক গ্লাস। তবু যেন তৃষ্ণা মিটছে না তার।

পাশ ফিরল সাবিনা। বোধহয় ঘুমায়নি সেও। স্নায়ুশিথিল করা ওষুধ খেয়েও। নাকি তার মনেও উঠেছে ওই একই ঝড়। কেন? কেন? কেন?

চোখ মেলে দেখল সাবিনা, সেলিম পায়চারি করছে ঘরের মধ্যে। ঘামছে সেলিম।

জিজ্ঞাসা করল সাবিনা—কি গো, তুমি ঘুমোওনি?

ঘুম আসছে না সাবিনা।

কেন?

ওভাবে কেন ....

তুমি ওই আধপোড়া মেয়েটির কথা ভাবছ?

তুমি দেখেছ?

দেখেছি।

কুকুরগুলোর আজ কি হয়েছে কে জানে, চিৎকার করছে খুব বেশি, তাদের

চিৎকার শুনে মনে হচ্ছে, তারা এদিক-ওদিক দৌড়াচ্ছে। অথচ গোকুলপুরে আজ পর্যন্ত কোনো চোর বা ডাকাত আসেনি।

জিজ্ঞাসা করে সেলিম—কি ব্যাপার বলো তো এখানে কোনো কিছু ঘটল নাকি?

কী আবার ঘটবে।

তা হলে কুকুরগুলো ওভাবে চিৎকার করছে কেন?

ওরা তো প্রায় প্রতিদিনই ওইভাবে চিৎকার করে।

অন্যান্য দিন তো শুনিনি।

অন্যান্য দিন তো রাত্রি একটা পর্যন্ত তুমি জেগে থাকোনি। তার উপর তোমার ওই নাসিকাগর্জন।

কী যা-তা বলছ।

তা হলে তোমার নাকের গর্জন ক্যাসেট বন্দি করে রাখতে হবে।

ওরা এইভাবেই চিৎকার করে!

করে।

তুমি জানলে কি করে?

জানলাম।

তার মানে তুমি প্রতি রাত্রেই জেগে থাকো!

তোমাকে জানতে হবে না। দয়া করে ঘুমোও তো, দেড়টা দুটো বাজতে যাচ্ছে।

হুঁ।

হুঁ নয়, আলোটা নেভাও।

আলো নিভিয়ে দিল সেলিম। বিছানায় শুয়ে চোখবন্ধ করল, ঠিক তখনই ভেসে উঠল মেয়েটির অর্ধদগ্ধ চেহারাটা। মনে মনে ঠিক করল সেলিম—ওটা আর ভাবব না। ভুলে যেতে চেষ্টা করব।

ভোরের দিকে চোখে ঘুম এল সেলিমের। তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়ল, বুঝতেই পারেনি সেলিম।

তখন রোদ ঝলমল করছে সেলিমদের উঠোনে। বারান্দায় সোনালি রোদ্দুর। জানলা খুলে দিল সাবিনা। জানলা বেয়ে রোদ্দুর পড়ল সেলিমের মুখে।

সাবিনা দেখল ক্লান্ত, শ্রান্ত, শান্ত ঘুমন্ত সেলিমকে। তার ইচ্ছে করছিল না ঘুম থেকে তুলতে।

মনে মনে বলল সাবিনা—ঘুমোও সেলিম, যতক্ষণ ইচ্ছে যায়। সেলিমের দুটো পা বেরিয়েছিল লেপের বাইরে। ঢেকে দিল সাবিনা। তারপর জানালাটা বন্ধ করে বেরিয়ে এল বাইরে।

তখন প্রায় সকাল দশটা, গেটটা খোলাই ছিল। সাবিনা ছিল রান্নাঘরে। কাউকে দেখতে না পেয়ে ডাক দিল আবির—সেলিম আছিস। নাকি বাজারে গেছিসরে?

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল সাবিনা। দেখল আবির এসেছে।

ওমা আপনি সকালেই! কি মনে করে?

চলে এলাম! বাবু কোথায়?

আর বলবেন না, কাল কী সব দেখেছে টিভিতে। সারারাত্রি তাই নিয়ে চিন্তা আর জেগে থাকা। ভোরে ঘুমিয়েছে।

তা বলে এখনও ঘুমোবে?

তুলে দিন না।

শোবার ঘরে ঢুকল আবির। সেলিমের শরীর থেকে লেপটা খুলে নিয়ে বলল—এই ওঠ। সাড়ে দশটা বাজছে, ব্যাটা এখনও ঘুমোচ্ছে।

চোখ রগড়াতে রগড়াতে ঘুম থেকে উঠল সেলিম। আবিরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল—কখন এলি?

অনেকক্ষণ।

সকালেই?

কেন? আসতে নেই?

তাই কী বললাম।

ডাকল সেলিম—সাবিনা, একটু চা খাওয়াবে?

রান্নাঘর থেকে সাড়া দিল সাবিনা—হয়ে গেছে। নিয়ে যাচ্ছি।

বেশ কিছুক্ষণ সেলিমের বাড়িতে কাটাল আবির। আলোচনা হল বিভিন্ন বিষয়ে। কিন্তু একটিবারের জন্যও ওই মেয়েটি আসেনি তাদের আলোচনায়। অথবা অভীকের বিপদজনক মন্তব্য।

সাবিনার হাতের চা, তারপর তেলেভাজা এবং আর একপ্রস্থ চা খেয়ে সেলিমের

বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল আবির। তার চাকুরি জীবনের প্রথম তিনমাসের বেতনে কেনা সাইকেলে চড়ে। সে চলে গেল কালী নদীর পারের রাস্তা বেয়ে।

কালী নদীর কানি বেয়ে জল চলেছে। সেই জলের উপরে পড়ছে শীত দুপুরের রোদ্দুর। ছোটো ছোটো ঢেউয়ের মাথায় রোদ্দুরগুলো যেন লুকোচুরি খেলছে। অন্যদিকে নদীটাতে বালি আর বালি। সেই বালিগুলোও যেন শীতের মৌতাত নিচ্ছে প্রাণ ভরে। মনের আনন্দে রোদ্দুরের মৌতাত মাখছে রাখালছেলের দল। একবার জলে নামছে তো একবার বালিতে খাচ্ছে গড়াগড়ি। গোরুগুলো চরছে কালীনদীর পারে। তারা এক একবার মুখ তুলে দেখছে নদীটাকে, দেখছে নদীতে খেলতে থাকা তাদের রাখালগুলোকে।

কালী নদীর পার ছেড়ে জনার্দনপুরের রাস্তা ধরেছে আবির। সেই রাস্তা দিয়েই আসছিলেন কুনালবাবু। দেখা হল তার সাথে। জিজ্ঞাসা করলেন কুনালবাবু—কিগো আবির কেমন আছো?

ভালো আছি স্যার।

তা হ্যাঁগো আবির, এসব কি হচ্ছে?

যেন কিছুই জানে না আবির, অবাক তার দৃষ্টি। দৃষ্টি তার কুনালবাবুর মুখের দিকে। তারপর মিথ্যে জিজ্ঞাসা—কি ব্যাপার স্যার!

তুমি টিভি দেখোনি?

না ... সেভাবে ...

কুনালবাবু বুঝলেন, এড়িয়ে যেতে চাইছে আবির। তাই প্রসঙ্গ বদলে বললেন—সেলিমের বাড়ি গেছলে বুঝি।

হ্যাঁ স্যার।

কেমন আছে, সেলিম?

ও ভালো আছে স্যার।

বোধহয় কিছুটা হতাশ হলেন কুনালবাবু। সেই হতাশা নিয়েই বললেন আসছি। আমাকে একবার হরেরামপুর যেতে হবে।

যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল আবির। এমন একটা ঘটনা ঘটল, যার উত্তর দেওয়া যে কতটা বিপদজনক, সে তো আবির জানে। এককথায় উত্তর দেওয়া যায় না।

পিছন ফিরে দেখল আবির, কুনালবাবু চলে যাচ্ছেন কালী নদীর পার বেয়ে। ধীর শম্বুক গতি তার সাইকেলের।

ফিরে এল আবির তার বাড়িতে।



ডিসেম্বর ১৮ যেন শেষ হতে চায় না। প্রতিদিনই ফিরে আসছে ১৮ই ডিসেম্বর—চা এর দোকানে, তাসের আড্ডায়, এখানে ওখানে জমায়েতে। বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মন্তব্য। কেউ কেউ আগুনে ঘি ঢেলে উপভোগ করছে অনাবিল আনন্দ। দেখে শুনে বিরক্ত লাগছে আবিরের। তার উপর রয়েছে টিভি। ওদের যেন আর কোনো নতুন খবর নেই, আলোচনা, সমালোচনা, সংযোজন, বিয়োজন, বিশ্লেষণ।

নয়না বলে—এমনকী ঘটনা, যার জন্য এত তোলপাড়! এর কোনো দরকার ছিল।

দরকার ছিল কি ছিল না সে তো সময় বলবে। কেন-না সময়কে বাঁধ দেওয়া যায় না। সময় মানুষের মনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মতো অবস্থার প্রেক্ষিতে থমকে দাঁড়ায় না, পিছিয়ে যায় না। সময় ইতিহাস গড়ে। ইতিহাস নবীকরণ, পুনর্নবীকরণ করে।



ডিসেম্বর ভালেবাসার মাস, মরশুমি ফুলের মাস। গাঁদা, গোলাপ, ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকায় সেজেছে ডিসেম্বর। ফুলপ্রেমীদের যুদ্ধকালীন তৎপরতা বাগানে, ছাদ সাজানোয়। এই কটা দিন মানুষ যেন তাদের সব দুঃখ, হতাশা বদল করে নিতে চায় ফুলের সাথে, যেমন চাষিরা করে বর্ষায়।

আসলে এইসবই চিরাচরিত নিয়ম। তাহলে নিয়মভাঙার খেলায় কেন আমাদের এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানবকুল। কেন এত রক্ত ঝরছে পৃথিবীর মাটিতে। কী অপরাধ করেছিল রক্তাক্ত, মৃত মানুষগুলি যারা চেয়েছিল এই সুন্দর ভুবনে যা কিছু সুন্দর তার ঘ্রাণ নিয়ে একটু হেসে, একটু খুশি নিয়ে বেঁচে থাকতে।

সেলিম তার বাড়িতে বসে টিভিতে দেখল, বোধহয় শ্রেষ্ঠ বিশ্বাসঘাতকার পরিণতি। যা মানুষ হয়ে মানুষের প্রতি, সম্প্রদায় হয়ে সম্প্রদায়ের প্রতি ঘটাল।

সাবিনাও দেখল সেলিমের পাশে বসে। কেমন যেন নিরুত্তাপ, অসাড়তায়। নাকি ঢাকনাচাপা ফুটন্ত জলের মতো মন নিয়ে।

সেদিন শেষ ডিসেম্বর। সাদ্দামের গলায় কালো কাপড় বাঁধা। শরীর ঢাকা আছে সাদা কাফনে। দীপ্ত মুখটুকু খোলা। তবে কি তিনি দেখছিলেন, শেষবারের মতো—মৃত্যুর পরেও তার সম্প্রদায়ের মানুষগুলোর মুখ, যারা আনন্দে আত্মহারা। যারা বিশ্বাসঘাতকতার চুড়ান্ত রূপ দিল কিছুক্ষণ আগে। যাদের ইতিহাস লেখা হল আগামী দিনের পৃথিবীর মানুষের জন্য আর একবার, মিরজাফরের পর। যে সম্প্রদায়ের নাম মুসলিম সম্প্রদায়। তাঁর চোখে কি ঘৃণা ছিল? তার চোখে কি করুণা ছিল!

দেখতে দেখতে বলেছিল সেলিম—জানো সাবিনা এরা কিন্তু মুসলিম, যাদের ধর্মগ্রন্থের নাম কোরান। এরা মুসলিম, একই উপাস্য, তিনি আল্লা। কোরানে নিশ্চয় লেখা নেই তোমরা বিশ্বাসঘাতকতায় লিপ্ত হও। লেখা নেই তোমরা তুলে দাও তোমাদের স্বাধীন ভাইটিকে জল্লাদের হাতে। লেখা নেই, আনন্দে আত্মহারা হয়ে উন্মাদ নৃত্যরত হও।

শুনল সাবিনা সেলিমের বলা কথাকটি। দেখল সাবিনা—আমেরিকার নির্দেশে একটি নারকীয় হত্যা। বুঝল সাবিনা—আমেরিকা আছে আমেরিকাতেই। যারা মাছ খায় শিকারি বিড়ালের মতো, গোঁফে তার দাগ থাকে না। অপরাধের কাঠগড়ায় দাঁড়ায় বেচারি রাঁধুনি।

সাবিনার মুখ থেকে, হয়তো তার অজান্তেই বেরিয়ে এল, ইশ। তারপর মুখ ঘুরিয়ে নিল টিভির পর্দা থেকে।

সেলিম দেখছিল এক উদ্দাম নৃত্য, যারা নাচছিল তারা আমেরিকাবাসী নয়। তারা মুসলিম। সাদ্দামও মুসলিম। একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বাধীন সম্রাট।

সাবিনা নিজের চোখ ঢেকে রেখেছিল দুহাত দিয়ে। চোখে জল জমেছিল কিনা দেখেনি সেলিম।

বলছিল সেলিম—জানো, কখনও কখনও নিজেদের এ সব কুকীর্তির জন্য লজ্জা হয়। মনে হয় চোখ-মুখ ঢেকে রাখি কালো কাপড়ে।

এসব বলছ কেন?

আমি মুসলিম বলে। কেন বলব না বলো, আমরা সবাই মাতামাতি করি কোরান নিয়ে। তার প্রতিটি বাণীর ব্যাখ্যা করেন ইমামরা, তারা কী ...

সত্যি সেলিম, ভেবে দ্যাখো তো মিরজাফর ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হল তার বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই। আজও কোন ইতিহাসবিদের সাহস বা ক্ষমতা বা দুঃসাহস হয়নি, নামটা মুছে দিতে।

আচ্ছা সাবিনা, এমন দিন আসবে না তো, যেদিন সমগ্র বিশ্ব আমাদের দিক থেকে ঘৃণায় তাদের মুখ ঘুরিয়ে নেবে। তা যদি হয়, তা হলে তো আমাদের বেঁচে থাকার নাম হবে যন্ত্রণা।

পৃথিবীর প্রায় সব মানুষের মতোই আবির, নয়না, অভীক দেখছিল ওই একই দৃশ্য। কলেজ ছাত্র অভীক, আবেগপ্রবণ অভীক, তারুণ্যে ভরপুর অভীক। প্রতিবাদী অভীক হঠাৎ বলে বসল—এই চরিত্র ওরা কয়েক প্রজন্ম শুধু নয়, অন্য কোন গ্রহে গিয়েও বদলাতে পারবে না।

রে রে করে ওঠে নয়না—কি বলছিস্ তুই! ওরা অন্যভাবে নেবে।

আচ্ছা মা, তোমরা সত্যকে সত্য বলতে এত ভয় পাও কেন? তোমরা কি নিজেদের স্বার্থে, রাজনৈতিক স্বার্থে সত্যিকে আড়াল করে রাখতে চাও চিরদিন! তোমাদের চোখগুলো কি দেখেনি পৃথিবীতে অনেক সম্প্রদায় অনেক ভাষাভাষী মানুষ আছে, যারা ওদের মতো প্রতিমুহূর্তে নিজেদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতায় লিপ্ত হয় না। ঔরঙ্গজেবকে দ্যাখো—নিজেকে নিরাপদ করার জন্য হত্যা করল দারা, সুজা মুরাদকে, সাজাহানকে বন্দি করে রাখল কারাগারে।

জুলফিকার আলি ভুট্টো কিন্তু অন্য কোনো সম্প্রদায়ের মানুষের হাতে বলি হয়নি। মুজিবর রহমানকে হত্যা করেছিল মুসলিমরাই। এমন অজস্র উদাহরণ রয়েছে। হয়তো তারা ইতিহাসে স্থান পায়নি।

অভীকের এসব যুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তি খাড়া করার যুক্তি কারও হয়তো জানা নেই। যদি কেউ এরপরেও যুক্তি দেখায়, তাহলে ধরেই নিতে হয় তারা ইতিহাস পড়েনি।

উত্তেজনার পারদ চড়ছে অভীকের। অভীক যেন সামান্য নদী নয়, একটা মহাসাগর। যার বুকে উথালপাতাল ঢেউ। যেগুলো বিরাট উচ্চতা নিয়ে আছড়ে পড়ছে সৈকতে। যে ঢেউয়ের বুকে সামান্য পানসি হয়ে দুলছে নয়না। ডুবছে নয়না, ভাসছে নয়না।

ঢেউগুলো আরও উচ্চতা পাচ্ছে, পানসি যেন ভয়ে দিশেহারা। তাকে আসতে হবে কূলে, বন্ধ করতে হবে এই ঢেউয়ের হাতে মৃত্যুর আশঙ্কা। কিন্তু কি করে?

তাই হয়তো শেষ চেষ্টা করে নয়না বাঁচবার, বাঁচানোর।

সিংহাসন এমনই অভীক, যেখানে ভাই, বোন, আত্মীয়, পরিজন, প্রিয়জন, জাত, সম্প্রদায়, ধর্ম বলে কিছু নেই। নদীর বিধ্বংসী প্লাবন কি কাউকে আলদা চোখে দেখে, নাকি দেখতে পায়। তার তো চোখদুটোই নেই।

বোধহয় ভালো লাগেনি নয়নার কথা। কারণ নয়না যা বলছে তা সমাধানের পথ নয়। ধ্বংসের পথ, রাজনীতির যে খেলা চলছে সমগ্র পৃথিবীতে সেই খেলার তত্ত্ব। তাই হয়তো তাকায় আবিরের দিকে। আবির শুধু বাবা নয়, অনেকখানি বিশ্বাসের স্থান অন্তত অভীকের কাছে।

আবিরও তাই জানে, এবং এও জানে অভীককে থামাতে হলে তাকেই নামতে হবে আসরে। ঠিক জায়গায় ঠিক ওষুধ প্রয়োগ না করলে মত্ত হাতিকে অচেতন করা যায় না। সেই ঠিক জায়গার সন্ধান আবির জানে, কিন্তু নয়না জানে না।

আচ্ছা অভীক, এটা তো অন্য সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও ঘটে, তখন তুই কী বলবি?

এখানেই তো আমার প্রতিবাদ বাবা, কেন ঘটবে এসব। কেন ব্যক্তি আক্রমণে মেতে উঠবে প্রতিপক্ষ। কেন কেউ বা কারাও তাদের স্বাধীনতা নিয়ে চলতে পারবে না। কেন ডমিনেট করবে সংখ্যাগরিষ্ঠরা এবং অন্যায়ভাবে। জানি তোমরা ইন্দিরা গান্ধি, রাজীব গান্ধির কথা বলবে। নেতাজির মৃত্যুরহস্যের পিছনে সুনিপুণ হাতের কথা বলবে, যারা হিন্দু। এগুলোও তো অন্যায়। নেতাজি ছাড়া বাকিদের প্রেক্ষাপট যদিও আলাদা।

কী বলতে চাইছিস তুই।

এই প্রথম বোধহয় একটু গলা উঁচু করে কথা বলল আবির। তবে কি নয়নার মতো আবিরও সম্ভাব্য পরাজয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে।

কথায় বলে তুমি মারলে মারতে হবে আমাকেও। তা না হলে মার খেতে হবে চিরকাল। অবশেষে দাসানুদাস হয়ে যেতে হবে।

এই ভাবনাকে অনুসরণ করে আবির বলল—কী বলতে চাইছিস তুই। তুই কি সবজান্তা হয়ে গেছিস!

সেই দৃঢ় প্রত্যয় সেই পুরোনো সুর, সেই ঝঙ্কার, যা হিম ধরিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

আমি কী বলতে চাইছি, তোমাদের না বোঝার তো কারণ নেই। তা ছাড়া তোমরাই তো বলছ সব নাকি সিংহাসনের জন্যই। তাই যদি হয় তাহলে সরাসরি লড়াইয়ের ময়দানে তোমরা নামতে ভয় পাচ্ছ কেন? কেনই বা প্রতিপক্ষ রাখার প্রশ্নে তোমাদের এত দ্বিধা। তোমাদের কোন্‌টা সত্যিকারের মুখ, কোন্‌টা মুখোশ?

আর সহ্য হচ্ছে না আবিরের। এত স্পষ্ট কথা সহ্য করার অভ্যেসটা তো হারিয়ে গেছে বহুদিন আগে। তাই চিৎকার করে বলে—তুই থামবি, নাকি আমরা বাড়ি ছেড়ে চলে যাব?

মুখ বন্ধ করলেই কী তোমরা শান্তি পাবে। আচ্ছা বাবা, তোমরা প্রাণায়াম দ্যাখোনি, অভ্যেস করোনি? যদি করে থেকে থাকো, তা হলে তো তোমাদের জানার কথা বাইরের অক্সিজেন পূর্ণ বাতাস টেনে নিয়ে তা কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ রাখলে কি হয়, তারপর যখন সেই বাতাস বেরিয়ে আসে, তার গতি কেমন হয়। কি থাকে সেই বাতাসে। জানো মা, জানো বাবা এই ভাবেই সবাই সংগ্রহ করছে অক্সিজেন। যে দহনে সাহায্য করে। তোমরা তখন কিন্তু পালিয়ে যেতে পারবে না।

আবির নয়নার এর পর নিরস্ত্র হওয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। তারা মনে মনে ভেবেছিল অভীক একা নয়। অসংখ্য অভীক জন্ম নিয়েছে এই পৃথিবীতে। তারা একটা সন্ত্রাসমুক্ত, দুষণমুক্ত, আগ্রাসনের পরিণামে অসাড় পৃথিবীকে সচল করতে বদ্ধপরিকর।

তাই হয়তো বলল—একদিকে শিয়া সম্প্রদায়ের উদ্দাম নৃত্য অন্যদিকে সুন্নিদের চোখে-মুখে প্রতিহিংসার আগুন তার প্রিয়জনদের হারানোর বেদনা নিয়ে আরব্য উপন্যাসের দেশটা কেন অস্থিরতার ইতিহাস হয়ে গেল। কেন লুঠেরা আমেরিকা লুণ্ঠন করে চলেছে সোনার বাগদাদ! কেন বসরাই গোলাপের সুবাসে মিশে গেছে রক্তের আঁশুটে ঘ্রাণ! কেন আরব সাগরের নীল জল ধারণ করেছে রক্তের রং। বারুদের গন্ধে ম-ম করছে বাগদাদের বাতাস।

বলো তো বাবা, চিন তো কমিউনিস্ট রাষ্ট্র। তোমরা তো বলো সমাজতন্ত্রের কথা। তা হলে কেন তিয়েন আন মেন স্কোয়ারে এখনও দশ হাজার ছাত্রের রক্তের লাল দাগ লেগে আছে। ওরা তো ছাত্র। ওরাতো জাতির মেরুদণ্ড। পৃথিবীর আগামী সুন্দর দিন!

আসলে কি জানো বাবা, তোমাদের কথাই ঠিক। সিংহাসনের প্রশ্নে সব কিছু সম্ভব। সেখানে মানবিকতার কোনো দাম নেই, আবেগ কাঁদে পোড়ো মাঠে।

এবার কথা বলে নয়না—সাদ্দামের ব্যাপারে তো আমরা প্রতিবাদ করেছি।

তা অবশ্য করেছ ক্রিকেটের হাফ হার্টেড আপিলের মতো। ব্যাস ওই পর্যন্তই।

সত্যিই তাই। একমাত্র বামশক্তি, তারাই প্রতিবাদ করেছিল যা তাদের কাছে সান্ত্বনার কথা। নীরব রাষ্ট্রপুঞ্জ। নীরব বিশ্ব। একটা শ্রেষ্ঠ তামাশার স্বাক্ষী হল শেষ ডিসেম্বর।

পরের দিন ফোন করেছিল শওকত। তার আব্বা সেলিমকে—আচ্ছা আব্বা আমাদের শরীর থেকে কি বিশ্বাসঘাতকতার কথাটা মুছে ফেলা যাবে না কোনোদিন!

শওকতের বিনীত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি সেলিম। উত্তর দিলে তারই সম্প্রদায় অতিবিপ্লবী হয়ে তাকে বিতাড়িত করবে দেশ থেকে। হয়তো তার মাথার দাম ধার্য হবে কয়েক লক্ষ টাকা। সলমন রুশদির মতো, তসলিমার মতো। তারপর ঘোলা জলে মাছ ধরতে নামবে সাবধানি রাজনীতিবিদরা। কেন-না সংখ্যালঘুরা অনেক দামি সংখ্যাগরিষ্ঠদের থেকে।



ডিসেম্বর ভেবেছিল কুবের হয়ে যাবে। যা কিছু বিগত, রেখে দেবে নিজের ভাঁড়ারে। কেউ জানবে না, কেউ নেবে না কাউকে, দেবে না কোনোকিছু। সে সব ধনরত্ন দুঃখ, হতাশা, আশা, নিরাশা, যন্ত্রণা, বিশ্বাসঘাতকতা, আরও অনেক কিছু। চেয়েছিল, মানুষ সৃষ্টি করুক যা কিছু নতুন। নতুন আশা, নতুন স্বপ্ন, নতুন জীবন, নতুন পৃথিবী। একেবারে শূন্য থেকে।

কথায় বলে আশায় বাঁচে চাষা। শুধু চাষারাই বা কেন পৃথিবীর যা কিছু সব। ডিসেম্বরের শেষ মিনিট কেটে যাওয়ার পর ফুলগুলো সাজছে নতুন করে। সাজছে ২০০৭-এর জন্য। তারা বলছে আগামী দিন হোক সুন্দর। নির্বিবাদী মানুষ, তারাও বলছে অন্য কিছু চাই না। চাই শান্তি। বিগতদিনের লাশের উপরে বসে থাকা মাছিগুলো—তারাও বলছে ভালো লাগে না রক্ত।

ওরা সব বলছে। কিন্তু যারা রক্ষক, যারা সমাজ গড়বে বলে ওদের কাছে অঙ্গীকার করেছিল। তারা কি ভাবছে? কি তাদের চাওয়া!

পয়লা জানুয়ারি ২০০৭। বর্ষবরণে মাতল সমগ্র মানুষ। তারা কয়েক মিনিটের নীরবতায় ধিক্কার জানাল বিগত দিনগুলিকে। ধিক্কার জানাল, যারা কলঙ্কিত করেছে পৃথিবীটাকে সেই সব খলনায়ককে। কেউ কেউ একধাপ এগিয়ে বলছে 'সন্ত্রাসবাদের

জনক আমেরিকা'। কেউ কেউ আর কেউ নয়। ভেনিজুয়েলার রাষ্ট্রনায়ক সাভেজ। কোনো কোনো দল—তারা বামপন্থী, তারাও প্রতিবাদে শামিল। তারা জেহাদ ঘোষণা করলেন, চাপ সৃষ্টি করলেন ভারত সরকারের উপর—ভেবে দেখুন, এই আগ্রাসী আমেরিকার সাথে সম্পর্ক রাখা যায় কিনা। প্রতিবাদ করেছিল ভিয়েতনাম, কোরিয়া। বাকিরা দেখেছিল, নতুন শতাব্দীর হয়তো বা নতুন নায়ককে। যারা কলঙ্কিত এক ইতিহাস রচনা করেছিল বিগত শতাব্দীতে।

প্রতিবাদ করেছিল অভীকরাও। যুব মানস বোধহয় ঘৃণা প্রকাশ করল। শপথ নিল নতুন বৎসরের প্রথম দিনটিতে—আর নয়, ঢের হয়েছে, এবার আমরা সমস্ত রক্ত ধুয়ে, সেখানে বিছিয়ে দেব লক্ষ লক্ষ ফুল, যার ঘ্রাণ নিয়ে বিবেকহীনরাও লজ্জা পাবে, ফিরে আসবে শান্তির সমাজে।

শপথ নিল অনেকেই। প্রথম দিনটিকে চূড়ান্ত আড়ম্বরে উদ্‌যাপন করার সময়। সে শপথ ....

আসলে, এই মনুষ্য সমাজ ভীষণরকমের বিস্মৃতপ্রিয়। সে নারী হতে পারে, হতে পারে পুরুষ অথবা ক্লীব। তা না হলে স্বামীহারা মধ্যযুবতি কিছুদিন সদ্যমৃত স্বামীর স্মৃতি বুকে বয়ে বেড়ানোর পর নতুনের সম্মোহনে মোহিত হয়ে ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাববে কেন? অথবা কোনো সন্তান পিতৃহারা হওয়ার পর সেই স্মৃতি মুছে 'তুমি তো কেবলই ছবি' বলে ঝাঁপিয়ে পড়বে কেন উত্তরসুরির ভূমিকা পালন করতে। সদ্যবিবাহিতা, তার বাবা মায়ের আদরের দুলালি কয়েকটা দিন স্বামীর সাথে কাটানোর পর কেন ভুলে যায় তার জন্মদাতা, জন্মদাত্রীকে!

হয়তো এই বিস্মৃতিপ্রিয়তাই মানুষকে জোগান দেয় আগামীর রসদ। বাঁচায় অযৌক্তিক অবক্ষয় থেকে। কখনও কখনও অবক্ষয়ের পথও ধরিয়ে দেয়।

পৃথিবীতে তার অজস্র উদাহরণ আছে। ভারতবর্ষেও আছে। আমাদের পশ্চিমবাংলাও তার নিদর্শন রেখেছে ঢের। যেখানে মানুষের চিরায়ত আবেগকে বিস্মৃতির অন্ধকারে ঢেকে, কোনো সরকার, কোনো শাসনতন্ত্র, কোনো মতবাদ, হারিয়ে ফেলে তার বিশ্বাস যোগ্যতা, বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় মানুষের হৃদয় থেকে। সেখানেই তো অবক্ষয়। এমনও হয়, যখন মানুষ ছুড়ে ফেলে দেয় সাধের সিংহাসন থেকে। সাতাত্তর সাল রচনা করল এমনই এক অবক্ষয়ের ঐতিহাসিক অধ্যায়। যারা বা যাদের নেতৃত্বে সেই ইতিহাস রচনা হল তারাও বর্তমানে প্রায় বিস্মৃতপ্রায়।

শপথের কোনো পরিসংখ্যান নেই। নেই তেমন ধারাপাত, থাকলেও বোধহয় কুলোত না। তবু শপথ নেওয়া,...

শপথ নিল নকুল হাসদা। বয়স তেরো বৎসর তিনমাস। সে বসন্তের ভাই সুমন্তর বাড়িতে গোরু-ছাগলের দেখভাল করবে। বেতন বছরে দুহাজার টাকা। তার সাথে খাওয়াদাওয়া, বছরে দু-জোড়া জামাপ্যান্ট, তিনটে গামছা, একটা শীতের চাদর। হালকা অসুখ বিসুখে টুকিটাকি ডাক্তার খরচ।

ঝগড়া যদি করতেই হয়, তা প্রথমেই করে নেওয়া ভালো। তাই বসন্তের উপস্থিতিতে কথা বলে নিয়েছে সুমন্ত। যা যুগ পড়েছে কথা বলে না নিলে রে রে করে উঠবে সবাই। নেতা বা তার ভাই বলে কেউ ক্ষমা করবে না।

সব আলোচনা শেষে সুমন্তের বউ রেনুকা বলে—কি রে বাবা থাকবিতো? নাকি কিছুদিন পরেই সব ছেড়েছুড়ে পালিয়ে যাবি?

নকুলের বাবা সুবল হাসদা বলে—সে কি গো বউদিদি, ইটা তুমার কুথা হল। আমরা জাতে সাঁওতাল, তুমাদের মতন লয় যে কুথা দিয়ে পলাইঙ্গ যাবক। আমরা পরের বাপকে বাপ বলতে শিখি নাই। তুবে ছিলাটাত ছোটো। নিজের মতো করে উয়াকে একটু দিখ্‌বে। তাহলেই হবেক। গরিব মানুষ, পিটের জ্বালায় অতটুকুন ছিলাকে তুমাদের ঘরলে রাখতে হচ্ছে, থাকলে কি রাখতম।

নকুল হাসদা শিশু শ্রমিক, বসন্তের ভাই সুমন্তের বাড়ির কাজের মানুষ। জমি আছে সুমন্তের বেশ কিছু। আছে দুখানা বাস। দুটো ট্রাক্টর। আগে যাই থাক এখন ইয়া বড়ো পাকাবাড়ি। সামনে ফুলের বাগান। ফুলের বাগানের মাঝামাঝি জলের পাম্প। সুইচ টিপলেই জল। আছে বিভিন্ন প্রজাতির দুধেলা গাই। ছাগলও কিছু আছে। সবই বসন্তের অনুকম্পায়। বসন্তেরও অনেক আছে। তবে বেশির ভাগই সুমন্তের নামে। আসলে ওদের ঘরে লক্ষ্মী এসে বাসা বেঁধেছে কয়েকবছর হল। বসন্তর সাথি নজরুলও এমন সব পেয়েছে এবং এটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু আবির, সেলিম! ওরা কি পেয়েছে? কেউ কেউ বলে—ওরা নাকি সবার আশীর্বাদ আর ভালোবাসা পেয়েছে।

ওরা যাই পেয়ে থাকুক, নকুল পেয়েছে অনেক কিছু। সে যেন সুমন্তদের বাড়ির একজন হয়ে গেছে। হবে নাই বা কেন। সে তো দিচ্ছে তার সবকিছু এবং উজাড় করে। না দিলে তো কিছু পাওয়া যায় না। ওরা কথা রেখেছে সুবল হাসদার। খুব খুশি সুবল।

ইদানীং টিভি দেখে নকুল। রেডিয়ো শোনে। প্রথম প্রথম অবশ্য অবাক হয়ে যেত, একটা এত বড়ো বাক্সে কত মানুষ নাচ, গান লড়াই সব করছে। লড়াইয়ের দৃশ্য দেখে প্রথম প্রথম লাফিয়ে উঠে পালিয়ে যেত নকুল। তার ধারণাই ছিল ওরা

লড়াই করতে করতে এসে নকুলকেই না মারতে শুরু করে দেয়। পরে পরে জেনেছে ওরা বাইরে আসবে না।

এক একদিন জিজ্ঞাসা করে নকুল, ওর থেকে বড়ো সুমন্তের ছেলে খোকনকে—হ্যাঁগো খোকনদাদা, হুই যে উঁচু উঁচু সাদা সাদা, উগুলান কি গো!

উত্তর দেয় খোকন—ওগুলো সব পাহাড়। বরফে ঢাকা।

সিটা আবার কি?

আইস জানিস?

বোকার মতো বসে থাকে নকুল খোকনের মুখের দিকে তাকিয়ে। বুঝতে পারে খোকন—নকুল বুঝতে পারেনি, তখন বলে আইসক্রিম খেয়েছিস।

হ্যাঁ।

ওই রকমই ওগুলো।

উ গুলান হলে তো উনেক লোক খাবেক?।

ওগুলো খায় না।

বুঝল কি বুঝল না, সে কেবল নকুলই জানে। একটু থেমে থাকার পর বলল—অঃ।

তা হ্যাঁগো, হুই যে লোকগুলান, উয়ার উপরলে হাঁটছে, উয়াদের পাগুলান কনকন করে নাই। আমাদের যিমন আইস কিরিম খেলে হয়।

দেখছিস না, ওরা জুতো পরেছে।

তুমরা উখানলে গেছলে?

না।

খোকনের ভাই টৌটন, বসন্তের ছেলে, সেও টিভি দেখছিল নকুলের সাথে।

তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল নকুল—হ্যাঁ গো টৌটন দাদা, উগুলান কিগ, জল কাটাইঙ্গ কাটাইঙ্গ যাচ্ছে?

ওগুলো পানসি।

বুঝতে পারেনি নকুল, কোনোদিন নামও শোনেনি। তাই হাঁ করে তাকিয়ে থাকল টৌটনের দিকে। বুঝল টৌটন, নকুল কিচ্ছু বুঝতে পারেনি। তাই হয়তো সহজ করে বোঝানোর চেষ্টা করল—নৌকো দেখেছিস্, বন্যার সময়?

হ্যাঁ, উটা আবার দেখবক নাই। চাপাইঙ্গছি কুতবার।

ওগুলো ওই রকমই। যন্ত্রের সাহায্যে চলে।

আবার তাকাল নকুল টোটনের দিকে। টোটন নিজের ভুল বুঝতে পেরে নিজেরই চুল ধরে টানল। তারপর বলল ভুটভুটি দেখেছিস। নৌকোতে লাগানো থাকে।

হ্যঁা

নিশ্চিন্ত হয় টোটন।

এইভাবেই নকুলের সাথে পরিচয় হয়, বলা ভালো তার জানা হয়ে যায় অনেক কিছু, যা অজানা ছিল নকুলের।

নকুল এখন আর ওভাবে জিজ্ঞাসা করে না খুব নতুন কিছু না দেখলে।

আসলে ওরা এমন কিছু বড়ো হয়ে যায়নি যে সমাজটা কেমন তা জেনে গেছে। ওরা তেমন করে শোনেনি রাজনীতির হালহকিকত। খুন, ধর্ষণ। তা ছাড়া ওদের বাড়িতে রাজনৈতিক আলোচনা হয় না বললেই হয়। ওরা বাইরের যা কিছু তাকে বাইরেই ছেড়ে রেখে আসে।

বসন্ত সুমন্ত আর যাই হোক, আর পাঁচটা বাবা-মার মতো চায় নিজেদের ছেলে মেয়েদের সুশিক্ষিত করে তুলতে। ওদের যেটা হতাশার জায়গা, লেখাপড়া শিখতে না পারা। কেন-না ওদের নুন আনতে পান্তা ফুরিয়ে যাওয়া আর্থিক অবস্থায় সুযোগ ছিল না তেমন কিছুই। আজ সে সুযোগ এসেছে। আজ ওরা প্রায় সম্পৃক্ত। ছেলে মেয়েদেরকে গান শেখাচ্ছে, নাচ শেখাচ্ছে। লেখাপড়া তো বটেই।

ওদের বাড়ির কাজের মানুষ নকুল। সেও শিখছে কিছু কিছু ওদের সাহচর্যে এসে। তা ছাড়া ছোট্ট নকুল এই কমাসে মনজয় করে ফেলেছে সবার। প্রচুর কাজও করে নকুল। ওর পিছনে কাউকে লেগে থাকতে হয় না।

নিন্দুকেরা বলে এরা নাকি শিশুশ্রমিক বিরোধী আন্দোলন করে। অথচ নিজেদের বাড়িতেই শিশুশ্রমিক রেখেছে। নিন্দুকেরা নকুলকে একা পেলে বিভিন্ন সময় নানান কথা জিজ্ঞাসা করে, নানান কথা বলে। নকুলের ওসবে কিছু যায় আসে না।

যারা সমালোচনা করে নকুলের কানভারি করার চেষ্টা করে তাদেরকেও দু কথা শুনিয়ে দেয় কেউ কেউ। আপনারা কেমন ছিলেন, সেটা তো আগে ভাবুন। নাকি ভুলে গেছেন আপনাদের অতীতগুলো?

আজকাল আপ্তবাক্য, খনার বচন নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। যুগটা যেন দিন দিন বস্তুবাদের দিকে এগিয়ে চলেছে। যেখানে আবেগের স্থান নেই। আর ওই

আবেগের স্থান নেই বলেই আবেগপ্রবন নেতা নেত্রীদের সব চেষ্টা বিফল হয়ে যাচ্ছে। তাদের হাজার চেষ্টাতেও ভরছে না ভোটবাক্স।



সেদিন রাতে খাবার টেবিলে হঠাৎ এসে গেল কুনালবাবুর প্রসঙ্গ। তিনি বলেছিলেন—বিরোধীদের কোনো ইস্যু নেই।

তারই রেশ ধরে আবির বলে—সত্যিই ওদের হাতে তেমন কোনো অস্ত্র নেই, যা দিয়ে আমাদের বিব্রত করতে পারে।

নয়না যোগ করে—একটা মজার ব্যাপার দ্যাখো আবির, ওদের মনের কোনো স্থিরতাই নেই। তা যদি থাকত তা হলে একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারত, কাদের সাথে জোটবদ্ধ হবে। তারপরেও কি করে যে ওরা রাজ্য জয় এবং মসনদের স্বপ্ন দেখে, আমার তো কোনো ভাবেই বোধগম্য হচ্ছে না। তা ছাড়া মানুষ কি এত বোকা নাকি?

বোধহয় সহ্য হল না অভীকের। মুখে ভাতের গ্রাস তুলতে তুলতে রেখে দিল থালাতেই। একরাশ বিরক্তি তার চোখে-মুখে।

সেই ব্যাজার মুখ নিয়েই বলে—দ্যাখো মা, একটা সিঙ্গুর তোমাদেরকে অনেকখানি ব্যাকফুটে ঠেলে দিয়েছে। তারপরেও তোমাদের মুখে এসব মানায় না।

ছাড় তো, একদিন দেখবি সবাই সবকিছু ভুলে গেছে। সেটা শুধু সময়ের অপেক্ষা।

ভুলবে কি ভুলবে না, সে তো পরের কথা। এখন তো সামলাও।

ভুলবে কি ভুলবে না, সত্যিই সেটা পরের কথা। এখন মানুষ ভুল বুঝতে শুরু করেছে সরকারের কর্মকাণ্ডের প্রতি। ওই একটা মাত্র নৃশংসতা দেখে। তারা অন্তত বলছে, এটা প্রত্যাশিত ছিল না।

অভীক তো প্রকাশ্যেই বলছে। বলছে অভীকের বয়সিরা। এরা দিন দিন একটা ধারণার বশবর্তী হয়ে যাচ্ছে। যা কপালে ভাঁজ পড়ার সবচেয়ে বড়ো কারণ। অথচ না নয়না, না আবির অথবা সরকার বুঝতে পারছে না কি ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।

তবু শেষ চেষ্টা করে নয়না, অভীকের রুদ্রমুর্তি দেখে। আবিরকে বলে—কিগো, তুমি যে কিছু বলছ না।

কোনো লাভ হবে না নয়না। ওরা বড়ো হচ্ছে, ওরা দেখছে কি ঘটছে। ওরা বুঝতে পারছে সংকট সমাসন্ন। ওরা খুঁজছে ওদের সঠিক পথ, আটকাবে কি করে!

ফল কি হবে ভেবে দেখেছ?

দরকার নেই ভাববার।

তা হলে আমাকেই কিছু একটা করতে হবে।

চেষ্টা করে দ্যাখো, আমি ওর মধ্যে নেই।

কিছুটা প্রশ্রয়, কিছুটা সমর্থন, আবিরের কাছ থেকে। হাসছে অভীক। তাকে দেখে একটা ভয় একটা সন্দেহ দানা বাঁধছে নয়নার মধ্যে।

ক্রমশ বিরক্ত হওয়া নয়না ভাতের থালাটা ঠেলে দিল হাতের সামনে থেকে চিৎকার করে বলে—অভীক তোকে শেষ বারের মতো বলছি, তোর পথ ঠিক নয়, সময় থাকতে ফিরে আয়।

বুঝতে পারে আবির নয়নার অবস্থা। ভীষণ রেগে গেছে নয়না। আরও একবার এই একই অবস্থা হয়েছিল, আবিরের সাথে তর্কাতর্কিতে। প্রসঙ্গ ছিল সেলিমকে বহিষ্কার করা। অনেক কষ্টে নিরস্ত্র করা গেছল নয়নাকে। যে পদ্ধতিতে সেই পদ্ধতিই অবলম্বন করল আবির।

আচ্ছা নয়না আজ আমরা হয়তো মেরুকৃত। তাই বলতে পারি না। কিন্তু সত্যি বলো তো, আমরা কি পথভ্রষ্টতার দোষে দোষী নয়?

না।

কী বলছ নয়না। এর পর যে নিজের ছবিকে নিজেই অস্বীকার করবে।

বড্ড বাঁকা বাঁকা কথা বলছ আবির।

না নয়না, আমি যা বলছি তা প্রায় নির্ভুল।

বুঝতে পারছে নয়না, আবির তার একমাত্র ছেলের ব্যক্তি স্বাধীনতা নিয়ে কোন আপস করতে চায় না। স্বাভাবিক কারণেই কেমন যেন হতাশ হয়ে যায় সে। সেখান থেকে সিদ্ধান্তে আসে, আর নয়, এবার সরাসরি বাধা দেবে অভীককে। তাতে যদি সংঘাতের পথ ধরতে হয় তবুও।



থেকেই মাথা ছাড়া দিচ্ছে সমগ্র বিশ্বে। যার কাছে হয়তো আগামীদিন হার মানবে ধর্মীয় মৌলবাদ। এখন সে লজ্জাবনত।

প্রায় সব দেশ, সব দল এমনকী যারা নিজেদেরকে সাম্যবাদী বলে বিশ্বের কাছে জাহির করে আসছে জন্মলগ্ন থেকে, তারাও প্রমাণ করতে চায়, তাদের মতবাদই শ্রেষ্ঠ এবং সেই ধারণাটাকে প্রতিষ্ঠা করতে চায় সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। তার জন্য যদি রক্ত ঝরে, যদি মিথ্যাটাকে সত্যি করে অথবা সত্যকে বিকৃত করতে হয়, তবুও।

ঠিক এই কারণেই চরম অস্থিরতার মধ্যে দিয়ে চলেছে আমাদের ভূবৈচিত্রের পৃথিবী।

মধ্য ফাগুন, লাল শিমুল, বসন্তের ভোরে কোকিলের গান। শীত-গ্রীষ্মের বিদায় আগমনের মন কেমন করা বাতাস, এই নিয়েই তো যত সুখ পৃথিবীর মানুষের। তা হলে এত উষ্ণ হয়ে উঠেছে কেন মানুষের মন। আমেরিকা এত সফল ঝড় শেষ করার পরেও কেন ইরাকে চালাচ্ছে দৈনন্দিন হত্যালীলা। আফগানিস্তান শান্তিতে নেই কেন! পাকিস্তানে কেন চলছে খুনের হোলি খেলা। লেবানন, ইজরাইলে চলছে রক্তক্ষয়ের ইতিহাস লেখা, মুছে ফেলা, আবার লেখা। ভারতে চলছে সন্ত্রাসবাদীর আক্রমণ। পশ্চিমবাংলায় কেন চলছে হারানো উদ্ধার অথবা ধরে রাখার জন্য প্রাত্যহিক লড়াই।

মানুষের বোধহয় এই এক ধর্ম। তারা আঘাত করতে ভালোবাসে মানুষকে। আহত হয় মানুষ, প্রতিহিংস্র হয় মানুষ, প্রত্যাঘাত হানার চেষ্টায় থাকে প্রতিটি মুহূর্তে। রক্ত ঝরে। বাতাসে মিশে যায় আঁশটে গন্ধ। চোখের জল থেকে উত্থিত বাষ্প। মিশে যায় দীর্ঘশ্বাস, হাহুতাশ। শান্তিকামীদের শ্বাস কষ্ট হয়, এসব নিয়ে কেউ ভাবে না, ভাববার মানসিকতা বা অবসর কারও নেই। ওই সব মৌলবাদীরা মনে করে, মানুষের আবেগকে গুরুত্ব দেওয়া মানে বিলাসিতা।

প্রকৃতির সবুজ, নদীনালার জল, সাগরের ফেনিল, পাহাড়ের বরফ, এমনকী আগ্নেয়গিরির লাভা নিজেদেরকে আঘাত করে না। তারা বিশ্বাসী সহাবস্থানে। তাদের মনের মধ্যে নেই প্রতিহিংসাকে জন্ম দেওয়ার কোনো পটভূমি। ওরা ওদের মতো করে অঢেল সুখ নিয়ে অবস্থান করছে আবহমানকাল। অথচ মানুষ ওদের কাছ থেকে কিছু শিখতে চায় না।

সেই সহনশীল পৃথিবী মানুষের জন্য, মানুষের সৃষ্ট অগ্ন্যুৎপাতে কেমন যেন গা ম্যাজম্যাজ করা অসুস্থতায় দিন কাটাচ্ছে। অথচ বলতে পারছে না—তোমরা তো পশু নও, তোমরা মানুষ, তোমরা এভাবে আমাদের শান্তি বিঘ্নিত করছ কেন?

আমাদের তো সিংহাসনের লোভ নেই। আমাদের বিভিন্ন মতবাদ, বাদানুবাদ নেই। আমরা তো বলি না আমরা শ্রেষ্ঠ, আমরা তো বিনা লগ্নিতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা কামানোর জন্য ভণ্ডামি আর ভাঁওতাবাজিতে লিপ্ত হইনি। ভ্রাতৃঘাতী সংগ্রামে লিপ্ত হইনি। রাজনৈতিক কারণে লড়াই শেষে একই টেবিলে দুই প্রতিপক্ষ বসে সুরার পেয়ালায় চুমুক দিইনি।

আমরা বলি আমাদের মতো হতে, সত্য পথে জীবন কাটাতে। আমরা বলি শান্তির নীড় হোক আমাদেরই বুকে। তা হলে এসব কেন? কেন? কেন? ...

এই কেন-র উত্তর মানুষের জানা নেই। অথচ কেন শব্দটা সৃষ্টি হয় প্রত্যেকেরই মনের মধ্যে। অবাক হতে হয়, যার উত্তর জানা নেই তা তৈরি করা হয় কেন? আসলে মানুষ পারে না অনেক কিছুই। যা সত্য, যা সুন্দর, যা শিব তার অনুশীলন করতে।

অনুশীলন করে কিভাবে গোগ্রাসে সব কিছু আত্মসাৎ করা যায়, অনুশীলন করে শরীরের বর্জ্যপদার্থ ছাড়া কি করে ত্যাগ না করে থাকা যায়—কথাগুলো বলেছিলেন বিনায়ক রায়, এক বামপন্থী নেতা।

ফাগুন আগুন ধরায় মানুষের মনের মধ্যেকার আর-একটা মনে। তখন বসন্ত আসে, সুন্দর বসন্ত, জন্ম নেয় নতুন স্বপ্ন, সে স্বপ্নগুলো জন্ম নেয় আগামী বছরের জন্য—মন তখন গান গায় গুন গুন, গুন গুন, গুন গুন।

স্বপ্ন দেখেছিল নয়না তার অভীককে নিয়ে। অভীককে স্রোতের অভিমুখে এনেছে সেলিম। অভীক এখন মার্কসবাদের বিষয় এবং তার মধ্যেকার বস্তু নিয়ে আলোচনা করে আবিরের সাথে। সেলিমের সাথে।

অভীক বলে—একটা জিনিস খুব পরিষ্কার। এ রাজ্যে বিগত তিরিশ বছরে এমন কোনো বিকল্প তৈরি হয়নি যা টক্কর দিতে পারে সি.পি.আই.এমকে। হয়তো পারবেও না কোনোদিন। যদি ....

শেষ করার সুযোগ দেয়নি নয়না, অভীকের মনে নিজের ধারণা প্রোথিত করার জন্য বলে—তা হলে বুঝতে পারিছস, কার সাথে থাকা উচিত।

খোঁচা দেয় অভীক, তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতেই—বুঝেছি। যে রাজা, তারই প্রজা হয়ে থাকা বিদ্বানের পরিচয়।

নয়নার চোখের তারায় বিজয়িনীর হাসি। যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল সেই যুদ্ধে জয়লাভ করেছে নয়না।

অভীক জানে অভীকের মনের কথা, কিন্তু সে দেখছে শুধুমাত্র ওই কটি কথা খুশি করেছে সবাইকে, তাই হয়তো সে নিজেও খুশি।

মানুষ ভাবে এক, বোধহয় হয় অন্যকিছু। হয়তো সেই কারণেই শান্তি এসেও ফিরে যায়। সুখ দরজার চৌকাঠ ডিঙিয়েও ফিরে আসে বাইরে। সুখ শান্তির নিয়ন্ত্রক একমাত্র মন। ওখানে কোনো বহির্মানুষের স্থান নেই। নেই পেশিশক্তির আস্ফালনজনিত কোনো মোটিভেশন।

কথায় বলে গায়ের জোরে শরীর মেলে, মন মেলে না। ঠিক ধর্ষণ আর সহবাসের মতো, সম্পর্ক সেখানে আপাত।